ডি মায়াল এডোয়ার্ডস্‌-এর

ধর্ম-দর্শন

The Philosophy of Religion

সুশীল কুমার চক্রবর্ত্তী

নবপত্র প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ : ১ বৈশাখ, ১৩৫৯

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক : প্রসূন বসু
নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

উৎসর্গ

আমার স্বর্গগতা মাতামহী
৺ গিরিবালা দেবীর
স্মৃতির উদ্দেশ্যে

অনুবাদ প্রসঙ্গে

মূল গ্রন্থের রস যতদূর সম্ভব অবিকৃত রেখে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া অনুবাদকের কাজ। কাজটি যথেষ্ট দুরূহ। আদৌ সম্ভব কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অনুবাদকের পক্ষে একই সঙ্গে সততা ও সৌন্দর্য রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিছু কিছু বাক্য আছে যার ভাষান্তর সম্ভব নয়। (যেমন রবীন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছেন—The horse is a noble animal বাক্যটির বঙ্গানুবাদ কি হবে?) এছাড়া আছে অনুবাদকের যোগ্যতার প্রশ্ন। যোগ্যতর হাতে পড়লে এই বইটির যে অধিকতর সুন্দর অনুবাদ হতে পারত, সে বিষয়ে আমি নিজেই সচেতন।

নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমি যে এই কাজে হাত দিয়েছি তার কারণ, আমি বিশ্বাস করি অনার্সে নির্দিষ্ট সমস্ত পুস্তকের যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি বাংলা তর্জমা হওয়া দরকার। এক একটি পুস্তকের একাধিক তর্জমা হওয়াও উচিত। তাহলে গুণগত উৎকর্ষতা লাভের সম্ভাবনা বেশী থাকে।

যেহেতু কলেজের ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনে মূলতঃ গ্রন্থটির অনুবাদ করা হয়েছে, সেইজন্য মূল গ্রন্থের প্রতি আমি সর্বদা অনুগত থাকবার চেষ্টা করেছি। প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তিরই অনুবাদ করা হয়েছে। বিষয়ের দিক থেকে ইংরেজী বইটিতে যা আছে বর্তমান অনুবাদটিতেও তাই আছে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু মূল গ্রন্থের রচনাশৈলী, ভাষার সৌন্দর্য এবং উপস্থাপনার মুন্সিয়ানা যে অনুবাদ গ্রন্থে নেই সে কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিচ্ছি।

যেখানে বুঝতে অসুবিধে হবে বলে মনে করেছি, [ ] বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে সেখানে দু' একটি কথা যোগ করে দিয়েছি। তাছাড়া প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে একটি সারসংক্ষেপ যুক্ত করেছি। সেটি পড়লে বিষয়টি বোঝা হয়ত কিছুটা সহজ হবে।

পরিভাষার ব্যাপারে সাধারণতঃ আমি, যে সব পরিভাষা বহুল প্রচলিত, তাদেরই গ্রহণ করেছি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কোন পরিভাষা ব্যবহার না করে শব্দটিকে প্রায় ব্যাখ্যা করে দিয়েছি। ভেবেছি ছাত্রছাত্রীদের এতে বোঝার সুবিধে হবে।

একজন ইংরেজ লেখক রচনা কালে প্রাচীন ইংরেজী সাহিত্য থেকে অথবা ল্যাটিন থেকে যথেচ্ছ উদ্ধৃতি ও উদাহরণ ব্যবহার করতে পারেন। ইংরেজ পাঠকদের কাছে সেগুলি উপভোগ্যও হয়। কিন্তু অনুবাদের পর যখন অন্য ভাষভাষীদের কাছে সেগুলি সরাসরি এসে হাজির হয় তখন তা পাঠকদের দুর্ভোগের কারণ হয়ে উঠতে পারে। যতগুলো সম্ভব হয়েছে সেইসব ক্ষেত্রে পাঠকদের বিষয়টি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি।

দার্শনিকদের নামের বিভিন্ন রকম উচ্চারণ ছাত্রাবস্থা থেকে শুনে আসছি। বাংলা বইগুলিতেও উচ্চারণবিভ্রাট লক্ষণীয়। আমি আমার মাষ্টার মশাইদের কাছ থেকে প্রথম যেমন করে উচ্চারণ করতে শিখেছিলাম, সেইভাবেই লিখেছি। অন্যের যাতে অসুবিধা না হয় তাই প্রত্যেক ক্ষেত্রে বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজী হরপে নামটি লিখে দিয়েছি।

পরিশেষে একটি বিষয় উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি। যখন কেউ কোন একটি বই অনুবাদের জন্য নির্বাচন করেন, তখন ধরে নেওয়া হয় যে গ্রন্থকারের সঙ্গে অনুবাদকের মতের ঐক্য রয়েছে। বর্তমান ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এডোয়ার্ড্স্-এর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, সমস্যা উপস্থাপনার সাবলীলতা এবং তাঁর কাব্যিক ভাষা ছাত্রাবস্থাতেই আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু তাই বলে লেখকের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি একমত—এরকম ভাবলে ভুল করা হবে। যেমন ইসলাম ধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক যেভাবে আল্লাকে 'arbitrary', irresponsible' প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছেন তার সঙ্গে আমি একমত নই। মুসলমান পাঠকদের কাছে বিষয়টি অস্বস্তিকর বলে নয়, ঐ রকম একটা সিদ্ধান্তে আসার জন্য যে ধরনের যুক্তির প্রয়োজন ছিল তা এখানে অনুপস্থিত। এমন মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে লেখক গায়ের জোরে (arbitrarily) এই রকম একটা সিদ্ধান্ত করে বসেছেন। তা ছাড়া সমস্যার উপস্থাপনা এবং সমালোচনার সময় তিনি যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, সমাধানের ক্ষেত্রে হঠাৎ তাঁর খৃষ্টধর্মতত্ত্বের শরণাপন্ন হওয়াটা অনেক সময় অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কখনো কখনো তিনি কবিতারও আশ্রয় নিয়েছেন। (যদিও তিনি এ বিষয়ে সচেতন যে কবিতার ভাষা ও যুক্তির ভাষা এক নয়)। বিশেষ করে চরম ভাববাদের জট ছাড়াতে গিয়ে খৃষ্টধর্মতত্ত্বের মধ্যে তার সমাধান খোঁজাটা লেখকের আগের জোরালো ও পরিচ্ছন্ন যুক্তির সঙ্গে

যেন খাপ খায় না। লেখক নিজে খৃষ্টধর্মাবলম্বী বলেই হয়তো এমন হয়েছে।

অনুবাদের সময় আমার অনেক সহকর্মীর কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি। তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কেবল কৃতজ্ঞতা জানাতে সঙ্কোচ বোধ করছি অগ্রজতুল্য সহকর্মী অধ্যাপক সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা কল্পনা সেনগুপ্তকে।

বইটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এস্. এ্যাণ্ট্‌লে এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেডের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীপ্রাণকুমার মুখোপাধ্যায়ের তৎপরতা ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার মাননীয় শ্রীঅবনী মিত্র মহাশয়ের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

সবশেষে ছাত্রছাত্রীদের জন্যেই এই অনুবাদ। তারা যদি বুঝতে পারে তাহ'লে সাতখুন মাপ। তা না হ'লে সব কৈফিয়ৎ অর্থহীন।

সুশীল কুমার চক্রবর্ত্তী

ভূমিকা

এই পুস্তকের সীমাবদ্ধ পরিসরে আমি ধর্ম-দর্শনের সকল দিকটি যতদূর সম্ভব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমি ধর্মকে যেমন ঐতিহাসিক ও মনোবৈজ্ঞানিক দিক থেকে দেখেছি তেমনি পর্যালোচনা করেছি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কারণ আমি উপলব্ধি করি যে বর্তমান অবস্থায় ইতিহাস ও মনোবিজ্ঞানের প্রতি মনোনিবেশ না করে ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বই-এর আকৃতির দিক থেকে বিচার করলে আমি নিজেই আমার পরিকল্পনাকে উচ্চাশাপূর্ণ বলে মনে করি। আলোচ্য বিষয়ের বিশাল পরিধি সত্ত্বেও আমি বইটিকে কেবলমাত্র সংক্ষিপ্ত নক্সা করে তুলিনি; সহজভাবে একটা সম্পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রেখেই আলোচনা করেছি। কতদূর আমি সাফল্যলাভ করেছি সেটা অন্যজন বলতে পারবেন। একটা ছোট বই যে এ ধরনের একটা বিশাল বিষয় আলোচনার জন্য যথেষ্ট নয়, এ বিষয়ে আমার থেকে বেশী সচেতন আর কেউ নয়। জায়গার অভাবের জন্য বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু মারাত্মক ফাঁক থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ব্যক্তিগত অমরত্বের ধারণা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু এখানে আমি তার উল্লেখ করেছি মাত্র।

পদ্ধতি হিসেবে আমি, যাকে বলে,—'সমালোচনার মাধ্যমে গঠনমূলক পদ্ধতি' তারই যথেচ্ছ প্রয়োগ করেছি। অর্থাৎ কেবলমাত্র আমার মতামত বা পদ্ধতিকে প্রকাশ না করে, কতকগুলি প্রতিনিধি স্থানীয় মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি আমার নিজস্ব মতটিকে প্রতিষ্ঠা করেছি। অত্যন্ত মৌলিক সৃষ্টিধর্মী চিন্তার কথা বাদ দিলে একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা না করে মিলিত প্রচেষ্টাতেই বিজ্ঞান ও দর্শনের ভাল ফল পাওয়া যায়। অন্যান্য মতামত আলোচনার মধ্য দিয়ে নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠাকে এক অর্থে মিলিত প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে।

যেখানে আলোচ্য বিষয় এবং তার মাধ্যম যে সাহিত্য দুই-ই বিশাল, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, লেখক যে সব বিষয়ে এখানে আলোচনা করছেন তার সর্বকিছুতে তিনি কৃতবিদ্য নন। বইটির প্রত্যেক অংশের জন্য, অন্য লেখকদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কিন্তু আমি সচেতন যে নৃতত্ত্ব-

সম্পর্কিত পরিচ্ছেদটি একেবারে ধার করা। আমার সমস্ত পাণ্ডুলিপিটি পড়ে এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে কলা থিওলজিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডেভিড ফিলিপ্‌স যে অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন তার জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এবং প্রূফ দেখে সাহায্য করার জন্য ব্রিকন কাউণ্টি স্কুলের মিঃ রোল্যাণ্ড টমাসকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মেমোরিয়্যাল কলেজ
ব্রিকন।
৭ই জুন ১৯২৪।

ডি মায়াল এডোয়ার্ডস্‌

সূচীপত্র

'মনুষ্যজাতি সম্পর্কে কিছু জানতে গেলে মানুষকে জানতে হবে'—এ রকম একটি কথা অনেকদিন আগেও বলা হত, এখনো হয়। মানুষ নিয়ে কোন আলোচনা করতে গেলে ধর্মের কথা এসে পড়বেই। তা না হ'লে সেই আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। মানুষের ইতিহাসের উপর এমন সর্বব্যাপক প্রভাব ধর্ম ছাড়া আর অন্য কোন বিষয়ের নেই। ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু ধর্ম যে মানুষের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে—একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। অনেক দিক থেকে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। কেউ যদি মনুষ্য সভ্যতার সর্বাত্মক ইতিহাস রচনা করতে চান, তিনি দেখতে পাবেন. অতি আদিমকাল থেকে মানবজীবন ও মানবেতিহাসের কেন্দ্রভূমিটি ধর্মই দখল করে রয়েছে। প্রারম্ভে ধর্মের প্রকৃতি যতই স্থূল থাকুক না কেন, এবং পরে ধর্মের সঙ্গে যতই ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কার সংযুক্ত হোক না কেন, মানুষের ইতিহাসে ধর্মের সর্বব্যাপকতা ও কেন্দ্রিকতাকে স্বীকার না করে উপায় নেই। কোঁতে (Comte)কেও স্বীকার করতে হয়েছে,—সমস্ত অস্তিত্বের সঙ্গে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধর্মের ইতিহাস মনুষ্য প্রগতির সামগ্রিক ইতিহাসের পুনর্জন্ম দান করেছে।* ম্যাক্স মুলারের (Max Muller) মত আমরা যদি বলি, 'মানুষের প্রকৃত ইতিহাস হল ধর্মের ইতিহাস, তাহ'লে মনে হয় আমরা খুব বেশি ভুল করবো না। নৃতত্ত্ব, ধর্মের ইতিহাস, ধর্মীয় মনোবিজ্ঞান, মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি এবং তুলনামূলক ধর্মের আলোচনা করে, বর্তমান যুগের অনেক অধ্যবসায়ী গবেষক ধর্মীয় আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, ক্রিয়াকলাপ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আবেগ, ব্যক্তি তথা সম্প্রদায়ের উচ্চাশা প্রভৃতি সম্পর্কে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সকল রকম বৌদ্ধিক অনুসন্ধানের শীর্ষে রয়েছে দর্শন। কেবলমাত্র তথ্য সংগ্রহ করে, অথবা সাধারণভাবে ঘটনাগুলির শ্রেণীবিন্যাস করে. কিংবা কার্যকারণ নীতি বা প্রকৃতির একরূপতার সূত্র দিয়ে, তথ্যগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দর্শন সন্তুষ্ট হতে পারে না। কারণ, সঞ্চয়ন, সামান্যীকরণ বা শ্রেণীকরণ বিজ্ঞানের কাজ।

* Positive Policy Vol. ii P119, Quoted by A. S. Pringle Pattison in The Idea of God in the Light of Recent Philosophy (1917) P 137.

দর্শনের কাজ হ'ল তথ্যের অন্তর্নিহিত চরম অর্থ আবিষ্কার করা। তথ্য হ'ল অভিজ্ঞতা পন্থী। ব্যক্তিগত দিক থেকে যা একটি অভিজ্ঞতা অথবা অভিজ্ঞতার উপাদান, বস্তুগত দিক থেকে তাই হল তথ্য। প্রকৃতপক্ষে তথ্য হ'ল অভিজ্ঞতার বাস্তব দিক। কারণ যে তথ্য সম্পর্কে কখনো কারো অভিজ্ঞতা হয়নি, সে বিষয়ে আমরা কোন কিছু জানতে বা বলতে পারি না। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে মানুষের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা থেকে কোন একটি অভিজ্ঞতাকে বিজ্ঞান বিচ্ছিন্ন করে আনে। তারপর সেই অভিজ্ঞতাটির বিশেষ অবস্থা নিয়ে বিজ্ঞান আলোচনা করে। বিপরীত পক্ষে দর্শনের আলোচনার বিষয়বস্তু হল মানুষের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। দর্শন আলোচনা করে অভিজ্ঞতার ভিত্তি, নিগূঢ় অর্থ ও তার যৌক্তিকতা নিয়ে। সকল বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সমষ্টির ফলে যে নতুন বিষয়বস্তুর সৃষ্টি হয়, সেই সমষ্টিগত বিষয়বস্তুর আলোচনাকেও দর্শন বলে না। বিজ্ঞান যেখানে কোন একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে দর্শন তখন অধিগত অভিজ্ঞতার সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে চিন্তা করে। বিজ্ঞান হল বিমূর্ত, বিশ্লেষক এবং বিশিষ্ট উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অপর দিকে দর্শন হ'ল মূর্ত, সংশ্লেষক, ব্যাপক এবং সমগ্রের স্বরূপ অনুসন্ধানে প্রয়াসী।

ধর্মও এক অর্থে অভিজ্ঞতার একটি দিক। সুতরাং ধর্ম ও বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। অথবা ধর্ম-বিজ্ঞান বলে কোন বিশেষ বিজ্ঞান হতে পারে যাতে ধর্ম সম্পর্কিত সকল আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু অন্যান্য অভিজ্ঞতার মত ধর্মেরও দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এবং তার ফলেই ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য বোধগম্য হবে। কারণ সমগ্র অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা কেবল দর্শনেই সম্ভব। তাছাড়া ধর্ম কেবল অভিজ্ঞতার একটি অংশ মাত্র নয়, তার থেকে কিছু বেশী। ধর্ম দাবী করে যে অন্যান্য অভিজ্ঞতার পাশাপাশি আরও একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। উন্নততর অবস্থায় ধর্মীয় চেতনা বস্তুর অন্তর্নিহিত নিগূঢ় অর্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চায়। আমরা অবশ্য এর দ্বারা বোঝাতে চাইছি না যে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হল পরম সত্তা বা ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্বের প্রতি বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গী মাত্র। বরং বুদ্ধির ভূমিকা এখানে গৌণ। ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক অপেক্ষা অনুভূতির সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠতর তা'তে কোন সন্দেহ নেই। ধর্ম পরম সত্তাকে ব্যাখ্যা করে এবং মনুষ্য জীবনের মূল্যবোধগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে বিশ্বপ্রকৃতির বিশ্লেষণ করে। জগৎ যেভাবে দৃশ্যমান ঠিক সেইভাবে ধর্মীয় চেতনা জগতকে গ্রহণ করে

না। ধর্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে একটি অফুরন্ত অপার্থিব শক্তির অস্তিত্ব অনুমান করে। দৃশ্যমান জগতের রূপের আবরণখানি উন্মোচন করে, সে অন্তস্থলটি অনুসন্ধান করতে চায়। আর সেই সঙ্গে বিশ্বাস করে, জীবন সংগ্রামের জন্য এবং মৌলিক অভাব মোচনের জন্য, সেই অপার্থিব শক্তির বাস্তব সহায়তা লাভ করা সম্ভব। অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতি ধর্মের যতটা আস্থা রয়েছে পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতি ততটা নেই। ইন্দ্রিয়াতীত জগতের কাছে ধর্মের অনেক প্রত্যাশা। ধর্ম বিশ্বাস করে সেই অতীন্দ্রিয় আর্থিক জগৎ আমাদের সকল প্রত্যাশা পূরণ করতে সমর্থ। এমন কি যদি কখনো ধর্ম-যুক্তির পথ ছেড়ে, অনুভূতির সাহায্যে পরম সত্তার ব্যাখ্যা করতে চায় তখন সেই অনুভূতি নিজেই হয়ে ওঠে মূল্যায়ন। সুতরাং এই মূল্যায়নও প্রকৃতপক্ষে পরম সত্তারই একটি ব্যাখ্যা। মানুষ বস্তুর সমগ্রতাকে উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধির প্রতি তার যে প্রতিক্রিয়া হয় তাকেই বলে ধর্ম। আর এই প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই উপলব্ধির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

ধর্ম কোন মতবাদ মাত্র নয়। ধর্ম হল জীবনধারণের একটা পদ্ধতি। আর এই জীবনধারণ পদ্ধতির ভাবার্থের মধ্যে রয়েছে কোন না কোন মতবাদের নির্দেশ। ধর্ম সত্য এবং পরম সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। ধর্মীয় তথ্যগুলি সত্য ও তত্ত্বের যথার্থ বিশ্লেষণ করতে পারে কিনা পরীক্ষা করার জন্য দর্শনকে ধর্ম যেন নিরন্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে। এই আহ্বানের প্রতিক্রিয়ার ফলে ধর্মদর্শনের উদ্ভব। ধর্মের প্রকৃতি, কার্যকলাপ, মূল্য, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সত্যতা এবং পরম সত্তার স্বরূপের প্রকাশ হিসেবে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার যথার্থতা প্রভৃতি সম্পর্কে দার্শনিক অনুসন্ধানকেই ধর্মদর্শন বলে।

অন্যান্য দর্শনের মত ধর্মদর্শনকেও ঘটমান জগতের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তার উপাত্ত (স্বীকৃত সত্য) খুঁজে নিতে হবে। এবং ঐ উপাত্তগুলিকে পরম নীতির আলোকে মূল্যায়ন করতে হবে এবং পরম সত্তার মধ্যে এই উপায়গুলির কারণ আবিষ্কার করতে হবে। তার জন্য ধর্মদর্শন এই ঘটমান জগতকে অতিক্রম করার চেষ্টা করতে পারে। তা হ'লে ধর্মদর্শনের কাজ হ'ল দু'রকম। প্রথমতঃ, মানুষের জীবনে অবিসংবাদিত ও স্বাভাবিক ঘটনারূপে ধর্মের ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং দ্বিতীয়তঃ, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে চরম সত্য ও বাস্তব প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য আধিবিদ্যক বা তাত্ত্বিক

অন্বেষণ। আমাদের এই দুটি আলোচ্য বিষয়ের একটি অন্যটি ছাড়া অসম্পূর্ণ। ধর্মদর্শনকে সম্পূর্ণ হ'তে হ'লে এই দু'টি বিষয়েরই যুগপৎ আলোচনা করতে হবে। যেমন কাণ্ট (Kant) একদা বলেছিলেন, বিষয় ছাড়া চিন্তা অন্তঃসার-শূন্য আবার চিন্তন ব্যতীত কেবলমাত্র প্রত্যক্ষণ অন্ধ; সেই রকম আমরাও বলতে পারি ধর্মদর্শন ইতিহাস ছাড়া শূন্যগর্ভ এবং ধর্মীয় ইতিহাস দর্শন ছাড়া অন্ধ।

ধর্মের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ এবং মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তির মধ্যে ধর্মের বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলীর সম্যক জ্ঞান লাভ না করেই কখনো কখনো ধর্মের স্বরূপ ও কার্যাবলী, অথবা যথার্থতা আলোচনা করার একটা প্রলোভন দেখা যায়। এই প্রচেষ্টাকে প্রত্যক্ষণহীন চিন্তা (অভিজ্ঞতা ব্যতীত জ্ঞান) বলা যেতে পারে; এই জ্ঞান স্বাভাবিক কারণে শূন্য। এই শূন্যতা কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে পূর্ণ করা যায় না। করলে তা হবে অনেকটা কাদা ছাড়া ইট বানানোর চেষ্টা বা মজবুত ভিত ছাড়া হাওয়ায় একটা অট্টালিকা বানানোর সংকল্পের মত। নৃতত্ত্ব ও ইতিহাস থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা উপাদান সংগ্রহ করতে পারছি, ততক্ষণ কল্পনার প্রাসাদ বানানোর বেশী আমরা কিছু করতে পারি না। এই ধরনের প্রচেষ্টা আমরা বিগত দিনের কল্পনাপ্রবণ দার্শনিকদের মধ্যে দেখেছি। তাঁরা এতে মজা পেতেন। কিন্তু এই আমোদকে আমরা কিছুতেই নির্দোষ বলতে পারি না।* আমাদের প্রথম কর্তব্য হল নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, তুলনামূলক ধর্ম এবং মনোবিজ্ঞানের বিশাল রাজ্য থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করা। তারপর ধর্মীয় বিবর্তনের নিয়ম এবং শ্রেণীকরণের কোন একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করা; যার সাহায্যে সংগৃহীত অজস্র উপাদানকে কিছুটা বুদ্ধিগম্য করে তোলা যাবে এবং আপাত বিশৃঙ্খল তথ্যগুলিকে সুবিন্যস্ত করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন পরিবেশে এবং মনুষ্যপ্রগতির বিভিন্ন স্তরে ধর্ম কি ভাবে কাজ করেছিল এবং এখনো করে যাচ্ছে তার জ্ঞান লাভ করার পরই কেবল আমরা বলতে পারি ধর্ম কি, এবং ধর্ম কাকে বলে।

বিপরীত পক্ষে কেবলমাত্র উপাদান সংগ্রহ করা এবং সেই উপাদানগুলিকে সুবিন্যস্ত করাকেই ধর্মদর্শন বলে না। কারণ বোধহীন অবলোকন অন্ধ। তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিন্যাসের অপরিসীম জটিল পদ্ধতিকে আমাদের বিশ্লেষণ করতে

* C. P. Tiele, Elements of the Science of Religion (1897) Vol i, P. 13

হবে এবং মানুষের ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক কতটা, তাও জানতে হবে। কোন কোন আধুনিক চিন্তাবিদ মনে করেন কোন আধিবিদ্যক বা তাত্ত্বিক প্রশ্ন ধর্মদর্শনের আওতায় পড়ে না। এই সমস্যার সমাধান মানুষের সাধ্যাতীত। আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদীরা [যেমন—Ritschlians and Pragmatists] পরম সত্তার বৌদ্ধিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা বা সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন। তাঁরা ধর্মদর্শনকে ধর্মীয় ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান। তাঁদের অভিমত হল ধর্মের বাস্তব সত্যকে অমীমাংসিত রাখলে ক্ষতি নেই। মনুষ্য সমাজের বিবর্তনের ক্ষেত্রে ধর্মের সক্রিয় চরিত্রটি যদি প্রদর্শিত হয় এবং সমাজ জীবনে ধর্মের বাস্তবমূল্য যদি নির্ণিত হয় তাহ'লেই যথেষ্ট হবে। কেবলমাত্র প্রয়োজনের দিক থেকে ধর্মের সত্যতা প্রতিপাদনের কাজটি গ্রহণ করা যেতে পারে। এই মতানুযায়ী ধর্মদর্শনের কাজ হল, একটি সাধারণ বা সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক আলোচনা করা এবং তার ফলাফল সংগ্রহ করা। আমরা এই মতবাদকে সাধারণভাবে দার্শনিক অভিজ্ঞতাবাদ বলতে পারি। বিগত যুগের কল্পনা-প্রবণ চিন্তাবিদদের অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ আরোহমূলক ধর্মীয় ব্যাখ্যাকে অকারণ বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভণ্ডামি বলা যেতে পারে। দার্শনিক অভিজ্ঞতাবাদ যে তার সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্লেটোর (Plato) সম্পর্কে জুবার্ট (Joubert) যে রকম অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তার অনুকরণে ম্যাথু আর্নল্ড (Matthew Arnold) শেলির (Shelley) সম্পর্কে নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়েছিলেন—'এক সুন্দর কিন্তু নিষ্ফল দেবদূত। সে তার দ্যুতিময় পাখা মহাশূন্যে বৃথাই আন্দোলিত করেছিল'। বাক্যটি একটু অদল বদল করে আমরা কল্পনাপ্রবণ ভাববাদীদের সম্পর্কেও প্রয়োগ করতে পারি। তাঁরাও তাঁদের পাখা মেলে দিয়েছিলেন কল্পনারাজ্যের মহাশূন্যে। সেখানে কোন বায়ুমণ্ডল নেই। যদিও থাকে তা এত লঘু যে কেউ তাতে পাখা নেড়ে উড়ে যেতে পারে না। সেই কল্পরাজ্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক রূঢ় বাস্তবের কোন মিল নেই। যাই হোক, আধুনিক চিন্তা, কল্পনার সেই দু:সাহসী দাম্ভিক পাখা দুটি ছেঁটে ফেলে দিয়েছে। এই পাখা দুটির সাহায্যেই তারা সহজ প্রত্যয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারত। এই প্রসঙ্গে এটাও কিন্তু স্বীকার করা ভাল যে একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত অজ্ঞেয়বাদেরও প্রয়োজন আছে। তার ফলে

গভীর রহস্যের প্রতি আমরা একটু বিনয়ী হয়ে উঠি এবং চিন্তার সেই প্রবণতাটাও সংযত হয় যাকে উইলিয়ম জেম্স (William James) হেগেল পন্থীদের সমলোচনা প্রসঙ্গে আখ্যা দিয়েছিলেন 'চিন্তার সতীত্বের উপর বলাৎকার' বলে।

তা ছাড়া ধর্ম সম্পর্কে কেবলমাত্র অভিজ্ঞতাভিত্তিক আলোচনাতেও প্রমাণিত হয় যে ধর্মীয় চেতনা নিজেই নিজের সমর্থনের জন্য একটি অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ সত্তাকে নির্দেশ করে। ধর্মের মূলতত্ত্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝা যাবে না। ধর্ম তার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নিজের যথার্থতা নিরূপনের জন্য অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করে। অতীন্দ্রিয় সত্তার সমর্থন ব্যতীত ধর্ম স্বপ্নের অর্থহীন শিল্পকলায় বা একটি সুন্দর মায়ায় পর্যবসিত হয়। ধর্ম কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মায়া হলেও তার একটা ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে—এ কথাও সমর্থনযোগ্য নয়। ধর্মীয় ধারনার সমর্থনে একটি অতীন্দ্রিয় জগৎ স্বীকার করলে তবেই ধর্মের ব্যবহারিক উপযোগিতা মেনে নেওয়া সম্ভব। যদি ধর্মের মধ্যে এ রকম একটা অস্বস্তিকর সন্দেহ অনুপ্রবেশ করে যে ধর্মবোধ হ'ল বস্তুনিরপেক্ষ অনুভূতিমাত্র, তা হ'লে ধর্ম নিজেই নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং ধর্মের ব্যবহারিক মূল্য (যদি বা কিছু থাকে) নষ্ট হয়ে যায়। ধার্মিকদের অজ্ঞ থাকাই ভাল। পণ্ডিতদের যে জ্ঞান প্রমাণ করে যে, ধর্ম ব্যক্তিগত মানসিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল; তার সামাজিক মূল্য আছে সন্দেহ নেই কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। এবং সেই জ্ঞানে ধার্মিকদেরও কোন প্রয়োজন নেই। এই জ্ঞান ধর্মের পক্ষে আত্মঘাতী হয়ে উঠবে। ধর্ম মানেই সত্য এবং প্রয়োজনীয়, কিংবা সত্য বলেই প্রয়োজনীয়। ধর্ম তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞান লাভ করতে চায়। যদিও সেই জ্ঞান অসম্পূর্ণ তবুও নিজের পরিধিতে তা অভ্রান্ত। এই জ্ঞান অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিশুদ্ধ, ত্রুটিহীন ও যথাযথ হতে পারে। ধর্মীয় চেতনার মধ্যে জগতের যে ধারনা রয়েছে তার একটি যৌক্তিক ভিত্তি দান করা ধর্মদর্শনের কর্তব্য। কাজটি অবশ্যই জটিল। কিন্তু জটিল বলে ধর্মদর্শন তার কর্তব্য এড়িয়ে যেতে পারে না। আর ধর্মদর্শন যদি কোন যুক্তিসম্মত সমর্থন খাড়া করতে না পারে, অথবা যদি সে দেখাতে পারে ধর্মবোধের মূলেই রয়েছে নৈতিক ও আত্মিক মূল্য সম্পর্কে 'হৃদয়হীন নির্লিপ্ততা', অথবা যদি প্রমাণিত হয় যে বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত সত্তার সঙ্গে ধর্মবোধের বৈরিতা

রয়েছে তাহ'লে ধর্মদর্শনের কর্তব্য হবে ধর্মের অন্তঃসারশূন্য দিকটি সবার সামনে তুলে ধরা, ধর্মবোধের অযথার্থতা প্রমাণ করা। স্বর্গ ধ্বংস হয় হোক, সত্য বলতে হবেই। তাহ'লে আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হল, যে অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্বের উপর ধর্মের নিজের অস্তিত্ব নির্ভর করে সেই অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব কিভাবে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণ করা যাবে? হয় আমরা ধর্মের দাবী মেনে নেবো এবং তার সার্থকতা প্রমাণ করবো, নতুবা আমাদের আলোচ্য বিষয়কেই অর্থহীন বলে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে।

(1) আমরা দেখেছি যে, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি পর্যালোচনা করাই ধর্মদর্শনের প্রথম কাজ। আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়কে কখনো কখনো 'ধর্মীয় প্রপঞ্চ তত্ত্ব'ও বলা হয়। এই বিষয়টিকে দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, ধর্মীয় চেতনার আভ্যন্তরীণ বা ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে (মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী), এবং ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান, প্রক্রিয়া, পৌরাণিক কথা, ধর্মমত প্রভৃতির মধ্যে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে (ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী)। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীকে একেবারে পৃথক করে রাখা যেতে পারে না। কারণ মানুষের জীবনে ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক অবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। আমরা বাহ্য অভিজ্ঞতার ইতিহাস আলোচনা না করে যেমন আমাদের আন্তর অভিজ্ঞতা বুঝতে পারি না, তেমনি বাহ্য অভিজ্ঞতা বুঝতে গেলেও, যে সব উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে পরিচালিত করে, তাদেরও আমাদের সহানুভূতিশীল অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে জানা প্রয়োজন। একদিকে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সামাজিক পরিবেশ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করে এবং সামাজিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিভিন্ন রীতিনীতি, বিশ্বাস, সামাজিক ঐতিহ্য প্রভৃতি ব্যক্তিকে বিশেষ দেশে ও কালে একটি উত্তরাধিকার প্রদান করে, এবং এই উত্তরাধিকারের মধ্যে ব্যক্তি নিজেকে আবিষ্কার করে। সাধারণ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই সামাজিক উত্তরাধিকারের ধারনা যতটা সত্য, রহস্যবাদীদের ক্ষেত্রে ততটা না হ'লেও এধারণার অনেকখানি প্রভাব তাদের উপরেও পড়ে। এমনকি তারা এ বিষয়ে প্রায়ই সচেতন থাকে। বিপরীত পক্ষে মনস্তাত্ত্বিক সংকল্পের গভীরে এই সব সামাজিক ঐতিহ্য, প্রথা এবং বিশ্বাসের মূল নিহিত আছে। অবশ্য এই সংকল্পগুলি চেতন মন অপেক্ষা অবচেতন মনে অধিকতর সক্রিয়। যদিও

ধর্মের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বাস্তব ঘটনা গঠনমূলকভাবে এক, তবু আলোচনার সুবিধার জন্য এদের পৃথক করা যেতে পারে। অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই দু'টি পদ্ধতি পরস্পরের সম্পূরক হলেও একটি অন্যটির স্থান গ্রহণ করতে পারে না। আমরা যদি আমাদের মধ্যে কিছুটা অনুভূতি, আবেগ, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস প্রভৃতি খুঁজে বের করতে না পারি তা হ'লে ঐতিহাসিক তথ্যগুলি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। আবেগ, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি মানসিক প্রবণতাগুলি ঐতিহাসিক তথ্যের অর্থান্বেষণের সূত্রটি আমাদের সরবরাহ করে। বিপরীত পক্ষে উপাসনা, অনুষ্ঠান, ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ কিভাবে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তা না জানলে বস্তুনিরপেক্ষ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা নিতান্ত অস্পষ্ট এবং ছলনাপূর্ণ ব্যক্তিগত মতামত হয়ে দাঁড়ায়।

অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের তথ্য হিসেবে ধর্মের আলোচনা করলে আমাদের এমন কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়—যার সমাধানের পথ কেবলমাত্র ধর্মদর্শনই অন্বেষণ করতে পারে। কেবল তথ্যগুলি জানলেই চলে না। তাদের ভালভাবে বুঝতে হয় এবং ব্যাখ্যা করতে হয়। তার ফলে কতকগুলি প্রশ্ন দেখা দেয়। যেমন—ধর্ম কি? তার স্বরূপ ও কার্যাবলীকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি? ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ের মধ্যে যদি কোন সীমারেখা থাকে, তা কিভাবে দেখানো যায়? জীবন ও সংস্কৃতির যে দিকগুলি ধর্মের সমগোত্রীয় তাদের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কি? উদাহরণস্বরূপ ধর্মের সঙ্গে নৈতিকতা, কলা, বিজ্ঞান ও দর্শনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কি কি? ইত্যাদি। এর পর ধর্মের সংজ্ঞা নিরূপণের জটিল প্রশ্নটি এসে পড়ে। অনেকে মনে করতে পারেন, আলোচনার প্রারম্ভেই সংজ্ঞা নিরূপণ করা যুক্তিযুক্ত। ধর্মদর্শনের আলোচ্য বিষয়গুলি প্রথম থেকে ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন। তাহ'লে আমরা অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনার দুর্ভোগ এড়াতে পারবো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিয়মমত কাজ করা এখানে সম্ভব নয়। [অর্থাৎ আগে ধর্মের সংজ্ঞা নিরূপণ করা সম্ভব নয়।] কারণ তথ্যাবলীকে ধৈর্য ধরে পর্যালোচনা করার আগে আমরা ধর্মের কোন যথাযথ সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারি না। যখন ধর্মের ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করবো, এবং মানুষের ধর্মীয় সত্তা বিভিন্ন কালে যে অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে

তার পর্যালোচনা করতে পারবো তখনই কেবল ধর্মের প্রকৃত স্বরূপটি আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে। ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য 'ধর্ম কাকে বলে' এ জ্ঞান আমাদের রয়েছে। সুতরাং ধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপণের প্রশ্নটি পরবর্তী আলোচনার জন্য মুলতুবী থাকতে পারে। এখন তাহ'লে আলোচ্য বিষয় হ'ল ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সমস্যা। মানুষ তার অ-মানুষ স্তর থেকে মানুষের অবস্থায় বিবর্তিত হওয়ার কালে কেন বা কি করে ধার্মিক হয়ে উঠল এবং আজ পর্যন্তই বা কেন ধর্মবিশ্বাসকে আগলে রেখেছে? কোন নিয়মে বা কোন প্রয়োজনে মানুষ তার আদিম জীবনের স্থূল ধর্মীয় ধারনাকে পরবর্তী যুগে উচ্চতর মার্জিত রূপ দান করেছে, ইতিহাসের যে-কোন সাধারণ ছাত্র এই প্রগতিটি লক্ষ্য করতে পারে। অবশ্য এই প্রগতির ধারা অভগ্ন বা নিরবচ্ছিন্ন নয়। কোন্ কোন্ নিয়ম, পদ্ধতি ও উপাদন ধর্মীয় বিবর্তনের ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল তাকি আমরা আবিষ্কার করতে পারবো?

(2) আমরা ধর্মের বিষয়, ধর্মের প্রকৃতি, ধর্মীয় নিয়ম এবং ক্রমবিকাশ পদ্ধতির আলোচনা করেছি। জগৎ সম্পর্কে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর যথার্থতা ও পর্যাপ্ততা আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়। বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে যুক্তি দিয়ে দেখতে হবে এটা ন্যায়সঙ্গত কিনা। যদি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণিত না হয় তখন আমাদের বিচার করতে হবে কেন এই দৃষ্টিভঙ্গী অসমর্থনীয়; দু'ভাগে এই সমস্যার আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমটি হল জ্ঞানশাস্ত্র সম্পর্কিত (Epistemological) সমস্যা। মানুষের মন পরম সত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত নিতে আদৌ কি সক্ষম? অতীন্দ্রিয় জ্ঞান কি সম্ভব? মানুষের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা জানতে চাইছি এমন কিছুকে, যা স্বতঃসিদ্ধভাবে অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে—এটা কি স্ববিরোধ নয়? ধর্মীয় জ্ঞানের প্রকৃতি কি? কিরকম জ্ঞানকে ধর্মজ্ঞান বলে? পার্থিব জ্ঞান যেভাবে লাভ করা যায় ধর্মজ্ঞানও কি অনিবার্যভাবে সেই পদ্ধতিতে লাভ করা সম্ভব? অথবা এই পদ্ধতি গুণগতভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন? এই পদ্ধতির সাহায্যে সাধারণ জ্ঞানের অগম্য কোন জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করা কি সম্ভব? যে সাধারণ ধীশক্তির সাহায্যে আমরা জ্ঞান লাভ করি ধর্মজ্ঞান কি তার ধরাছোঁয়ার বাইরে; বিশ্বাস কি জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠতর উপায়? ধর্মচেতনা সত্য জ্ঞান লাভের উন্নততর ক্ষমতার অধিকারী—এই দাবী কি সমর্থনীয়?

এর পর আছে তত্ত্ববিদ্যা সংক্রান্ত সমস্যা। মানুষের পরম সত্তার জ্ঞান লাভ করার চিন্তার সামর্থ্য আছে কিনা আলোচনার পর এখন ধর্মের দাবীগুলিকে আবার পরম সত্তার প্রকৃতির দিক থেকে আলোচনা করতে হবে। পরম সত্তার প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে কি, যার দ্বারা জগৎ সম্পর্কিত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকার করা যায় অথবা ভ্রমাত্মক ও ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণ করা যায়? জগৎ সম্পর্কে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর লক্ষণগুলিকে আমরা যদি সাধারণভাবে গ্রহণ করি তাহ'লে প্রশ্ন উঠবে, ঠিক কি ধরনের ধর্মবিশ্বাস পরম সত্তার স্বরূপ প্রকাশ করতে সর্বাধিক সমর্থ? কারণ ধর্মীয় বিশ্বাস সবদেশে ও সবকালে এক নয়। ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মমতের প্রকৃতি বিস্ময়করভাবে বিভিন্ন। অত্যন্ত বিচার-বিবেচনাপূর্ণ আলোচনা ছাড়া একটিমাত্র সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে ধর্মমতকে পুনর্গঠন করা প্রায় অসম্ভব। বেশির ভাগ ধর্মে সত্য ও মিথ্যার, জ্ঞাননিষ্ঠ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের অদ্ভুত এক সংমিশ্রণ দেখা যায়। কিছু কিছু ধর্মমত অন্য ধর্ম অপেক্ষা অনেকটা বেশি উন্নত ও পরিশুদ্ধ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কোন শিক্ষিত ইউরোপীয় সর্বপ্রাণবাদকে পরম সত্তার প্রকৃত স্বরূপ বলে স্বীকার করবে না। তাহ'লে এখন পর্যন্ত আমার যে ধর্মীয় সত্য লাভ করেছি—তার মধ্যে কোন্‌টি সর্বশ্রেষ্ঠ? তাকি অতিবর্তি ঈশ্বরবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ অথবা ঈশ্বরবাদ? নাকি আমরা নব্য বস্তুবাদীদের মত মেনে নেবো যে ঈশ্বর দেশ ও কাল থেকে ক্রমশ আবির্ভূত হচ্ছেন?* অথবা এছাড়া অধিকতর কোন সত্য ও অধিকতর যথার্থ কোন মতবাদ আছে? যে মতবাদই গ্রহণ করা হোক না কেন তার বিশেষ বিশ্লেষণ প্রয়োজন হবে এবং তাকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবেই। প্রথম অসুবিধাটা দেখা দেবে অমঙ্গলের সমস্যাকে নিয়ে। অতএব ধর্মদর্শনের কাজ হ'ল বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটা যথার্থ ধর্মমত আবিষ্কার করা যা মানুষের প্রয়োজনও মেটাবে এবং সেই সঙ্গে অদ্যাবধি-লব্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গেও সমতাল রক্ষা করবে। দার্শনিক চিন্তা থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল, কিংবা হওয়া স্বাভাবিক ছিল এমন কথা আমরা বলছি না। ধর্ম হল আমাদের সমগ্র সত্তার তীব্র আকাঙ্ক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। ধর্মীয় চেতনা গঠিত হয়েছে সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ চিন্তা, ভাবনা ও অনুভূতি

* See S. Alexander, Space, Time and Deity (1920)

দিয়ে। কেবল বুদ্ধির দ্বারা ধর্মীয় চেতনা লাভ করা সম্ভব নয়। অবশ্য ধর্মদর্শন ধর্মবিশ্বাসকে সমালোচনা করতে পারে ও পরিশুদ্ধ করতে পারে। প্রকৃত সত্যকে অপ্রধান বিষয়গুলি থেকে, মৌল ধারনাগুলিকে বিশ্বাস প্রভৃতির মত গৌণ উপাদান থেকে এবং কুসংস্কার ও স্থূল ধর্মোন্মত্ততাকে চিরন্তন সত্যের থেকে পৃথক করতে পারে ধর্মদর্শন। আর সেই সঙ্গে ঈশ্বর, মানুষ ও জগৎ সম্বন্ধীয় সত্য ধারনার অংশগুলিকে যথাসাধ্য জোড়া দিয়ে ধর্মদর্শন একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারে। কেবলমাত্র সত্যকে সামনে রেখে এই গঠনমূলক আলোচনা হয়ত একটা আদর্শমূলক সমালোচনা হয়ে উঠবে। আবার সেই আদর্শটি লাভ করাও আপাতত আমাদের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়। হয়ত সেটা হবে একটা 'উড়ন্ত আদর্শ' যে আদর্শের দিকে আমরা যতটা এগিয়ে যাবো, দূরত্ব বজায় রেখে সেও ঠিক ততটাই পেছিয়ে যাবে। কিন্তু একথা ঠিক যে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ঐ আদর্শই আমাদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করবে। অবশ্য আমাদের গঠনমূলক প্রচেষ্টা হবে নিতান্তই সাময়িক এবং পরীক্ষামূলক। আদর্শে আমরা তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারছি না এই ধারণা আমাদের যেন নিরুৎসাহিত করে। স্থির ও আন্তরিক অনুসন্ধান আমাদের ক্রমশঃ উদ্দীপিত করবে। ক্রমাগত চেষ্টার ফলে সত্যকে হয়ত জানাও যেতে পারে। তাছাড়া যদি তা নাও সম্ভব হয়, সত্যানুসন্ধান নিজেই ত নিজের পুরস্কার।

চূড়ান্ত পর্যায়ে ধর্মদর্শন দর্শনের সঙ্গে এক হয়ে যায়। কারণ ধর্মের আলোচ্য বিষয় যে সত্য এবং দার্শনিক অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুও যে সত্য, এই উভয় সত্যের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। হেগেল যখন ধর্মীয় ধারনা ও দার্শনিক বৌদ্ধিক ধারণাকে এক বলে মন্তব্য করেছিলেন তখনো তিনি সম্ভবতঃ তাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। এই দুই চিন্তার মধ্যে বিষয়গত কোন পার্থক্য নেই। যা আছে তা হ'ল আকৃতিগত পার্থক্য। সত্য এক এবং অবিভাজ্য। আমরা পৃথক পৃথক অংশে সত্যকে চিন্তা করতে পারি না। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে যে বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত তাকে তখনই যথার্থ বলা যাবে যখন পূর্বশর্তের উত্তর নির্ভরশীল সামগ্রিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য থাকবে। কারণ অভিজ্ঞতাও সত্যের মত এক এবং অবিভাজ্য। তাকে কুড়ুল দিয়ে কেটে দু'ভাগ করা যায় না। মানুষের পার্থিব অভিজ্ঞতার মধ্যে যে তথ্য

ও সত্য রয়েছে এবং ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে যে তথ্য ও সত্য রয়েছে অন্তরে উভয়ের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ ঐকতান অবশ্যই থাকবে। তা না হ'লে অভিজ্ঞতা ও তার জগৎ পরস্পর দ্বিধাবিভক্ত এমন দু'টো ঘরের মত হবে যারা একের সাহায্য ব্যতীত অন্যে দাঁড়াতে অক্ষম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে বস্তুবাদ যদি দর্শনে সত্য হয় তাহ'লে সে ত ধর্মদর্শনে মিথ্যে হয়ে যেতে পারে না। চূড়ান্ত চিন্তনে ও বিশ্লেষণে ধর্মদর্শন ও দর্শনের মধ্যে প্রকৃত কোন পার্থক্য নেই। অবশ্য প্রাথমিক অবস্থায় বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গীতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকতেও পারে। প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য দার্শনিক তত্ত্ব কোন না কোন ধর্মদর্শনের মধ্যে এসে চূড়ান্ত প্রসার লাভ করেছে। এইসব এবং আরো কিছু চিন্তা করে কোন কোন চিন্তাবিদ দর্শন ছাড়া ধর্মদর্শনের সম্পূর্ণ পৃথক অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন।* কিন্তু যে সব অভিজ্ঞতা স্পষ্টতঃ ধর্মীয় এবং যে সব তথ্য ধর্মের পথ ধরে দার্শনিক সমস্যা হয়ে ওঠে, বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল সেই অভিজ্ঞতাগুলি আলোচনার জন্য ধর্মদর্শনকে দর্শনের থেকে পৃথক রাখা সুবিধাজনক। অবশ্য যেহেতু পরিশেষে সমস্যার বিশেষ ও সার্বিক আলোচনা একাকার হয়ে যায় সেইজন্য কোন বিশেষ আলোচনাকে কঠোরভাবে বিভাগীয় হিসাবে স্বীকার করা যায় না।

আবার এমন মনে হতে পারে যে ধর্মদর্শন ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ সুশৃঙ্খলভাবে সত্যকে ব্যাখ্যা করা উভয়েরই লক্ষ্য। বাস্তবে কিন্তু উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ধর্মতত্ত্ব হচ্ছে ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় উপদেশ। এই উপদেশগুলি কোন একটি ঐতিহাসিক ধর্মের উপর ভিত্তি করে ক্রমবিকশিত হয়েছে; যেমন—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, ইসলাম ধর্ম বা খৃষ্ট ধর্ম। এমন কি সংকীর্ণভাবে অনেক সম্প্রদায়কে আশ্রয় করেও ধর্মতত্ত্বের বিকাশ সম্ভব। যেমন—খৃষ্ট ধর্মের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক চার্চ, ক্যালভীন সম্প্রদায় ইত্যাদি। কিন্তু ধর্মদর্শন কোন বিশেষ ধর্মমত বা সাম্প্রদায়িক মত দিয়ে আলোচনা করে না। মনুষ্য জীবনের সমস্ত ধর্মীয় অভিজ্ঞতাই এর আলোচনার পরিধির মধ্যে পড়ে। সকল দর্শনের স্বীকৃত তথ্যগুলি ধর্মদর্শনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। আদিম মানুষের ধর্মমত থেকে বর্তমানের সর্বোত্তম ধর্ম ও সংস্কৃতি পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিবর্তনের ইতিহাসটিও ধর্মদর্শনের আলোচনার বিষয়।

*See, e g, R. G. Collingwood's Religion and Philosophy (1916). PP. 15f

ধর্মদর্শন সমগ্র ধর্মীয় চেতনার আলোচনা করে। কোন একটি বিশেষ ধর্মমতকে সে অন্যান্য ধর্মমতের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আলোচনা করে না অথবা কোন একটি ধর্মমতকে খেয়াল খুশি সত্য বা আদর্শ বলেও গ্রহণ করে না। ফিল্ডিং (Fielding)-এর Tom Jones (Book III chap III) গ্রন্থে রেভারেণ্ড মিঃ থোওয়াকাম (Mr. Thwackum) যে ভাবে বর্ণনা করেছেন ধর্মদর্শনের আলোচ্য বিষয় তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সেখানে তিনি বলেছেন 'যখন আমি ধর্ম বলি তখন বুঝতে হবে আমি খৃষ্ট ধর্মের কথা বলছি; কেবলমাত্র খৃষ্টধর্ম নয় আমি প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মের কথাই বলছি, আবার প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম বলতে আমি কেবল ইংলণ্ডের প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মের কথা বলছি।' একেবারে সূচনায় ধর্মতত্ত্বের হয়ত এরকম সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন থাকতে পারে কিন্তু ধর্মদর্শন এরকম কোন সংকীর্ণতাকে স্বীকার করতে পারে না। পরিশেষে ধর্মদর্শন হয়ত সকল রকম ধর্মমতকে অসম্পূর্ণ বলে পরিত্যাগ করে একটা আদর্শ ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কিন্তু সেটা তার অন্বেষণের লক্ষ্য নয় কিংবা কোন স্বীকৃত সত্য বা পূর্ব সিদ্ধান্তও নয়। [একটা আদর্শ ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করতে হবে এমন কোন লক্ষ্য নিয়ে ধর্মদর্শন তার সত্যান্বেষণ আরম্ভ করেনি]।

অতএব ধর্মদর্শন ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের ঠিক মধ্যস্থলটি অধিকার করে আছে। দর্শন সমগ্র অভিজ্ঞতার বৌদ্ধিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করে। ধর্মদর্শন অধিকতর নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অন্তরঙ্গ দিকটি আলোচনা করে। আর ধর্মতত্ত্ব বিশেষ এক ধরনের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা থেকে বা বিশেষ একটি ধর্মমত থেকে (যেমন খৃষ্ট ধর্মমত) স্বীকৃত সত্যগুলিকে প্রথম থেকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। অবশ্য এই পার্থক্য চূড়ান্ত নয়; নিতান্তই আপেক্ষিক। যেমন খৃষ্ট ধর্মমত জাতির সকল ধর্মমতের সঙ্গে (অখৃষ্ট ধর্মমতসহ) কমবেশী সুসংবদ্ধ। এমন কি সমগ্র মনুষ্য অভিজ্ঞতার (পার্থিব অভিজ্ঞতাসহ) সঙ্গেও এই ধর্মমতের বড় রকম কোন অসংগতি নেই। ধর্মতত্ত্ব যত তার দৃষ্টিভঙ্গীকে বিস্তৃত করবে ততই সে নিজেকে ধর্মদর্শনের দিকে প্রসারিত করবে। এর জন্য তার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জনের প্রয়োজন হয় না। বিপরীত পক্ষে ধর্মদর্শনও যদি তার নিরপেক্ষতা বিসর্জন না দিয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক ধর্মমতের সঙ্গে সহানুভূতিশীল সম্পর্ক স্থাপন করে তাতে তার বিষয়বস্তু গতিশীল ও সমৃদ্ধতর হয়। যদি ধর্মদর্শন কোন ধর্মমতের

সঙ্গে সম্পর্ক না রাখে তা হ'লে ধর্মদর্শন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন তত্ত্বমূলক আলোচনা মাত্র হয়ে উঠবে কিংবা ব্র্যাড্‌লে (Bradley) অন্য প্রসঙ্গে যেমন বলেছিলেন 'অনুভূতিশীল এক রকমের অপার্থিব ব্যালে নৃত্য' হয়ে উঠবে ধর্মদর্শন। কোঁতে (Comte) তাঁর 'Religion of Humanity' গ্রন্থেও এই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর মতে ধর্ম হল 'মনুষ্য মস্তিষ্কপ্রসূত একটি কৃত্রিম সৃষ্টি'। যা হোক কোঁতের (Comte) ধর্মমতের সাক্ষাৎ জলে স্থলে কোথাও পাওয়া যাবে না। কারণ ধর্মীয় আন্দোলনের ইতিহাসে মনুষ্য জীবনের যে স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনশীল উন্মাদনা থাকে, তা এখানে অনুপস্থিত। তবুও আমরা স্বীকার করি, তুলনামূলকভাবে ধর্মদর্শন অনেক স্বাধীন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারে। ধর্মতত্ত্ব সূচনা থেকে যেখানে বাইবেল, চার্চ অথবা বিশেষ ধর্মমতের সঙ্গে যুক্ত থাকে, ধর্মদর্শন সেখানে নীতিগতভাবে সত্য ব্যতীত আর কারও অধীনতা স্বীকার করে না। (শাস্ত্রানুসারী ধর্মতত্ত্বকে কখনো কখনো Dogmatics বলা হয়। আমরা মনে করি শব্দটির সঙ্গে দুর্লক্ষণ ও দুর্গন্ধ যুক্ত থাকে)। আমরা ডাঃ গ্যালওয়ের সঙ্গে একমত যে, "পরিশেষে উভয়েই পার্থিব কোন কিছুর প্রভুত্ব মেনে না নিয়ে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার প্রভুত্বকেই স্বীকার করে নেবে।"* ধর্মদর্শন ও ধর্মতত্ত্বের স্বীকৃত সত্যগুলিই যে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বাধাস্বরূপ, একথা আমরা বিশ্বাস করি। ধর্মদর্শন বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া কোন সত্যকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিতে পারে না।

বিরাট কর্মকাণ্ডের একটা সাধারণ সীমারেখা আমরা এই অধ্যায়ে দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়নি। এই গ্রন্থের নির্দিষ্ট পরিসরে বিষয়টির প্রতি সুবিচার করা কষ্টকর। বিশাল কর্মসূচীর কেবলমাত্র ভূমিকা হিসেবে বর্তমান আলোচনাটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

*George Galloway—The Philosophy of Religion (1914), P. 50

সংক্ষিপ্তসার

মনুষ্য সভ্যতার ইতিহাসে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। 'মানুষের ইতিহাস হল প্রকৃতপক্ষে ধর্মের ইতিহাস' ম্যাক্স্‌মূলরের এই উক্তিতে খুব একটা অতিশয়োক্তি নেই। এমন কোন আদিম মানব সমাজ ছিল না যেখানে ধর্মের ধারনা অজ্ঞাত ছিল। অবশ্য আজকের ধর্মমতের সঙ্গে আদিম ধর্মমতের পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক।

ধর্মদর্শনের পরিধি আলোচনা করতে গেলে ধর্মদর্শনের সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি শাস্ত্রের সম্পর্ক আলোচনা করা দরকার। আবার ধর্মদর্শনের আলোচ্য বিষয় নির্ণয়ের পূর্বে সামগ্রিকভাবে দর্শনের কি কাজ আগে সেটা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। কেবলমাত্র তথ্য সংগ্রহ করা দর্শনের কাজ নয়। ওটা বিজ্ঞানের কাজ। বিজ্ঞানের কাজ হল তথ্য সংগ্রহ করা। এবং সেই তথ্যগুলির শ্রেণীকরণ ও সামান্যীকরণ করা। অপরদিকে দর্শনের কাজ হ'ল তথ্যের অন্তর্নিহিত প্রকৃত অর্থটি আবিষ্কার করা। বিজ্ঞান অভিজ্ঞতার বিশেষ একটা দিক আলোচনা করে। দর্শন সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রহ্মাণ্ডকে আলোচনা করে।

ধর্মও এক ধরনের বিশেষ অভিজ্ঞতা। সুতরাং ধর্মকেও বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বলতে হবে। কিন্তু ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য জানতে গেলে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বিজ্ঞান বুদ্ধিভিত্তিক। কিন্তু ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় বুদ্ধির ভূমিকা গৌণ। ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধি অপেক্ষা অনুভূতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। ধর্ম অপার্থিব শক্তিতে বিশ্বাস করে। সে অপার্থিব শক্তির সাহায্য লাভ করতে চায়। তাছাড়া বুদ্ধিনিরপেক্ষ অনুভূতির সাহায্যে ধর্ম পরম সত্তাকে উপলব্ধি করতে চায়। এর কোনটি বিজ্ঞানের কাজ নয়। এখন ধর্মদর্শনের কাজ হ'ল ধর্মের প্রকৃতি, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সত্যতা এবং ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরমসত্তার উপলব্ধি সম্ভব কি না তা পর্যালোচনা করা।

বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা থেকে ধর্মদর্শন তার উপাত্ত সংগ্রহ করে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাগুলির মূল্যায়নের জন্য এবং কারণ নির্ণয় করার জন্য ধর্ম-দর্শনকে অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়। ধর্মদর্শনের কাজ দু'রকমের। (1) মানুষের জীবনের স্বাভাবিক ঘটনারূপে ধর্মের ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান। (2) ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে চরম সত্যের সম্পর্ক

নির্ণয়ের জন্য তাত্ত্বিক আলোচনা। এই দু'টি আলোচ্য বিষয়ের একটি ছাড়া অন্যটি অসম্পূর্ণ। ধর্মদর্শন ইতিহাস ছাড়া শূন্যগর্ভ এবং ধর্মীয় ইতিহাস দর্শন ছাড়া অন্ধ।

বিগতদিনের দার্শনিকেরা নৃতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি থেকে তথ্য সংগ্রহ না করেই কল্পনার সাহায্যে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেন। এই প্রচেষ্টাকে কখনই দার্শনিক প্রচেষ্টা বলা যায় না। ধর্ম কি? বা ধর্ম কাকে বলে? প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আগে নৃতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এবং একটা নীতি নির্ধারণ করে সেই তথ্যগুলিকে সুশৃংখল ও বোধগম্য করে তুলতে হবে।

প্রয়োগবাদী দার্শনিকেরা মনে করেন কোন তাত্ত্বিক প্রশ্ন ধর্মদর্শনের আওতায় পড়ে না। ধর্মদর্শনের কাজ হল কেবল ধর্মীয় ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ; একটি সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের অভিজ্ঞতাভিত্তিক আলোচনা। এই মতবাদকে 'দার্শনিক অভিজ্ঞতাবাদ' বলা হয়। বিগত যুগের কল্পনাপ্রবণ দার্শনিকেরা ধর্মের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এই মতবাদ হল তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। সে যাই হোক, ধর্মীয় আলোচনা থেকে 'রহস্যকে' একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ ধর্মের প্রকৃতি জানতে গেলে একটা শ্রদ্ধা-মিশ্রিত অজ্ঞেয়বাদের (শক্তিশালী কোন কিছু একটা আছে, কিন্তু সে কেমন জানা যায় না, এরকম একটা মানসিকতা) প্রয়োজন দেখা দেয়।

তাছাড়া ধর্মের মূলতত্ত্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝা যায় না। ধর্ম অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাসী। এই অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব ব্যতীত ধর্ম অর্থহীন। ধর্ম মানেই সত্য, আবার সত্য বলেই প্রয়োজনীয়। ধর্ম তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে। ধর্মীয় চেতনার মধ্যে যে জাগতিক ধারনা আছে তার বৌদ্ধিক ভিত্তি দান করা ধর্মদর্শনের কর্তব্য। যদি সে এই কাজ করতে অসমর্থ হয়, তা হ'লে ধর্মদর্শনের কাজ হবে ধর্মের অন্তঃসারশূন্য দিকটি সবার সামনে তুলে ধরা।

(1) ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বিষয়গুলিকে দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যায়। (a) মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী, (b) ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী। এই দুই দৃষ্টি-ভঙ্গীকে একেবারে পৃথক করা যায় না। আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস প্রভৃতি না থাকলে ঐতিহাসিক আলোচনা মূল্যহীন। আবার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি না জানলে বস্তুনিরপেক্ষ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা লাভ প্রায় অসম্ভব।

ধর্মদর্শনের কাজ হল, ধর্ম কি? ধর্ম কাকে বলে? প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং ধর্মের সঙ্গে নৈতিকতা, কলা, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির সম্পর্ক নির্ণয় করা। ধর্মের ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্রমবিকাশের আলোচনার আগে ধর্মের সংজ্ঞা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তাই ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের প্রশ্নটি প্রথম আলোচনা করতে হয়।

(2) জগৎ সম্পর্কে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর যথার্থতা বিচারের জন্য আলোচনাটিকে দু'ভাগে ভাগ করা সুবিধাজনক। প্রথমতঃ, জ্ঞানশাস্ত্র (epistemological) সম্পর্কিত সমস্যা। অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করা কি সম্ভব? বুদ্ধি দিয়ে যা জানা যায় না, ধর্মবিশ্বাস দিয়ে তা কি জানা যেতে পারে? দ্বিতীয়তঃ, তত্ত্ববিদ্যা (ontological) সংক্রান্ত সমস্যা। পরম সত্তার প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে কি, যাদ্বারা জগৎ সম্পর্কিত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে ন্যায়সঙ্গত অথবা ভ্রমাত্মক বলা যায়? এর জন্য বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে বুদ্ধিই একমাত্র উপাদান নয়। ধর্মীয় চেতনা হল মানুষের চিন্তা, ইচ্ছা, অনুভূতির যুগ্ম ফসল। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতি থেকে বিশ্বাসের সত্যটিকে বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব ধর্মদর্শনের। এটাই তার আদর্শ: আদর্শে হয়ত আমরা কখনো পৌঁছাতে পারবো না। কিন্তু সত্যানুসন্ধান নিজেই ত তার পুরস্কার।

দর্শন ও ধর্মদর্শন উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের আলোচ্য বিষয় সত্য। প্রাথমিক বিশ্লেষণে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য থাকলেও, চূড়ান্ত পর্যায়ে ধর্মদর্শন দর্শনের সঙ্গে এক হয়ে যায়। অনেকে মনে করেন, যে সব অভিজ্ঞতা স্পষ্টত: ধর্মীয়, সেই অভিজ্ঞতাগুলি আলোচনার জন্য ধর্মদর্শনের পৃথক অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন। কিন্তু পরিশেষে বিশেষ ও সার্বিক আলোচনা যখন এক হয়ে যায়, তখন কোন বিশেষ আলোচনাকে 'বিভাগীয়' বলে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না।

আবার ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মদর্শনের মধ্যে পার্থক্যও সুস্পষ্ট। ধর্মতত্ত্ব হল ধর্মশাস্ত্রের উপদেশাবলীর ব্যাখ্যা; কোন একটি ঐতিহাসিক ধর্মের (যেমন, খৃষ্ট, বুদ্ধ বা ইস্‌লাম) উপর ভিত্তি করে তার বিকাশ। কিন্তু ধর্মদর্শন সমস্ত ধর্মীয় অভিজ্ঞতার আলোচনা করে। কোন বিশেষ ধর্মমতের সংকীর্ণ পরিসরে সে আবদ্ধ থাকতে পারে না। কোন একটি ধর্মমতকে সে যথার্থ বা সর্বশ্রেষ্ঠ

হিসেবেও গ্রহণ করতে পারে না। হয়ত ধর্মদর্শনের আলোচনার ফলে একটি আদর্শ ধর্মমতের সাক্ষাৎ আমরা পেতে পারি, কিন্তু আদর্শ ধর্মপ্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য রেখে ধর্মদর্শন সত্যানুসন্ধান আরম্ভ করে না।

ধর্মতত্ত্বের অবস্থান ধর্মদর্শন ও দর্শনের মাঝখানে। দর্শন মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতার বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ করে। ধর্মদর্শন কেবল ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অন্তরঙ্গ দিকটি আলোচনা করে। আর ধর্মতত্ত্ব বিশেষ একটি ধর্মমতের স্বীকৃত সত্যগুলিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে আলোচনা আরম্ভ করে। এই পার্থক্য অবশ্য আপেক্ষিক। ধর্মতত্ত্ব যত তার দৃষ্টিভঙ্গী বিস্তৃত করে সে তত ধর্ম-দর্শনের কাছাকাছি এসে পড়ে। আর ধর্মদর্শনও যদি ঐতিহাসিক ধর্মমত-গুলির প্রতি সহানুভূতিশীল হয় তবে সে গতিশীল ও সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। এছাড়া উভয়েই অপার্থিব সত্তার অস্তিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

নৃতত্ত্বের আলোকে ধর্মের উৎপত্তি

ধর্মের স্বরূপ ও কার্যাবলী বিশ্লেষণ করা ধর্মদর্শনের অন্যতম প্রধান কাজ। ধর্ম কি? অথবা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ধর্ম কি উদ্দেশ্য সাধন করে?—প্রভৃতি প্রশ্নগুলি ধর্মদর্শনের আলোচ্য বিষয়। প্রথম ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের প্রশ্নটি ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সতর্কভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। তারপর ধর্মের স্বরূপ ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। নৃবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে আমাদের প্রথম জানতে হবে, মানুষ কেন বা কি ভাবে ধর্মীয় চেতনা লাভ করল। এবং সেই সঙ্গে জানতে হবে, ধর্ম তার সূচনার স্থূল অবস্থা থেকে কেন বা কি ভাবে বিবর্তিত হয়ে বর্তমানের উন্নত অবস্থা লাভ করেছে। এই জ্ঞান লাভের পর ধর্ম কি, এবং ধর্ম মনুষ্য জীবনের কি উদ্দেশ্য সাধন করেছে প্রভৃতি সমস্যাগুলির সমাধানের সহজ পথ আমরা আবিষ্কার করতে পারবো। প্রথমে তাহ'লে ধর্মের উৎপত্তির প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

প্রারম্ভেই পাঠকদের সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন যে ধর্মের উৎপত্তির সমস্যাটি একটি স্বতন্ত্র সমস্যা। এর সঙ্গে মূল্যায়নের সমস্যার কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম সূচনায় ছিল অত্যন্ত স্থূল। অর্থাৎ বলা যেতে পারে নিতান্ত অস্পষ্ট অনুলেখ্য অবস্থা থেকে ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু তাই বলে ধর্মের বর্তমান উন্নত অবস্থায় দাঁড়িয়ে মূল্যায়ন করে আদিম ধর্মকে অন্ধবিশ্বাস বলে সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করে দেওয়াটা ঠিক হবে না। বিজ্ঞান, নৈতিকতা, কলাবিদ্যা প্রভৃতিও প্রারম্ভিক অবস্থায় স্থূল ছিল। অনুন্নত অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নত অবস্থার বা উন্নত অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে অনুন্নত অবস্থার মূল্যায়ন অনুচিত। বিজ্ঞান, নৈতিকতা এবং কলাবিদ্যার সূচনায় স্থূলতা আছে বলে—দীর্ঘদিন ধরে অনেক দুঃখজনক অভিজ্ঞতা, এবং কখনো সার্থক আবার কখনো ভ্রান্ত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আজ এইসব শাস্ত্র যে সাফল্য লাভ করেছে সেই সাফল্যকে বা তার প্রচেষ্টাকে ছোট করা সঙ্গত নয়। যদি উৎপত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে পরিণতিকে কিংবা পরিণতির দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপত্তিকে বিচার করা হয় তাহ'লে দেখা যাবে সাফল্যের সার্থকতা সূচনার স্থূলতার মূল্য যতটা বৃদ্ধি করছে, সূচনার স্থূলতা সাফল্যের কৃতিত্বকে ততটা ম্লান করতে পারছে না। [মানুষের বর্তমান ধর্মীয় ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আদিম মানুষের ধর্মীয় ধারণার বিশ্লেষণ করলে তাকে ধর্ম বলেই মনে হবে না। সুতরাং আদিম

ধর্মীয় ধারণাকে বিশ্লেষণ করার সময় মূল্যায়নের প্রশ্ন,—অর্থাৎ সেটা খারাপ ছিল কি ভাল ছিল, কুসংস্কার ছিল কি যুক্তিযুক্ত ছিল—প্রভৃতি, বাদ দিয়েই তা করতে হবে।] ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে আমরা যদি কোন পূর্বসিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে আলোচনা আরম্ভ করি, তাহ'লে ধর্মের প্রকৃতি, মানুষের জীবনে ধর্মের গুরুত্ব প্রভৃতি, অনুসন্ধানের সূত্র খুঁজে পাবো।

1

ধর্মের উৎপত্তির বিষয়টি আধুনিক কাল পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচিত হয় নি। আধুনিক মতবাদগুলি আলোচনার আগে আমরা সংক্ষেপে দু'টি মতবাদের উল্লেখ করবো। উৎপত্তি প্রসঙ্গে এই মতবাদগুলি একসময় খুবই জনপ্রিয় ছিল। এখন অবশ্য মতবাদগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে অথবা যেতে বসেছে।

[a] প্রথম মতবাদটি অত্যন্ত প্রাচীন। এই মতবাদকে ঐশ্বরিক প্রতিভাসবাদ বা ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশবাদ বলা হয়। ইহুদি, খৃস্টান ও মুসলমান ধর্মমতে এই বিশ্বাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই মতবাদ আদিম একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হলেও পরবর্তীকালে এই মত থেকে বহু ঈশ্বরবাদের পুনর্জন্ম হয়েছে। ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশবাদে ধর্মের উৎপত্তির প্রসঙ্গটি অত্যন্ত বৌদ্ধিক ও যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই মতানুসারে একসঙ্গে তৈরী করা ঢালাও কতকগুলো ধারণা মানুষের শূন্য মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেবার ফলে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি অত্যন্ত স্থূল ও অমনস্তাত্ত্বিক মতবাদ। এই মতানুযায়ী প্রত্যাদেশ ঈশ্বরের একটা ক্রিয়া মাত্র। মানুষের অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ কি ভাবে এই প্রত্যাদেশকে প্রভাবিত করল এবং মানুষ কি ভাবে এই প্রত্যাদেশকে গ্রহণ করল সে সব কিছু জানতে এই মতবাদ আমাদের সাহায্য করে না। এই প্রসঙ্গে শেলিং (Schelling)-এর সমালোচনা খুবই যুক্তিযুক্ত। কোন এক সময় ঐশ্বরিক সংস্পর্শে এসে এবং ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ লাভ করেই যদি মানুষ ধার্মিক হয়ে ওঠে তাহ'ল মেনে নিতে হয় যে ঈশ্বরের সংস্পর্শে আসার আগে মানুষ ধর্মহীন ছিল। তারা নিরীশ্বরবাদী ছিল। আবার যদি মেনে নেওয়া হয় যে মানুষ নিরীশ্বরবাদী ছিল এবং তাদের কোন ধর্মীয় ধারণা ছিল না, তাহ'লে সেই মানুষ কি করে প্রত্যাদেশের ফলে ধর্মীয় চেতনা লাভ করল ? বিষয়টিকে অবিশ্বাস্য মনে হয়। সমস্যাটি সমাধানের অযোগ্য না হ'লেও এখনো এর সমাধান করা সম্ভব হয় নি। যে মনের কোন ধর্মবোধ বা কোন ধর্মীয় চেতনা নেই একেবারে বাহ্যিক প্রত্যাদেশ থেকে সেই মনে কি করে ধর্মীয় ধারণার সৃষ্টি

হতে পারে? অবশ্য এই ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশবাদের প্রয়োজনীয়তা আছে। এর ফলে ধর্মবিশ্বাসের একটা বাস্তব ভিত্তি পাওয়া যায় এবং ধর্মের সার্থকতা প্রমাণেরও সুবিধে হয়। তাছাড়া মানুষের ধর্মীয় জীবনে ঈশ্বরের নেতৃত্ব রক্ষা করার জন্যও এই মতবাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু (সে ক্ষেত্রেও) এই প্রত্যাদেশের ধারাবাহিকতা থাকা দরকার এবং মানুষের সেই সময়ের গ্রহণ করার ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতি রাখা প্রয়োজন। প্রত্যাদেশকে কেবল বাহ্যিক বা শাশ্বত হলে চলবে না; আবার যথেচ্ছ নির্ধারিত কয়েকজনের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেও একে আটকে রাখা ঠিক নয়। [কেবলমাত্র ধর্মযাজক বা পুরোহিতরাই এই প্রত্যাদেশ পাওয়ার অধিকারী হবেন কেন?] অধিকন্তু স্বর্গ থেকে কিছুটা বৌদ্ধিক জ্ঞান বা কতকগুলো ধারণা মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেওয়াকে প্রত্যাদেশ বলে না। প্রত্যাদেশ হবে মানুষের সামগ্রিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। সে যাই হোক, প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রকাশিত ধর্মীয় ধারণার মত উন্নত ও জটিল ধারণা গ্রহণ করার ক্ষমতা যে আদিম মানুষের একেবারে ছিল না, বিবর্তনের ইতিহাস থেকে আমরা সে তথ্য জানতে পেরেছি।

[b] অপর মতবাদটি হল অষ্টাদশ শতকের তথাকথিত বৃটিশ অতিবর্তী দার্শনিকদের মতবাদ। এই চিন্তাবিদেরা ঈশ্বরের আবির্ভাব বা প্রত্যাদেশের ফলে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে একথা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে মানুষের বিচারবুদ্ধি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। ধর্মের মৌলিক সত্যগুলি হল ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরতা, নৈতিক নিয়মের প্রভুত্ব প্রভৃতি। এই সত্যগুলি যুক্তিসিদ্ধ। এই যৌক্তিক সত্যগুলি হল সকল স্বাভাবিক ধর্মের উপাদান। জগতে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে এই সাধারণ উপাদানগুলি পরিলক্ষিত হয়। এইসব দার্শনিকদের অভিমত হল গাণিতিক সত্যের মত এই উপাদানগুলিরও সুনিশ্চয় জ্ঞানলাভ সম্ভব। মানুষের পক্ষে যুক্তি দিয়ে ধর্মজ্ঞান লাভ করাই স্বাভাবিক। [যেহেতু তারা বুদ্ধিমান প্রাণী।] এইসব ধর্মজ্ঞান তাদের প্রথম থেকেই ছিল। কিন্তু এক সময় পুরোহিত ও ধর্মযাজকেরা জনগণকে আয়ত্তে রাখার জন্য তাদের ভীতি ও বিশ্বাসপ্রবণতাকে নিজেদের কাজে লাগানোর অপকৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ফলে স্বাভাবিক ধর্মবিশ্বাসের স্থান দখল করেছিল ব্যাপক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার। তাহ'লে ধর্মের উৎপত্তি হল দু'ভাবে—(1) বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন স্বাভাবিক ধর্ম, (2) পুরোহিতদের প্রতারণা থেকে উদ্ভূত সমস্ত প্রকৃত ঐতিহাসিক ধর্ম। পুরোহিতদের দুর্নীতি প্রবেশ করার

আগে আদিম মানুষের ধর্মবিশ্বাস ছিল অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও সুসম্পূর্ণ। পরবর্তী-কালের সংযোজনগুলি কেবলমাত্র অপ্রয়োজনীয়ই নয় ভ্রান্ত ও দুরভিসন্ধিমূলক। চারবেরীর লর্ড হারবার্ট (Lord Herbert)* এবং জন টোল্যাণ্ড (John Toland)† ইংলিস অতিবর্তীবাদের প্রথম প্রবর্তক। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে La Mettrc, D. Alembert, Voltaire প্রভৃতি ফরাসী চিন্তাবিদেরা এই মতবাদের সমর্থন করেন। প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যেও এই মতের অনেক সমর্থক ছিল। কিন্তু এই মতবাদ এখন সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কারণ এর কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি ছিল। (a) এই মতবাদে ধর্মের উৎপত্তির কারণ হিসেবে যুক্তিকে খুব বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এবং যে আবেগ ও সংজ্ঞার দীপ্তি ধর্মীয় অভিজ্ঞতার উৎস হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাদের অবজ্ঞা করা হয়েছে। (b) এই মতাবলম্বীদের ঐতিহাসিক চেতনার অভাব ছিল। তাই যে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ কেবল ধর্মে নয়, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সক্রিয়, তাকেও এই মতবাদে অবহেলা করা হয়েছে। আদিম মানুষেরা ধর্মীয় চিন্তার মত একটি পরিণত চিন্তা করতে সক্ষম—এই ধারণাও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ ধর্মীয় ধারণার উপলব্ধি করতে মানুষের অনেক যুগ সময় লেগেছিল। ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ মতবাদেও আমরা একই ত্রুটি লক্ষ্য করেছি। (c) এই মতবাদের সবচেয়ে অবাস্তব যুক্তি হল যে স্বার্থপর ও লোভী পুরোহিতেরা সুচিন্তিত ভণ্ডামির সাহায্যে ঐতিহাসিক ধর্মমতগুলি আবিষ্কার করেছিল। পুরোহিতেরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রায়ই যে মানুষের ধর্মপ্রবণতার সুযোগ গ্রহণ করত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরোহিতদের এই অপচেষ্টার পূর্বে যে বিশ্বাসের অস্তিত্ব ছিল তাকেই কেবল তারা কাজে লাগাতে পেরেছিল। পুরোহিতেরা স্রষ্টা ছিল না, তারা ছিল সংরক্ষক‡। প্রকৃত স্রষ্টা ছিলেন অবতারেরা। বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব প্রভৃতির সঙ্গে তাঁদের প্রায় কোন সম্পর্কই ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক ধর্মের উৎপত্তিতে পুরোহিত অপেক্ষা সাধারণ মানুষের অবদান বেশি। এই ছিদ্রান্বেষী মতবাদ অনুসারে, ধর্ম একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আবিষ্কার। মানুষের স্বভাবের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হিসেবে ধর্মকে

* De Religione Gentilium, Publisbed Posthumously in 1663

† Christianity not Mystetrics 1696.

‡ Ch. M. Jastrow, The Study of Religion (1901), PP. 19, 180.

ব্যাখ্যা করতে এই মত অসমর্থ। এই মতকে কোনভাবেই সমর্থন করা যায় না। বর্তমানে এর কোন সমর্থকও নেই।

এইসব প্রাক্-বৈজ্ঞানিক প্রাচীন মতবাদগুলির আলোচনা এখন আর আমরা করবো না। এখন ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ আলোচনা করবো। নৃতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই আলোচনা হতে পারে। নৃতত্ত্ব ধর্মের ঐতিহাসিক, কিংবা বলা যেতে পারে প্রাগৈতিহাসিক উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করে। যেমন—দেশে কালে ধর্ম কি ভাবে আবির্ভূত হল? মানুষের ধার্মিক প্রকৃতি কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করল? যে আদিম ধর্ম থেকে সকল রকম ধর্মের ক্রমবিকাশ ঘটেছে বলে অনুমান করা হয় সেই ধর্মের একেবারে আদিরূপটি কি ছিল?—ইত্যাদি। অপরদিকে মনস্তত্ত্বের সমস্যা হল—কেবল সূচনাতেই নয়, সর্বদেশে ও সর্বকালে মানুষের কোন্ আত্মিক প্রকৃতি থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে? মানুষের মনের গহনে, কোন্ অপরিবর্তনীয় উপাদানগুলি পরিবেশের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে ধর্মীয় মনোভাব লাভ করেছে? কোন্ তীব্র আকাঙ্ক্ষা, প্ররোচনা, সংকল্প বা প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ অতীন্দ্রিয় শক্তিকে উপলব্ধি করেছে এবং নিজের জীবনকে সেই উপলব্ধির উপযোগী করে তুলেছে? মানুষের মনে এমন ধারণা কি করে জন্মে যে যেখানে মানুষ আছে সেখানে কোন না কোন রূপে ধর্মও আছে? এই দুই প্রস্থ প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে অবিচ্ছেদ্য। নৃবিজ্ঞানিগণ তাঁদের সমস্যা সমাধানের জন্য মনোবিজ্ঞানীদের সাহায্য যেমন প্রত্যাশা করেন একইভাবে মনোবিজ্ঞানীরাও নৃবিজ্ঞানীদের সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করেন। বিশেষ করে নৃবিজ্ঞানী আদিম মানুষের ধর্ম বিষয়ে কিছু বলার আগে আদিম মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের প্রয়োজন বোধ করেন। বস্তুতপক্ষে তাঁদের কাজকে মনোবৈজ্ঞানিক বলা যেতে পারে। কারণ প্রাচীনতম ধর্মগুলির যেমন বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহ্য নেই তেমনি কোন লিখিত প্রামাণ্য দলিলও নেই। তাঁরা ইতিহাস অনুসরণ করে যেমন ধর্মের আদিতে গিয়েও পৌঁছাতে পারেন না, তেমনি মানুষ কি করে ক্রমশ ধর্মমুখী হয়ে উঠল সে আলোচনা করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ ইতিহাসের সূচনা কালেই মানুষ পুরোপুরি ধার্মিক হয়ে উঠেছিল। [মানুষের ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে ধর্মের ইতিহাস থেকে।] তা হলেও আধুনিক কালের অসভ্য মনুষ ও শিশুদের মন ও তাদের জীবনধারা সহানুভূতির

সঙ্গে পর্যালোচনা করে এবং গঠনমূলক কল্পনার ভিত্তিতে তথ্য বিশ্লেষণ করে নৃবিজ্ঞানী আমাদের জন্য আদিম মানুষের ধর্মীয় ধারণার পুনর্গঠন করতে পারেন। তাঁর এই পুনর্গঠন হবে সম্পূর্ণ অনুমানসিদ্ধ। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে আমরা অসভ্যদের ধর্ম' সম্পর্কে অনেক তথ্য পেয়েছি। এর সাহায্যে আমরা সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের ধর্ম'বিশ্বাসকে ধর্মে'র উৎসরূপে অথবা উৎস-সদৃশ রূপে গণ্য করতে পারি। কিন্তু তা হ'লেও ভুললে চলবে না যে এই জ্ঞান অনুমান মাত্র। এবং এই অনুমানের সত্যতা মনোবৈজ্ঞানিক পরিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। মানুষের মনের কোন গহনে ধর্মে'র উৎসটি রয়েছে, আমাদের প্রধান আগ্রহ হল সেই জ্ঞান লাভ করার। এই মনস্তাত্ত্বিক আগ্রহ নিবৃত্তির কাজে সাহায্য করবে ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব। এর অর্থ, ধর্মে'র স্বরূপ আবিষ্কারের সফল পদ্ধতি হল, হফডিং (Hoffding)-এর ভাষায় 'মনস্তাত্ত্বিক উৎপত্তি বিষয়ক পদ্ধতি'। এই কথা মনে রেখে আমরা প্রথম কয়েকটি আধুনিক নৃতাত্ত্বিক মতবাদ আলোচনা করবো। তারপর আরও সুনির্দি'ষ্টভাবে মনস্তাত্ত্বিক মতবাদগুলি আলোচনা করবো। অজস্র মতবাদের মধ্যে আমাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাত্র মতবাদ এখানে আলোচনা করা সম্ভব হবে।

2

টাইলরের (E. B. Tylor) সর্বপ্রাণবাদ। টাইলরের (Tylor) সর্বপ্রাণবাদকে ধর্মে'র উৎপত্তি বিষয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক মতবাদ বলা যেতে পারে। এখানে আদিম নর-নারীর মন ও আচার-আচরণের সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। টাইলর (Tylor) তাঁর বিশাল গ্রন্থ 'আদিম সংস্কৃতি'তে (১ম সংস্করণ 1871, তৃতীয় সংস্করণ 1891) প্রথম এই মতবাদ ব্যক্ত করেন। সংস্কৃতির একটা স্তরে মানুষ প্রকৃতির সকল বিষয়কে সপ্রাণ বলে ভাবত। গাছ, নদী, পর্বত, মেঘ, প্রস্তর, নক্ষত্র সবকিছুকে তারা প্রাণবান বলে মনে করত। আদিম মানুষ যা কিছু দেখত নিজেদের মত তাদের সবকিছুকেও সপ্রাণ বা সজীব বলে ভাবত। আদিম মানুষের একটিমাত্র যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা ছিল। সেটি হল সাদৃশ্যের নীতি। তারা যে এই যুক্তি প্রয়োগ করছে সে সম্পর্কে তারা সচেতন থাকত না। সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে নিজেদের অভিজ্ঞতা ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ জিনিসের উপর আরোপ করত। চারদিকে মানুষ যে সব গতি প্রত্যক্ষ করত নিজেদের গতির সাদৃশ্যে সে তাদের ব্যাখ্যা করত। তাদের

তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতায় তারা বুঝতে পারত যে নিজেদের গতির কারণ হল তাদের আত্মা অথবা সেই আত্মার ইচ্ছা। আদিম মানুষের মত বর্তমান যুগের অসভ্যরাও মনে করে যে সমগ্র প্রকৃতি প্রাণময়, অসংখ্য আত্মায় পরিপূর্ণ। টাইলরের (Tylor) মতে সর্বপ্রাণবাদ থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। কিছু কিছু আত্মার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। অসংখ্য আত্মার জগৎ পরিব্যাপ্ত। এই জ্ঞানলাভের পর তারা ক্ষমতাশালী আত্মাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছে এবং সেই সঙ্গে অশুভ আত্মাগুলিকে বিতাড়িত করতে চেয়েছে।

টাইলরের (Tylor) নৃতাত্ত্বিক গবেষণা ও তাঁর মতবাদ ধর্মীয় আলোচনার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এখন সাধারণভাবে এটা সকলে স্বীকার করে নিয়েছে যে সভ্যতার কোন একটা স্তরে সকল মানুষ সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাস করত। তবু ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ক আলোচনায় এই মতকে সন্তোষজনক বলা চলে না। (1) প্রাণবাদকে সাধারণত ধর্মের প্রারম্ভিক অবস্থা বলা হয়। তা ঠিক নয়। বস্তুতপক্ষে এই মতবাদকে প্রারম্ভিক দর্শন বলা যেতে পারে। হফ্‌ডিং (Hoffding) বলেছেন 'প্রাণবাদ মনুষ্যধর্মচিন্তার একেবারে প্রাথমিক রূপ*। প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত সকল রকম আত্মা ধর্মীয় আচার বা ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টি করতে পারে নি, বা সকল আত্মাকেও মানুষ উপাসনা করে নি। মানুষ কেন কতিপয় আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চাইল আর অন্য আত্মাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করল না—এই প্রশ্নের আলোচনার জন্য মানুষের অভিপ্রায় বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয়। উপাসক তার শ্রদ্ধেয় বিষয়গুলির মধ্যে এমন কিছু দেখেছে যা তার মনে গভীর আবেগ সৃষ্টি করতে পেরেছে এবং বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। উপাসনার সঙ্গে নির্বাচনের প্রশ্নটি যুক্ত। নির্বাচনের জন্য একটি উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে সমাধানের সূত্রটি রয়েছে মনোবিজ্ঞানেরই হাতে। অতিপ্রাকৃত সত্তা, অথবা যে শক্তি তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে তার প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়াকে ধর্ম বলে। কিন্তু অলৌকিকতা

* যে ত্রুটির উল্লেখ করা হল তার জন্য টাইলরের (Tylor) নিজের কোন দোষ নেই। তাঁর কাছে সর্বপ্রাণবাদ ধর্ম নয়, ধর্মের ভিত্তি, এক রকমের ধর্মদর্শন। 'বস্তুতপক্ষে সর্বপ্রাণবাদ হল ধর্মদর্শনের বনিয়াদ। কথাটা আদিম মানুষ ও সুসভ্য মানুষ উভয়ের ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য'। Primitive Culture (3rd Ed. Vol. I, P. 426)

কোনভাবে সর্বপ্রাণবাদের অঙ্গ নয়। কারণ সর্বপ্রাণবাদ কোন সত্তায় অতিমানবীয় ক্ষমতা আরোপ করে না, মানবীয় শক্তিই আরোপ করে। জেভন্‌স্‌ (Dr. Jevons) বলেছেন নদীর অবিরাম প্রবাহ আমাদের কাছে যেমন, আদিম নরনারীদের কাছেও তেমনি প্রাকৃতিক ঘটনাই ছিল। যদিও আদিম মানুষ নদীকে অন্যান্য প্রাকৃতিক বিষয়ের মত প্রাণবান বা আত্মাযুক্ত ভাবত, তা হ'লেও নদীর গতির মধ্যে তারা অপ্রাকৃত বা রহস্যময় কোন কিছু দেখে নি। তারা বিশ্বাস করত নদীর এই প্রবাহের পেছনে রয়েছে নদীর ইচ্ছা (যেমন মানুষের থাকে)। এই ঘটনার মধ্যে তারা অস্বাভাবিক কোন কিছু দেখে নি। স্বাভাবিক বিষয়ের সঙ্গে কিন্তু আবেগের কোন সম্পর্ক নেই। সেইজন্য এই সব বিষয় থেকে কখনো ধর্মীয় বিস্ময়, শ্রদ্ধা বা উপাসনার সৃষ্টি হতে পারে না। তাই সর্বপ্রাণবাদ থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে একথা আমরা স্বীকার করি না। আমরা এই-মাত্র বলতে পারি, আদিম মানুষের সমগ্র জীবনের উপর সর্বপ্রাণবাদের যেমন একটা প্রভাব ছিল তেমনি ধর্মের উপরেও এই বিশ্বাসের একটা প্রভাব ছিল। (2) এমন কি দর্শন হিসেবেও সর্বপ্রাণবাদ খুব প্রাচীন নয়। এই মতবাদের সঙ্গে আত্মার ধারণা সংযুক্ত। দীর্ঘ দিন ধরে বেশ কিছু চিন্তা-ভাবনার ফলে মানুষ এমন একটি ধারণা (আত্মার মত জটিল একটি ধারণা) লাভ করতে পারে। বিশেষ কোন সত্তা হিসেবে আত্মার ধারণা যথেষ্ট পরিণত চিন্তার ফল। এই রকম একটি ধারণা লাভ করা আদিম মানুষের সাধ্যাতীত ছিল। প্রত্যেক প্রাকৃতিক বিষয় প্রাণময়—এই বিশ্বাস লাভ করার পর মানুষ ধর্মীয় ধারণা লাভ করেছে—এই ধরনের যুক্তি সমর্থন করা যায় না। সেইজন্য বিশেষজ্ঞরা সর্বপ্রাণবাদের পূর্বেও ধর্মের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেছেন।

হার্বার্ট স্পেনসারের (Herbert Spencer) পূর্বপুরুষ উপাসনাবাদ

প্রেতাত্মারূপে আবির্ভূত পূর্বপুরুষদের উপাসনা থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে স্পেনসারের (Spencer) এই সুপরিচিত মতবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা যেতে পারে। পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে একটা সশ্রদ্ধ ভীতি অসভ্য জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে রয়েছে। যতই আমরা দূর অতীতের দিকে অন্বেষণ করবো, পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশ্যে উপাসনার লক্ষণ সর্বত্র দেখতে পাবো। হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) একেই ধর্মের আদিম রূপ বলে বিশ্বাস করেন। এই ধর্মই কালে বিভিন্ন রূপে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। জীবিত মানুষের নিয়ন্ত্রণের

বাইরে যারা চলে গেছে, সেই মৃতের প্রতি ভয় থেকে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ, আচার-অনুষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে। সর্বপ্রাণবাদ কোন মৌলিক মতবাদ নয়, অন্য মত থেকে গৃহীত। মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মা প্রেতাত্মারূপে পুনরাবির্ভূত হয় এবং বাসস্থান হিসেবে কিছু কিছু প্রাকৃতিক জিনিস পছন্দ করে নেয়—এই বিশ্বাসের সর্বজনীন রূপই হ'ল সর্বপ্রাণবাদ। [অর্থাৎ প্রেতাত্মাদের বাসস্থল হিসেবে কয়েকটি প্রাকৃতিক বস্তু প্রাণবান হয়ে ওঠে। ক্রমে মানুষ বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে যে সমগ্র প্রকৃতি প্রাণবান] জবাবে বলা যেতে পারে যে প্রেতাত্মা উপাসনাই হ'ল সর্বপ্রাণবাদের বিশেষ রূপ। যাইহোক, স্পেনসারের (Spencer) মতবাদটি 'অতি সারল্য দোষে দুষ্ট'। তিনি এখানে একটি জটিল সমস্যার অতি সহজ সমাধান দেবার চেষ্টা করেছেন। পূর্বপুরুষদের উপাস্য করে তোলার সংকীর্ণ যুক্তির উপর ধর্মের কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব নয়। "ধর্ম একটি অত্যন্ত জটিল বিষয়। একে কোন একটিমাত্র সামাজিক রীতির বৃদ্ধি বা বিস্তৃতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। যতই আদিম রূপের হোক না কেন উপাসনাকে কোন একটিমাত্র চিন্তার বা একটিমাত্র আবেগের প্রকাশ বলা যায় না। বরং ধর্ম হল অনেকগুলি জটিল ও শক্তিশালী চিন্তার সৃষ্টি। এই সৃষ্টির প্রকাশ ঘটবেই। যেমন পাহাড় হ'তে বিভিন্ন দিক থেকে নেমে আসা স্রোতোধারায় স্ফীত হয়ে নদী উপচে পড়ে।"* জেভন্‌স্ (Dr. Jevons) স্পষ্টই তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন 'মৃতের আত্মাকে কখনো ঈশ্বররূপে চিন্তা করা হয় নি। মানুষ ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, কিন্তু মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মা মানুষের উপর নির্ভর করে। উপাসকের ধর্ম এই যে তার পূর্বপুরুষ ঈশ্বর ছিলেন, অতএব অমর। ঘটনাটা হল, পূর্বপুরুষদের যখন মানুষ হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে তখন আর তিনি ঈশ্বররূপে উপাস্য থাকছেন না; বিপরীত পক্ষে পূর্বপুরুষেরা যখন ঈশ্বররূপে উপাস্য হয়ে উঠছেন তখন আর তাঁদের মানুষ বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে না।"† কথাটির মধ্যে অত্যুক্তি থাকতে পারে। কিন্তু একথা বলতে অসুবিধে নেই যে পূর্বপুরুষদের আত্মার বিশ্বাসী সকল অসভ্য জাতি পূর্বপুরুষদের উপাস্য করে তোলে নি। (যেমন মধ্য অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসিগণ। এ'রা অত্যন্ত প্রাচীন সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ।

* **M. Jastrow, The Study of Religion (1901), P. 185**

† **F. B. Jevons, An Introduction to the History of Religion (1896) PP. 196 f.**

পূর্বপুরুষদের আত্মার পুনরাবির্ভাবে এঁরা বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাদের উপাসনা করেন না)। স্পেন্সারের (Spencer) কল্পনা মত অমরা অসভ্যদের মধ্যে প্রেত উপাসনার বহুল প্রচলন দেখি নি। প্রাকৃতিক শক্তি উপাসনা অপেক্ষা প্রেতাত্মা উপাসনা অধিকতর প্রাচীন—এ মতও সমর্থনযোগ্য নয়।

টোটেমবাদ ঃ ধর্মের প্রাচীনতম এবং সহজতম রূপ।

অনেকের মতে টোটেমবাদ ধর্মের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও আদিম রূপ। টোটেম বিশ্বাস এমন এক অস্বাভাবিক জটিল ঘটনা যার বিভ্রান্তিকর জটিলতাকে আমরা এখানে সম্ভবত বর্ণনা করতে পারবো না। এক ধরনের প্রাণী বা লতাগুল্মের প্রজাতি বা কখনো কখনো এক শ্রেণীর জড় বস্তুর সঙ্গে একটি সামাজিক গোষ্ঠী যখন বিশেষ অন্তরঙ্গভাবে বন্ধুতা ও আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত হয় তখন সেই প্রাণী, বা লতাগুল্ম বা জড়বস্তুকে টোটেম বলা হয়। প্রায়ই টোটেমকে গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ হিসেবে গণ্য করা হয়। এবং সেই সামাজিক গোষ্ঠীর নাম-করণও টোটেমের নাম অনুসারে হয়। টোটেম ঠিক ঈশ্বর নয়; সমজাতীয় বা সমগোত্রীয় শ্রদ্ধার পাত্র। সাধারণ কাজে একে আদৌ ব্যবহার করা যায় না। পবিত্রভাবে উৎসর্গ না করে একে হত্যা করাও যায় না, খাওয়াও যায় না। টোটেমকে অবশ্যই একটি প্রজাতি হতে হবে। কোন একটিমাত্র গাছ বা একটিমাত্র প্রাণীকে টোটেম বলে ধরা হয় না। রবার্টসন স্মিথ (W. Robertson Smith) তাঁর Religion of the Semities (1885) গ্রন্থে যুক্তিনিষ্ঠ জোরালো সমর্থন জানানোর ফলে টোটেমবাদ থেকে উপাসনার উৎপত্তি হয়েছে—এই মত যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল। পরবর্তীকালে জেভন্স (F. B. Jevons) তাঁর Introduction to the History of Religion (1896) গ্রন্থে এই মতবাদের আরও উন্নতি সাধন করেন। স্মিথের (Smith) মতে সব রকম উৎসর্গের পদ্ধতি উদ্ভূত হয়েছিল টোটেমবাদ থেকে। তাঁর প্রতিভাদীপ্ত জোরালো যুক্তি ধর্মের বিজ্ঞান-ভিত্তিক অনুষ্ঠানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু বর্তমানের ধর্ম-সম্পর্কিত সকল তথ্য বিশ্লেষণ করতে এই মত পর্যাপ্ত নয়। জেভন্সের (Jevons) মতে "টোটেমবাদ হল সমাজের একেবারে আদিমরূপ" (পৃঃ 99)। "এক সময় এই বিশ্বাস ছিল বিশ্বব্যাপী" (পৃঃ 117)। টোটেমবাদ থেকেই বহু ঈশ্বরবাদের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে (পৃঃ 395)। তিনি অবশ্য টোটেমবাদকে ধর্মের "একেবারে আদি অবস্থা" বলে দাবি করেন নি।

কারণ তিনি "প্রাক্-টোটেমীয় অবস্থার কথাও বলেছেন। কিন্তু সেই অবস্থায় 'ধর্মবিশ্বাসের প্রকৃতি' 'পুরোপুরি অনুমানের বিষয়' বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন (পৃঃ 413)। "বহির্জগতে জন্তু-জানোয়ারেরাই ছিল প্রথম উপাস্য এবং টোটেমবাদ ছিল সেই উপাসনার আদিম রূপ। এবং 'দীর্ঘদিন ধরে মানুষের একটিমাত্র উপাস্য ছিল যাকে টোটেম বা গোষ্ঠীদেবতা বলা যেতে পারে' (পৃঃ 411)। 'এই বিশ্বাসকে একেশ্বরবাদ বলা যেতে পারে' (পৃ 411)। জেভন্স (Jevons) এখানে যা বোঝাতে চেয়েছেন তাতে Monotheian (একেশ্বরবাদ) শব্দটি অপেক্ষা Monolatry [অন্য সত্তাকে অবিশ্বাস না করেও একটিমাত্র সত্তাকে উপাসনা করা] শব্দটি মনে হয় অধিকতর অর্থবহ হবে।

এই মতবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, প্রত্যেক ধর্ম টোটেম-স্তর অতিক্রম করে এসেছে এই মত অত্যাধুনিক গবেষণায় স্বীকৃত হয় নি। টোটেমবাদের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই মতবাদের সর্বজনীনতাকে প্রমাণ করা সহজ নয়। অনেক অসভ্য সমাজে এই বিশ্বাস একেবারে অজ্ঞাত। অন্তত এখন তাদের মধ্যে এই বিশ্বাসের প্রচলন নেই। উদাহরণ স্বরূপ, শ্রীলঙ্কার ভেদা উপজাতি (এরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত) বা আন্দামানের অধিবাসী অথবা নিম্ন ব্রাজিলের উপজাতি। এদের মধ্যে কোন টোটেম বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয় না। অপর উপজাতি (যেমন মধ্য অস্ট্রেলিয়ার উপজাতি) টোটেম বিশ্বাস করে কিন্তু উপাসনা করে না। তাদের কাছে টোটেম কোন দেবদেবী নয়। যদিও টোটেমবাদ ধর্মের সীমাসংলগ্ন তবুও টোটেমবাদকে কখনো সঠিকভাবে ধর্ম বলা যেতে পারে না। টোটেমবাদকে কোন বিশেষ ধরনের আদিম ধর্ম না বলে একটি সামাজিক বা উপজাতীয় সংগঠন বলা যেতে পারে। যা হোক, জেভন্স (Dr. Jevons) তাঁর পরবর্তী রচনায় এই মত কিছুটা পরিবর্তন করেছেন।

ফরাসী সমাজবিজ্ঞানিগণ বর্তমান কালে এই মতবাদের একটি নতুন রূপ দিয়েছেন। দুর্খাঁ (Emile Durkheim) তাঁদের মধ্যে সমধিক বিখ্যাত। তাঁর মতে এখন যে সব ধর্মবিশ্বাসের সন্ধান সম্ভব, টোটেমবাদ তাদের মধ্যে সহজতম এবং সর্বপেক্ষা প্রাচীন। তিনি যদিও টোটেমের সর্বজনীন অস্তিত্ব সম্পর্কে দ্বিধা পোষণ করেন তবুও এই বিশ্বাসকে সমাজের ও ধর্মের আদিরূপ হিসেবে মেনে নিতে তাঁর কোন আপত্তি নেই।

জীবন নিয়ন্ত্রণকারী নৈর্ব্যক্তিক রহস্যময় শক্তির ধারণাই হল ধর্মীয় বিশ্বাসের আধার। এবং ব্যক্তির উপর সমাজের প্রভুত্ব থেকে এই শক্তির ধারণা জন্মায়। ব্যক্তির উপর গোষ্ঠী-শক্তির প্রভাব থেকে মানুষ জগতে রহস্যময় শক্তির চেতনা লাভ করেছিল। টোটেম ঐ শক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতীক। কিন্তু যে সত্তা ঐ টোটেমের পশ্চাতে থাকে অথবা টোটেম যে সত্তার প্রতীক মাত্র তা হ'ল সামাজিক রীতিনীতি, আবেগ ও চিন্তার শক্তি। এই শক্তিই প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি-জীবনের উপর প্রভুত্ব করে। মানুষের প্রকৃত ঈশ্বর হল সমাজ। সমাজের শক্তিকেই মানুষ প্রকৃতপক্ষে উপাসনা করে। দুর্খাঁর (Durkheim) মতে ধর্ম সম্পূর্ণরূপে সামাজিক ঘটনা। তিনি তাঁর সামাজিক মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে টোটেমবাদের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন।* এ বিষয়ে আর বেশী আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আমরা আবার বলতে পারি যে পৃথিবীর একটা বৃহৎ অংশেই টোটেম বিশ্বাসের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় নি। এবং সত্যি বলতে গেলে টোটেমবাদ আদপে কোন ধর্মই নয়। "টোটেমের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, তার কাছ থেকে সাহায্যও চাওয়া হয়, কিন্তু টোটেম কখনো ঈশ্বর হিসেবে বা অতি শক্তিশালী ব্যক্তি হিসেবে পূজিত হয় নি। (এমন কি এখনো যে-সব স্থানে টোটেম বিশ্বাস প্রচলিত, সে-সব স্থানেও টোটেম পূজা হয় না)।† কিন্তু দুর্খাঁ (Durkheim) যখন বলেন প্রাকৃতিক শক্তিকে অথবা পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মাকে উপাসনা করার থেকেও ধর্ম প্রাচীন, এবং ধর্মের মূলে রয়েছে কোন রহস্যময় নৈর্ব্যক্তিক শক্তি সম্পর্কে অস্পষ্ট কিন্তু আবেগগত দৃঢ় প্রত্যয়, তখন তাঁর মতকে যথার্থ বলে মনে হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

3

প্রাক্-প্রাণবাদী ধর্ম—মানার ধারণা।

আধুনিক নৃতত্ত্ব সর্বপ্রাণবাদের পূর্ববর্তী অবস্থায় ইন্দ্রজাল থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল বলে মনে করেন। অব্যাখ্যেয়,—রহস্যময় সর্বব্যাপ্ত নৈর্ব্যক্তিক শক্তি বা

* See esp. Durkheim's Les Formes Elementaires de la vie Religiense (Paris, 1912, Eng. Trans. 1915)

† E. S. Hartland, are on Totemism in Hestings Enc, of Religion and Ethics Vol. XII (1921). Pp. 406f.

শক্তিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয় থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। এই শক্তিকে মানা বলা হয়। মানা Melanesian পদ। বিভিন্ন ভাষায় সমার্থবোধক বিভিন্ন পদ রয়েছে যেমন—উত্তর আমেরিকার Algonquin উপজাতি বলে maniton। Iroquoian উপজাতি বলে orenda এবং Sioux-রা বলে wakonda. এই শব্দগুলিতে প্রকাশিত ধারণা বিভিন্ন অঞ্চলে—বিভিন্ন জাতিতে এবং বিভিন্ন সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু আমরা Melanesian শব্দ মানা (Mana)-কে গ্রহণ করেছি এইজন্যে যে এই শব্দে ধারণাটি অনেক স্পষ্ট। (Bishop Codrington তাঁর The Melanesian 1891 গ্রন্থে মানা শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।) সম্ভবত আদিম মানুষের মনে মানার ধারণা খুব ক্ষমতাশালী ছিল। কিন্তু তা ছিল অব্যাখ্যেয় এবং অস্পষ্ট। তার আবেগের দিকটি বলিষ্ঠ হলেও বৌদ্ধিক মূল্য ছিল অত্যন্ত দুর্বল। আমাদের নিজেদের স্বার্থে আমরা সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা করতে চাই। কিন্তু বিপদ হল আমরা আদিম মানুষের অকপট মানসিকতার সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছি। সর্বব্যাপ্ত, অতীন্দ্রিয় একটি শক্তি যা অপ্রত্যাশিতভাবে কাজ করে বা বিচিত্র চরিত্র (আকৃতি) বিশিষ্ট প্রাকৃতিক বস্তুতে আবির্ভূত হয় তাকে মানা বলে। মানা হল রহস্যময় বা ঐন্দ্রজালিক গুণ বা ক্ষমতা। ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক অবস্থার মধ্যে মানা দোদুলামান অবস্থায় থাকে। [যে বস্তুতে মানা ভর করে তাকে লোকে কিছুটা ব্যক্তি হিসেবে আবার কিছুটা বস্তু হিসেবে, (আত্মাবিশিষ্ট বস্তু) এ রকম একটা মাঝামাঝি অবস্থারূপে গ্রহণ করে।] মানার স্বভাব যতটা প্রাকৃতিক তার থেকে বেশি মানসিক। সকল বস্তুতে থাকার সম্ভাবনা থাকলেও প্রায়ই বিশেষ কোন ব্যক্তি বা বস্তুতে মানার সন্নিবেশ ঘটে। মানা হল ব্রহ্মাণ্ডে এক অফুরন্ত শক্তির আধার। সেখান থেকে মানুষ ভাল ও মন্দ যা খুশি সংগ্রহ করে। এই অপরিমেয় শক্তি অসাধারণ বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে অথবা অপ্রত্যাশিত ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। "সকল আনায়াস সাফল্য মানার অস্তিত্ব-প্রমাণ করে। রাজনীতিক, সামাজিক বা যে কোন কাজে মানুষ যদি তার ক্ষমতা প্রকাশ করে, সেটাই হবে তার মানা। যদি কোন লোক যুদ্ধে সফল হয়, সেই সাফল্য তার স্বাভাবিক বাহুবলের জন্য নয়, চোখের ক্ষিপ্রতার জন্য নয় বা সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য নয়। সে নিশ্চয় কোন আত্মার মানা লাভ করেছে, অথবা কোন মৃত বীরের আত্মা তার

উপর ভর করেছে। সেই শক্তি এসেছে তার কবচে, গলায় বাঁধা পাথরে, কোমরে গুঁজে রাখা গাছের পাতায়...অথবা অপার্থিব শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করে সে যে-সব মন্ত্র বলেছিল তার মাধ্যমে...। মানা না ভর করলে একটা নৌকো দ্রুত যেতে পারে না, জালে বেশি মাছ ওঠে না, অথবা একটা তীব্র মারাত্মক আঘাত হানতে পারে না।"—(Codrington) একটি টোটেমপ্রাণীর ক্ষমতা থাকতে পারে অথবা ধূর্ততাও থাকতে পারে। প্রাণীটিতে মানা আছে বলেই সে পবিত্র। মানুষ মানা লাভ করার জন্য পবিত্রভাবে সেই প্রাণীটিকে ভক্ষণ করে। (পূর্বোল্লিখিত Durkheim-এর মতবাদের সত্যতা এই অংশে প্রমাণিত) সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের লেখা আধুনিক গ্রন্থগুলিতে এরকম অজস্র উদাহরণ পাওয়া যাবে।* এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা ভাল যে, এই শব্দটির একটি শক্তিশালী উচ্ছ্বাসের পরিমণ্ডল রয়েছে। এই শব্দটির দ্বারা কেবলমাত্র একটি বস্তুগত শক্তি বোঝায় না, ভয় ও বিস্ময়জাত আবেগযুক্ত প্রতিক্রিয়াও বোঝায়।

এখন মনে হয় আমরা ধর্ম ও ইন্দ্রজালের সাধারণ উৎসটি খুঁজে পেয়েছি। অতীন্দ্রিয় শক্তির উপস্থিতির প্রতি ভয়, বিস্ময় ও রহস্যবোধ থেকে প্রাক্-প্রাণবাদী ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। ঐ অতীন্দ্রিয় সত্তা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকলেও যে-কোন স্থানে সন্নিবিষ্ট হতে সমর্থ। এই মানসিক অবস্থা ধর্মের উপাদান (কাঁচামাল) সরবরাহ করে। স্পষ্টতঃ মানার ধারণা সর্বপ্রাণবাদ অপেক্ষা প্রকৃতিতে প্রাচীন। কেউ যদি সর্বপ্রাণবাদের পরবর্তীকালে এই ধারণাকে স্থাপন করে তাকে অবশ্যই নিন্দিত হতে হবে। "এই ধারণার উপর ভিত্তি করে সর্বপ্রাণবাদ গড়ে উঠতে পারে।...এই ধরনের ক্ষমতাগুলির সাহায্যে [যাদের সম্পর্কে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় জন্মে] অতীন্দ্রিয় সত্তা অনেক শ্রেণীর মধ্য থেকে একটিমাত্র শ্রেণী গঠন করে। যদিও অতীন্দ্রিয় সত্তাগুলি নিজ অধিকার বলেই এক একটি ক্ষমতা তবুও তারা পৃথক জাতিরূপ পরিগ্রহ করে। এবং ঐ বিশেষ জাতিরূপের মধ্যে অবশেষে অন্যান্য সত্তাও অঙ্গীভূত হতে পারে।"

* উদাহরণের জন্য R. R. Marett, The Threshold of Religion (2nd. ed. 1914) PP. 1—28, 98—121 et Passim; E. S. Harthland, Ritual and Belief (1914) PP. 26—66, E. Durkheim. Elementary forms of the Religious life (E. Tr. 1912) Pp. 188ff.

(Marett, op. cit. pp. 1—2) ডঃ ম্যারেটের (Dr. Marett) অভিমত হল মানা ও টাবুর (Tabu) ধারণাকে একত্রিত করলে সর্বপ্রাণবাদের পূর্ববর্তী ধর্মের প্রাথমিক জ্ঞানের সূত্র লাভ করা যেতে পারে। "অপার্থিব ঘটনার সদর্থক দিকটি চিহ্নিত করার জন্য মানাকে একটি সাধারণ শ্রেণীরূপে বিজ্ঞান গ্রহণ করে। সেই শ্রেণীর রহস্যময় ঘটনাগুলিকে···সাধারণ ঘটনার শ্রেণী থেকে দৃশ্যতঃ পৃথক করা যায়······। বিপরীত পক্ষে টাবু অপার্থিব ঘটনার নঞর্থক দিকটি চিহ্নিত করতে পারে। অর্থাৎ সদর্থক দিক থেকে যাকে মানা বলা হয় নঞর্থক দিক থেকে তাকেই বলে টাবু···।" (PP. 99—100) ধর্মের উৎপত্তিতে তাহ'লে দেখা গেল, অপরিমেয় ও অব্যাখ্যেয় শক্তির উপস্থিতিতে একটা রহস্য ও সভক্তি ভীতির বোধ রয়েছে। সেই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা কোন ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষ এই শক্তির সঙ্গে সদর্থক বা নঞর্থকভাবে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে। [কখনো প্রার্থনা করে কোন কিছু প্রাপ্তির জন্য। আবার অশুভ আত্মার ক্রোধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন কিছু উৎসর্গ করে তাকে সন্তুষ্ট করে।] আমাদের প্রত্যাশা মতই আমরা দেখছি ধর্মের উৎপত্তি-সংক্রান্ত প্রশ্নের নৃতাত্ত্বিক উত্তরটির সঙ্গে মনোবিজ্ঞান জড়িত ! কেবলমাত্র বাহ্যিক তথ্য এবং সামাজিক রীতি-নীতির পর্যালোচনা অপেক্ষা আদিম মানসিকতা, আভ্যন্তরীণ আবেগ এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়ার পর্যালোচনাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

ইন্দ্রজাল ও ধর্ম ঃ আমরা বলেছি ধর্ম এবং ইন্দ্রজালের উৎস এক। এই প্রশ্ন এখন বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে হবে। মানুষের এই দুই প্রকার আচরণ প্রায়ই নৃতত্ত্বে আলোচিত হয়। ধর্মের উৎপত্তি ও প্রকৃতি নির্ণয় করতে এই আলোচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ধর্ম ও ইন্দ্রজালের মধ্যে কোন একটিকে অন্যটি অপেক্ষা তার্কিক বা কালিক পূর্বিতা আরোপ করার কি যথেষ্ট যুক্তি আছে? যদি থাকে তবে কাকে প্রাচীনতর বলে স্বীকার করা হবে? উভয়ের উৎপত্তিগত সম্পর্ক কি আমরা আলোচনা করতে পারি? একটি কি অন্যটির ক্রমবিকাশের পথে জন্মলাভ করেছে অথবা অন্যটির হীনতা প্রাপ্তির সময় আবির্ভূত হয়েছে? অথবা তাদের উৎপত্তি হয়েছিল স্বতন্ত্রভাবে? এই প্রশ্নগুলির পরিপ্রেক্ষিতে তিন ধরনের আলোচনা হতে পারে।

(1) বলা যেতে পারে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে ইন্দ্রজালের পূর্বে। অথবা জেভন্‌সের (Dr. Jevons) ভাষায়, অপার্থিবের প্রতি বিশ্বাস ইন্দ্রজাল অপেক্ষা প্রাচীন। বিবর্তনের ফলে ধর্মের অবনতি বা হীনতাপ্রাপ্তি ঘটলে তার থেকে ইন্দ্রজালের উৎপত্তি হয়েছে।* এখানে জেভন্‌স (Jevons) অন্তত আকৃতি-গত অসংগতি দোষে দুষ্ট বলা যেতে পারে। কারণ একই বাক্যে আগে তিনি বলেছেন যে—"ধর্ম এবং ইন্দ্রজালের উৎস ভিন্ন এবং স্বভাবতই তারা একে অন্যের থেকে পৃথক।" (উভয়ের তীব্র পার্থক্য ও শত্রুতার প্রতি বইটিতে প্রায়শঃ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।) কিন্তু দুটি বিশ্বাসের উৎপত্তিস্থল যদি স্বতন্ত্র হয় এবং অস্তিত্বের দিক থেকে তারা যদি সর্বদা একটি অন্যটির থেকে পৃথক হয়, তাহ'লে একটির বিবর্তনের ফলে অন্যটির উৎপত্তি কি করে হতে পারে? ধর্মের অবনতির ফলে ইন্দ্রজালের উৎপত্তি হয়েছে—এই কথাটি সত্য হলে স্বীকার করতে হয় যে সূচনায় ধর্ম অধিকতর পরিশুদ্ধ ছিল। আবার এই সিদ্ধান্তটি জেভন্‌সের (Jevons) গ্রন্থের অন্য প্রসঙ্গের সঙ্গেও সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে নি। তিনি বলেছেন একেশ্বরবাদের—অবনতির স্তরে বহু ঈশ্বরবাদের উৎপত্তি হয়েছে। যা হোক, আমরা যতদূর জানি, আধুনিক নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে এই মতবাদের কোন সমর্থন নেই।† বিবর্তন মানেই যে অনিবার্যভাবে প্রগতি নয় জেভন্‌সের (Jevons) একথাটা অবশ্যই সত্য। এই কথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ডান আয়ান (Dean Inge) আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ধর্ম আদিতে অত্যন্ত স্থূল অবস্থায় ছিল এবং তাকে ইন্দ্রজাল থেকে সহজে পৃথক্ করা যেত না।

(2) আবার অনেকের মতে ইন্দ্রজাল ধর্মের পূর্ববর্তী। বিবর্তনের কোন একটা অবস্থায় ইন্দ্রজাল থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। এই মতানুসারে ইন্দ্রজালই মূল। তার থেকে কালক্রমে ধর্মের বিকাশ। যাই হোক, এখানে আমরা ফ্রেজারের (Frazer) মতবাদের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। তাঁর মতে ধর্মের উৎপত্তির ক্ষেত্রে ইন্দ্রজালের অবদান সদর্থক নয়, বরং নঞর্থক। স্যার জেম্‌স ফ্রেজারের (Sir James Frazer) বিখ্যাত মতবাদ

* F. B. Jevons. op. cit, P. 25

† Cf. however, Andrew Lange's theory of degeneracy from a kind of Primitive theism. See his Making of Religion (1898, 2nd ed. 1900)

সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।* 'চিন্তার বিবর্তনে ইন্দ্রজাল ছিল সর্বত্র ধর্মের পূর্ববর্তী। ইন্দ্রজালে যাহোক একটু বৌদ্ধিক উপাদান রয়েছে। অনুসঙ্গের নীতি, বিশেষ করে সাদৃশ্যের নীতি ও সান্নিধ্যের নীতি দেশে ও কালে ভুল প্রয়োগের ফলে ইন্দ্রজালের উৎপত্তি হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশঃ ইন্দ্রজালের মিথ্যা ও অন্তঃসারশূন্যতা মানুষ উপলব্ধি করতে পারল এবং সমাজের চিন্তাশীল সম্প্রদায় প্রকৃতির সম্পর্কে অধিকতর ফলপ্রসূ যথার্থ কোন মতবাদ অন্বেষণ করতে লাগল। এইরূপে ইন্দ্রজাল সম্পর্কে তিক্ত ও অসাফল্যের অভিজ্ঞতা, মানুষকে অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে, একটি উন্নততর পৃথক্ পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য উদ্বুদ্ধ করল। প্রকৃতিতে যে সব শক্তি আছে, মানুষ তাদের আহ্বান করতে শিখল। সেই প্রাকৃতিক শক্তিগুলি যদিও মানুষের মত, তা'হলেও তারা ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। তাদেরই ঈশ্বর বলা হত। মানুষ সেই অদৃশ্য শক্তির কাছে বিনয়ের সঙ্গে তার আনুগত্য প্রকাশ করল এবং কল্যাণ ও মঙ্গল লাভের আশায় মানুষ সেই অদৃশ্য শক্তির অনুকম্পা সানুনয়ে প্রার্থনা করল। এইভাবে 'ইন্দ্রজালের যুগ' 'ধর্মের যুগের' স্থান করে দিল। কারণ মানুষ ক্রমশঃ বুঝতে পেরেছিল, ইন্দ্রজালের যে সূত্র তারা আকর্ষণ করছে [যে পদ্ধতি অনুসরণ করছে] তা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। ইন্দ্রজাল ও ধর্ম পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট। অনেকটা তেল ও জলের মত। তারা কখনো মিশ্রিত হবে না। এছাড়া নীতিগতভাবেও দু'টির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইন্দ্রজাল ধর্মকে সদর্থক কিছু দিতে পারে না। ধর্মের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্পষ্টতঃ অভাববাচক। আমরা একথা অগেই উল্লেখ করেছি। এক কথায় ইন্দ্রজালের প্রতি মানুষের হতাশা থেকেই ধর্ম জন্মলাভ করেছে।

ফ্রেজারের (Frazer) মতবাদ খুবই সংকেতপূর্ণ এবং প্রতিভাদীপ্ত। এই মতবাদে সত্য যে রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে তীব্র বৈপরীত্যে [ধর্ম ও ইন্দ্রজাল তেল আর জলের মত] তিনি তাঁর বক্তব্য হাজির করেছেন তা গ্রহণ করা যেতে পারে না। ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে এটিকে কোনমতেই বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গি বলা যায় না। এই মতবাদে আদিম মানুষদের একেবারে পুরোপুরি বিলাসী দার্শনিক করে তোলা হয়েছে। তারা যেন তখন জীবন ও জগৎ বিশ্লেষণের একটা কার্যকরী মতবাদ অন্বেষণ করছিল। আবার এই

* Frazer's Golden Bough, 'The Magic Art' Vol I, esp. PP. 220—243 (3rd ed. 1911). তাঁর ১৯২৩ সালের সংক্ষেপিত সংস্করণটিও দেখুন।

মতবাদ পরিবেশের প্রতি মানুষের আবেগপূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়াকে অবহেলা করেছে। কিন্তু এই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগই আদিম মানুষের জীবনে চিন্তন অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বুদ্ধিবাদ হিসেবেও এই মতবাদ বিগত শতাব্দীর অনুসঙ্গবাদীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিল। কিন্তু এখন ঐ মতবাদ লুপ্ত হয়ে গেছে। এছাড়াও ধর্ম এবং ইন্দ্রজালের মধ্যে বৈষম্যকে এখানে অত্যন্ত বেশি করে দেখানো হয়েছে। এই দুই বিশ্বাসপ্রবণতার পার্থক্য সন্দেহাতীত। কিন্তু এই মতবাদ কালিক অসঙ্গতি দোষে দুষ্ট। কারণ ধরে নেওয়া হয়েছে যে ধর্মের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আদিম যুগের মানুষ বৈষম্যের স্পষ্ট ধারণা লাভ করেছিল। আমরা জানি অনেক উন্নত বৈশ্লেষণিক ক্ষমতার দ্বারাই এই ধারণা [বৈষম্যের ধারণা] লাভ করা যায়। ম্যারেটের (Marett) মন্তব্য সত্যের অনেকটা কাছাকাছি গিয়েছিল। তিনি স্বীকার করে-ছিলেন বিস্ময় ও রহস্য সম্পর্কে স্থূল বিশ্বাসের সাধারণ উপাদান থেকে ধর্ম ও ইন্দ্রজাল উভয়ে জন্মলাভ করলেও উভয়ের মধ্যে প্রভেদ ছিল। অতীন্দ্রিয়বাদ থেকেই উভয়ে উপাদান সংগ্রহ করেছিল। হার্টল্যাণ্ড (Hartland) বলেন, আমাদের প্রমাণ রয়েছে সমাজের নিম্নতম স্তরে ইন্দ্রজাল বলে স্বীকৃত ক্রিয়াকে ধর্মীয় আচার থেকে পৃথক করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ক্রম-বিকাশের ফলে উভয়ের মধ্যে শত্রুতা দেখা দিয়েছে।* ফ্রেজারের (Frazer) বিশ্লেষণমূলক চিন্তায় আবিষ্কৃত হয়েছে যে সূচনার ধর্ম এবং ইন্দ্রজালের মৌল উপাদান ছিল বিশ্বাসপ্রবণতা। এই অভিন্ন মৌল উপাদান থেকে জন্মলাভ করে ধর্ম এবং ইন্দ্রজালের বৈষম্য ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। [যে বৈষম্যকে ফ্রেজার (Frazer) তেল ও জলের সম্পর্কের মত বলে মনে করেন।] প্রকৃত পক্ষে আমরা দেখেছি, সাম্প্রদায়িক জীবনে ধর্মীয় ও ঐন্দ্রজালিক পদ্ধতি সর্বদা ও সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। এই দুই পদ্ধতির বাহ্যিক মিল ছিল না, ছিল একটা অন্তর্নিহিত ঐক্য। পরিশেষে এই মতবাদ ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে কেবলমাত্র একটা নঞর্থক ব্যাখ্যা দেয়। যথা—ইন্দ্রজালের ব্যর্থতার ফলে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল। কিন্তু ধর্মের উৎপত্তির কারণ হিসেবে একটা সদর্থক 'অভিপ্রায়' অন্বেষণ করার প্রয়োজনীয়তা এখনো থেকে যাচ্ছে।

* See Marett, Threshold of Religion (2nd. ed., 1914) PP xi 30 and E. S. Hartland, Ritual and Belief (1914), P. 74 f.

(3) বিশ্বের রহস্যময় শক্তি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে ধর্ম এবং ইন্দ্রজালের উৎপত্তি হয়েছে—একথা মেনে নেওয়া যেতে পারে। মনুষ্য সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক বৈষম্য প্রকাশ পেয়েছে, এমন কি সক্রিয় শত্রুতা পর্যন্ত তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে হয়ত এই ধারণা ঠিক নয়। বরং তাদের একই উৎস হওয়ার ফলে তারা প্রায়ই একসঙ্গে কাজ করেছে। আগেই উল্লেখ করেছি আমরা এই মত সমর্থন করি। অবশ্য আমাদের বর্তমানের উন্নততর অবস্থা থেকে এবং পৃথকীকরণের উন্নত মানের ক্ষমতা নিয়ে আমরা যদি পেছনের দিকে তাকাই, তাহ'লে ধর্ম এবং ইন্দ্রজালের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে। ধর্মীয় মনোভাব হল অধিকতর শক্তিশালী আত্মার কাছে সবিনয় আত্মসমর্পণ। বিপরীত পক্ষে ইন্দ্রজালের দৃষ্টিভঙ্গী হল উদ্ধত ও আত্মতুষ্টির মনোভাব। জগতের রহস্যময় বিস্ময় উৎপাদনকারী ক্ষমতার সঙ্গে উভয় বিশ্বাসই যুক্ত। ইন্দ্রজাল সেই শক্তিকে বলপ্রয়োগে কাজে লাগাতে চায়; ধর্ম প্রার্থনা, প্ররোচনা, এবং তুষ্টি সাধনের মধ্য দিয়ে ঐ শক্তিকে জয় করতে চায়। ইন্দ্রজাল যে শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে চায় তা হল প্রধানতঃ নৈর্ব্যক্তিক, নামহীন এবং অনৈতিক। ধর্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত শক্তিকে একজন ব্যক্তি হিসেবে চিন্তা করে। তাঁর ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। শ্রদ্ধা, বিনয়, ভক্তি ও উৎসর্গের সাহায্যে তাঁর শুভেচ্ছা অবশ্যই লাভ করা যায়। ধর্ম স্পষ্টতঃ সামাজিক। সে একটি গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। বিপরীত পক্ষে ইন্দ্রজাল ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অসামাজিক এবং এমন কি সমাজ-বিরোধীও। তাই গোপনীয়তাই তার অবলম্বন। দুর্খাঁ (Durkheim) বেশ আকর্ষণীয় ভাষায় বলেছেন,—"ইন্দ্রজালের কোন গীর্জা নেই। জাদুকরের অনুগত জনমণ্ডলী রয়েছে কিন্তু তাদের উপাসনার স্থান নেই। বিপরীত পক্ষে ধর্ম গীর্জার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সংযুক্ত।* চরম পরিণতিতে উভয় বিশ্বাসের এই পার্থক্য সত্য। কিন্তু আদিম মানুষের অপটু মননে এই ভিন্নতার ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। বরং এটাই স্বাভাবিক যে তাদের কাছে ধর্ম এবং ইন্দ্রজালের ধারণা ছিল অবিচ্ছেদ্য এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে ধারাবাহিক। আমরা তাহ'লে ধরে নিতে পারি ধর্ম এবং ইন্দ্রজাল একই সাধারণ অবস্থা

E. Durkheim: Elementary Forms of the Religious Life. (E tr. PP. 44 f).

থেকে উৎপন্ন হয়েছে। 'বাঁচার লড়াই'এ মানুষ অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে মোটামুটি সচেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। জীবনসংগ্রামে তার চতুর্দিকে অবস্থিত রহস্যময় শক্তির সাহায্য লাভ করার চেষ্টা থেকে, অথবা মালনেশীয়দের ভাষায় যাকে মানা বলে, তাকে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করার চেষ্টা থেকে ধর্ম এবং ইন্দ্রজাল উভয়েরই সৃষ্টি হয়েছে। আদিম মানুষ মনে করত তার চারদিকে কোন না কোন রকমের মানা রয়েছে। আকাঙ্ক্ষিত ফললাভের জন্য অদৃশ্য শক্তি হিসেবে মানাকে সে বাধ্য করতে পারে। অথবা, যে দৈবশক্তির অনেক বেশি মানা আছে, উৎসর্গ, প্রার্থনা প্রভৃতির সাহায্যে তাকে শান্ত করতে পারে। কিন্তু মানুষের আদিমতম অবস্থায় মানাপ্রাপ্তি ও মানা ব্যবহারের পদ্ধতি দুটিকে, পৃথক করা কষ্টকর। আমরা তাহ'লে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছলাম যে প্রথমে যদিও ধর্ম এবং ইন্দ্রজালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পার্থক্য ছিল এবং তাদের নীতি ও পদ্ধতির মধ্যেও পার্থক্য ছিল, (ধর্মে ঐন্দ্রজালিক ধারণা ও ঐন্দ্রজালিক অভ্যাসের অনুপস্থিতিই ধর্মের উন্নত চরিত্র ও শুদ্ধতার প্রমাণ) তবুও পরিবেশের প্রতি আদিম মানুষের আবেগগত প্রতিক্রিয়া এবং জীবন-সংগ্রামের জন্য চরাচরে যে অদৃশ্য শক্তি রয়েছে তার সম্পর্কে যথেচ্ছ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাধারণ উৎস থেকেই ধর্ম ও ইন্দ্রজালের উৎপত্তি হয়েছে।

যখন আমরা ধর্মের স্বরূপ ও ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করবো, নৃতত্ত্বের আলোকে ধর্মের উৎপত্তি অন্বেষণের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি তখন আমাদের সাহায্য করবে। যদিও আমবা আদিম মানুষদের থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি তবুও মন ও দেহ উভয় দিক থেকেই আমরা তাদেরই বংশধর। মানুষ সভ্য হয়ে তার আদিম সহজাত প্রবণতাগুলি ত্যাগ করতে পারে নি। প্রবণতাগুলি উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু পরিত্যক্ত হয় নি। মানুষ তার অগ্রগতির সময় নতুন মূল্যবোধ লাভ করেছে, নতুন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে কিন্তু তার আদিম আবেগ ও উচ্ছ্বাস থেকে সে কখনো মুক্তি পায় নি। সেই আদিম মানুষ এখনো আমাদের মধ্যে বসবাস করে। অবশ্য এর মানে এই নয় যে ধর্মের প্রকৃত কোন ক্রমবিকাশ ঘটে নি। সভ্য মানুষের ধর্ম হল অসভ্য আদিম মানুষের ধর্মের নিদর্শন মাত্র। অগ্রগতি হয়েছে, সেই সঙ্গে ধারাবাহিকতাও থেকেছে। ক্রমবিকাশের সম্ভাব্য সর্ত হিসেবেই ধারাবাহিকতার কথা আসে। ধর্মের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের আলোচনা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে করবো।

ধর্মের স্বরূপ ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রথমে ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

ধর্মের উৎপত্তির সমস্যার সঙ্গে মূল্যায়নের সমস্যার কোন যোগ নেই। ধর্মের সূচনা অত্যন্ত স্থূল অবস্থা থেকে হয়েছে বলে এবং তার সঙ্গে ভ্রান্ত-বিশ্বাস যুক্ত ছিল বলে বর্তমানের ধর্মবিশ্বাসকে যেমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলা যায় না, তেমনি বর্তমান ধর্মবিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে আদিম মানুষের সহজ সরল ধর্মীয় চেতনাকেও হেয় করা যায় না। ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে আগে থেকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে খোলা মন নিয়ে অনুসন্ধান করা উচিত।

[1]

ধর্মের উৎপত্তি প্রসঙ্গে অধুনালুপ্ত প্রাচীন দু'টি মতবাদের আলোচনা প্রথম করা যাক :

(a) ঐশ্বরিক প্রতিভাসবাদ বা ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশবাদ। এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লাভ করে মানুষের ধর্মীয় চেতনা জেগেছিল। হঠাৎ একদিন এই ধরনের প্রত্যাদেশ লাভের ফলে আদিম মানুষের পক্ষে ধর্মের মত জটিল একটি ধারণা লাভ অবাস্তব। শেলিং (Schelling) বলেছেন ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লাভের আগে মানুষের যদি কোন ধর্মীয় ধারণা না থাকে তাহ'লে তারা কি করে প্রত্যাদেশ লাভ করল। এই মতবাদ এখন লুপ্ত হয়ে গেছে।

(b) অতিবর্তী মতবাদ ঃ এই মত অনুসারে মানুষের বিচারবুদ্ধি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। নৈতিক নিয়মের প্রভুত্ব, আত্মার অমরতা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব হল স্বাভাবিক ধর্মের মৌলিক উপাদান। পরবর্তী যুগে পুরোহিতেরা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন করেছে। তা'হলে ধর্মের উৎস হল দু'টি—(1) মানুষের বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন স্বাভাবিক ধর্ম ; (2) পুরোহিতদের প্রতারণা থেকে উদ্ভূত ঐতিহাসিক ধর্ম। ঐতিহাসিক ধর্মে আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের গুরুত্ব রয়েছে। যেমন, হিন্দুধর্ম, খৃষ্টধর্ম ইত্যাদি।

সমালোচনা—(1) ধর্মের উৎপত্তির কারণ হিসেবে যুক্তিকে খুব বেশি প্রাধান্য

দেওয়া হইয়াছে। (2) ঐতিহাসিক বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি অবহেলিত হয়েছে। (3) ধর্ম যদি পুরোহিতদের আবিষ্কার হত তাহ'লে তার আগে মানুষেরা ধর্মহীন ছিল মেনে নিতে হয়। আদপে পুরোহিতেরা ছিল সংস্কারক স্রষ্টা নয়। ধর্ম কখনো এক শ্রেণীর লোকের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আবিষ্কার হতে পারে না।

ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান : এই অনুসন্ধান দু'টি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে হ'তে পারে। (1) নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, (2) মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান। এরা পরস্পর নির্ভরশীল। নৃতত্ত্বের তথ্যাবলী ছাড়া মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা সম্ভব নয়। আবার নৃতাত্ত্বিক তথ্যাবলী বিশ্লেষণের জন্যও মনস্তাত্ত্বিক সহযোগিতার প্রয়োজন। প্রথম কয়েকটি নৃতাত্ত্বিক মতবাদ আলোচনা করা হবে।

[2]

টাইলরের (E. B. Tylor) সর্বপ্রাণবাদ। এক সময় মানুষ প্রকৃতির সবকিছুকে প্রাণময় বলে মনে করত। নিজেদের প্রাণের সাদৃশ্যে চরাচরের সবকিছুকে তারা সপ্রাণ ভাবত। কিছু কিছু আত্মার সঙ্গে নিজেদের প্রয়োজনে তারা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করত। এই চেষ্টা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে।

এই মতবাদের সমালোচনা করে অনেকে বলেছেন—(1) সর্বপ্রাণবাদ ধর্মের প্রারম্ভিক অবস্থা নয়, এটি হল প্রারম্ভিক দর্শন। হফডিং (Hoffding) বলেছেন, আদিম কালের মানুষ কিছু কিছু আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করল কিন্তু অন্য আত্মাদের সঙ্গে করল না কেন? এই নির্বাচনের পেছনে নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য আছে। ডঃ জেভন্‌সের মতে প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে মানুষ কোন অলৌকিকতা প্রত্যক্ষ করে নি। স্বাভাবিক বিষয়ের সঙ্গে আবেগের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। কিন্তু ধর্মের উৎপত্তির ক্ষেত্রে আবেগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। (2) আবার দর্শন হিসেবেও সর্বপ্রাণবাদ প্রাচীনতম নয়। আত্মার ধারণার মত একটি জটিল ধারণা লাভ করা, চিন্তাভাবনার সূচনাকালেই মানুষের পক্ষে নিশ্চয় একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

হার্বার্ট স্পেনসারের (Herbert Spencer) পূর্বপুরুষ উপাসনা মতবাদ বা প্রেতাত্মা মতবাদ :

স্পেনসারের (Spencer) মতে প্রেতাত্মারূপে আবির্ভূত পূর্বপুরুষদের উপাসনা থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। প্রেতাত্মাদের প্রতি সশ্রদ্ধ ভয় থেকেই ধর্মীয়

আচার-অনুষ্ঠানের উদ্ভব। এই মত সমর্থনযোগ্য নয়। কোন একটিমাত্র সামাজিক রীতির বিস্তৃতির ফলে বা কোন একটিমাত্র আবেগের প্রকাশরূপে ধর্মের উদ্ভব হয় নি। জেভন্‌সের (Dr. Jevons) মতে প্রেতাত্মা কখনো ঈশ্বর হয়ে উঠতে পারে না। সকল অসভ্য জাতির মধ্যে প্রেতাত্মা উপাসনা প্রচলিতও নয়। সর্বপ্রাণবাদের থেকে প্রেতাত্মা উপাসনা প্রাচীনতর, স্পেনসারের (Spencer) এই মতও সমর্থনযোগ্য নয়।

টোটেমবাদ :

টোটেমবাদকে ধর্মের প্রাচীনতম ও সহজতম রূপ হিসেবে অনেকে গণ্য করেন। এক ধরনের প্রাণী, লতাগুল্ম বা জড় দ্রব্যের সঙ্গে একটি সামাজিক গোষ্ঠী যখন আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়, তখন ঐ প্রাণী, লতাগুল্ম বা জড় দ্রব্যকে টোটেম বলা হয়। টোটেম ঠিক ঈশ্বর নয়, সমগোত্রীয় শ্রদ্ধার পাত্র। স্মিথ (Smith) ও জেভন্‌স্‌ (Jevons) এই বিশ্বাসের সমর্থক।

সমালোচনা : টোটেম বিশ্বাস প্রাচীন কিন্তু সর্বজনীন নয়। অনেক অসভ্য উপজাতির কাছে এই বিশ্বাস অজ্ঞাত। আবার অনেকে টোটেম বিশ্বাস করলেও উপসনা করে না।

দুর্খাঁ (Durkheim) সামাজিক মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই মতবাদের আলোচনা করেছেন। টোটেমবাদ সর্বজনীন না হ'লেও গুরুত্বপূর্ণ। একটি রহস্যময় শক্তিতে বিশ্বাসের উপর ধর্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে সমাজের প্রভুত্বই হল এই রহস্যময় শক্তি। টোটেম তার প্রতীক।

যাই হোক পৃথিবীর একটা বৃহৎ অংশে টোটেমের ধারণা অজ্ঞাত। তবু এই মতবাদের সদর্থক দিকটি হল এখানে সর্বপ্রাণবাদ ও প্রেতাত্মা মতবাদের পূর্বেও ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। তাছাড়া ধর্মকে একটা রহস্যময় শক্তির সঙ্গে মানুষের আবেগগত সম্পর্ক বলে স্বীকার করা হয়েছে।

[3]

প্রাক্‌-প্রাণবাদী ধর্ম : মানার ধারণা :

সর্বব্যাপ্ত অতীন্দ্রিয় একটি শক্তি অপ্রত্যাশিতভাবে পার্থিব বস্তুতে আবির্ভূত হয়—এই ধারণাকে বলে মানা। প্রাকৃতিক কোন বস্তু বা ঘটনার মধ্যে যদি কোন অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা যেত তখন ধরে নেওয়া হত তার উপর মানা ভর করেছে। মানা অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার। মানুষ সেই শক্তির কাছে

প্রার্থনা করে প্রয়োজনীয় সব কিছু লাভ করতে পারত। আবার তাকে সন্তুষ্ট করে তার কোপদৃষ্টি থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারত। যেমন আমরা ঈশ্বরের কাছে ধন, সম্পদ, বিদ্যা প্রভৃতি প্রার্থনা করি, তেমনি কলেরা, বসন্ত, মহামারীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেবদেবীদের তুষ্টও করি। এই অনিষ্টকারী শক্তিকে টাবু বলে। মানা হল রহস্যময় শক্তির সদর্থক দিক। আর টাবু হল তার নঞর্থক দিক। মানা এবং টাবুকে যোগ করলে অপার্থিব শক্তির সামগ্রিক রূপটি বোঝা যায়।

ধর্ম এবং ইন্দ্রজাল : ধর্মের উৎপত্তি ও প্রকৃতি নির্ণয় করতে হলে ধর্মের সঙ্গে ইন্দ্রজালের সম্পর্ক আলোচনাও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনেকে মনে করেন ধর্ম ও ইন্দ্রজালের উৎস এক। ধর্মের উৎপত্তি কি ইন্দ্রজালের আগে হয়েছিল ? না ইন্দ্রজাল ধর্মের পূর্ববর্তী ? অথবা একটির ক্রমবিকাশের ফলে অন্যটির উদ্ভব হয়েছে ? কিম্বা একটির হীনতা প্রাপ্তির সময় আর একটির উদ্ভব হয়েছে ?

(1) জেভন্‌সের (Jevons) মতে ধর্ম ইন্দ্রজালের পূর্ববর্তী ধর্মবিশ্বাসের অবনতির কালে ইন্দ্রজালের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু দু'টি বিশ্বাসের উৎপত্তির স্থল যদি পৃথক্ হয় তাহ'লে একটির অবনতিতে অন্যটির বিকাশ কি করে সম্ভব ?

(2) অনেকের মতে ইন্দ্রজাল ধর্মের পূর্ববর্তী। বিবর্তনের ফলে, কোন এক সময় ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। ফ্রেজার (Frazer) এই মতের সমর্থক। তাঁর মতে ধর্ম ও ইন্দ্রজাল পরস্পরবিরোধী। অনেকটা তেল ও জলের মত।

এই মতবাদের প্রধান ত্রুটি হল, আদিম মানুষকে একেবারে বিলাসী দার্শনিক করে তোলা হয়েছে। তারা যেন জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটি কার্যকরী মতবাদ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ইন্দ্রজাল ব্যর্থ হল বলে তারা ধর্মে বিশ্বাস করল। এই মতবাদে ধর্মে আবেগের ভূমিকাকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। এছাড়া যে বৈষম্যের ধারণার এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা আদিম মানুষের অনুন্নত চিন্তার সাহায্যে লাভ করা সম্ভব ছিল না। পরিশেষে এই মতবাদ ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে কেবলমাত্র নঞর্থক ব্যাখ্যা দেয়। ধর্মের উৎপত্তি কি করে হল তার সঠিক কোন কারণ এখানে দেখানো হয় নি।

(3) জগতের রহস্যময় শক্তির ধারণার সঙ্গে ধর্ম এবং ইন্দ্রজাল উভয়েই যুক্ত। ইন্দ্রজাল সেই শক্তিকে বল প্রয়োগে কাজে লাগাতে চায়। আর ধর্ম প্রার্থনা তুষ্টি সাধন প্রভৃতির সাহায্যে তাকে জয় করতে চায়। পরিণত চিন্তায়

ধর্ম এবং ইন্দ্রজালের মধ্যে পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলেও আদিম মানুষের কাছে দু'টি ধারণা ছিল অবিচ্ছেদ্য। প্রথমে ধর্ম এবং ইন্দ্রজালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পার্থক্য থাকলেও পরিবেশের প্রতি আদিম মানুষের আবেগগত প্রতিক্রিয়া এবং জীবন সংগ্রামের জন্য অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা থেকে ধর্ম এবং ইন্দ্রজাল উভয়েরই উদ্ভব হয়েছে।

ধর্মের মানসিক উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

এখন আমাদের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের উৎপত্তির প্রসঙ্গটি আলোচনা করতে হবে। মানুষের অন্তর্লোকে এমন কি কারণ রয়েছে যার ফলে মানুষ ধর্মপরায়ণ হয়ে উঠল? মানুষের মানসিক গঠনে এমন কি আছে যাতে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য মানুষকে ধর্মে প্রবৃত্ত হতে হল? এবং কেনই বা সে সেই দূর অজ্ঞাত কাল থেকে আজ পর্যন্ত ধর্মকে আশ্রয় করে রয়েছে? কোন্ মানসিক কারণে ধর্ম তার আদিম স্থূল অবস্থা থেকে ক্রম-বিকাশের পথ ধরে বর্তমানের উন্নত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে? উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের সমস্যা দুটিকে আমারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হিসেবে গণ্য করতে পারি না। সমস্যা দুটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাদের মধ্যে একটি মনস্তাত্ত্বিক ধারা-বাহিকতা রয়েছে। আদিম ধর্ম এবং উন্নত ধর্ম জন্মগত সম্বন্ধে যুক্ত। ধর্মীয় বিবর্তনের ধারাটির মধ্যে মানবজাতির ধর্মচেতনার একটি ঐক্য রয়েছে। মানুষে মানুষে সহস্র ভিন্নতা থাকলেও তাদের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। আদিম ধর্ম পরিবর্তিত হয়েছে ঠিকই। কিন্তু ঐ পরিবর্তনের সমগ্র পদ্ধতির মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা বর্তমান। আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় হল, মানুষের প্রকৃতিতে তাহ'লে এমন কি আছে যার ফলে মানুষ ধর্মপ্রবণ হয়ে উঠল? মানুষের অন্তর্লোকে কোথায় এখন আমরা ধর্মের উৎস অনুসন্ধান করব?

[1]

এই প্রশ্নগুলির কয়েকটি সমাধান জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচলিত হলেও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ সমাধানগুলি কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। এই মতবাদগুলির অন্যতম একটি মত হল—ধর্মীয় প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত। সহজাত ধর্মীয় প্রবৃত্তির ফলে মানুষ ধার্মিক হয়েছে—এই যুক্তি যদি মেনে নেওয়া যায় তাহ'লে তাকে অত্যন্ত সহজ, সরল এবং দায়সারা গোছের সমাধান বলে গণ্য করা হবে। মানুষের সহস্র রকম ব্যবহারের ব্যাখ্যার জন্য একটি একটি করে সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা বাড়িয়ে যাওয়া খুবই সহজ কাজ। কিন্তু কাজটি বিপজ্জনক। কারণ তখন যে জিনিসটির সাহায্যে ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে তারই ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। মানুষ এই রকম কাজ করছে কারণ তার এই ধরনের

কাজ করার সহজাত প্রবত্তি আছে—এই ধরনের যুক্তি স্পষ্টতই পুনরুক্তি দোষ-দুষ্ট। এখানে পুনরুক্তিটি ভিন্ন ভাষায় করা হয়েছে মাত্র। উইলিয়মের বিখ্যাত নীতি অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি, সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা এই রকম অপ্রয়োজনে যত খুশি বাড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়। মানুষ যে কিছু কিছু প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মছে একথা সত্য। সেগুলিই তার ব্যক্তিত্বের উপাদান। কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য এবং প্রকৃতিও সরল। জীবনধারণের ক্ষেত্রে এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি মানুষের সহায়ক শক্তি এবং এই বিষয়ে মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের সগোত্রীয়। মনোবিজ্ঞানিগণ সহজাত প্রবৃত্তি কথাটিকে একটি সুনির্দিষ্ট ও সহজ অর্থে গ্রহণ করেন। তাঁদের মতে সহজাত প্রবৃত্তি হল বিশেষ বিষয়ের বা অবস্থার প্রতি পূর্বঅভিজ্ঞতা ব্যতীত স্বতঃস্ফূর্ত একটি বিশেষ ভঙ্গী বা প্রতিক্রিয়া করার স্বাভাবিক অশিক্ষিত প্রবণতা। কিন্তু ধর্ম ত কোন একটা নির্দিষ্ট সরল ধারণার প্রতি কোন সরল নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া মাত্র নয়। বরং ধর্ম হল বহুমুখী। তার প্রকাশ অত্যন্ত জটিল ও বিচিত্র।* কয়েকটি সহজাত প্রবৃত্তির সহ-যোগিতার ফলে ধর্মের উৎপত্তি হতে পারে। যখন ধর্মের কোন বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনার প্রারম্ভে আমরা এই ধরনের একটি সুন্দর ভূমিকা দেখি—'যতদূর প্রমাণ পাওয়া গেছে—ধর্মীয় প্রবৃত্তি একটি সহজাত প্রবৃত্তি'—তখন আমাদের ধরে নিতে হয় যে সহজাত প্রবৃত্তি কথাটিকে নিতান্ত লৌকিক এবং অবৈজ্ঞানিক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। শ্লায়ার মেকারের (Schleier macher) ধর্মবিষয়ক পুস্তকগুলি† প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ধর্মের প্রতিটি সংজ্ঞায় 'সহজাত' প্রবৃত্তি কথাটি যেন অপরিহার্য হয়ে উঠছে। তাহলেও কিছুটা সত্য এই 'সহজাত-মতবাদের' মধ্যে রয়েছে। ধর্ম মানুষের স্বভাবের একেবারে মর্মস্থল থেকে উৎসারিত হয়েছে। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা লাভ মানুষের একটা স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু ধর্মপ্রবণতা আমাদের স্বভাবের এমন একটা অযৌগ ও মৌলিক উপাদান নয় যে তাকে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি না অথবা তার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। বরং ধর্মের সৃষ্টি হয় সহজাত প্রবৃত্তি এবং আবেগের সংমিশ্রণ থেকে। একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন আচরণের সমন্বয়কে ধর্ম বলা যায়। এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের চিরন্তন

* W. Mc Dougall, Social Psychology (12th ed, 1917) P. 89.
† M. Jastrow, The Study of Religion (1901), PP 101, 158

মৌল বাসনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সমন্বয়কে 'ধর্মীয় প্রবৃত্তি' আখ্যা দিলে, বিষয়টি একটা জটিল মানসিকতার সহজ ব্যাখ্যা দানের অক্ষম চেষ্টা হয়ে ওঠে মাত্র।

মানুষের মনে বিশেষ একটি ধর্মীয় মনোবৃত্তি রয়েছে—এইভাবে সমস্যাটিকে ব্যাখ্যা করাও সমান ত্রুটিপূর্ণ। এখানে আমরা প্রাচীন আর একটি সহজ পদ্ধতির নিদর্শন পাচ্ছি। একটি বিশেষ কাজের ব্যাখ্যার জন্য একটি বিশেষ মনোবৃত্তির আবিষ্কার একটি সুপ্রাচীন পদ্ধতি। কিন্তু সেই বৃত্তিবাদ বা বিভাগীয় মানবিজ্ঞানের (Faculty Psychology) দিন চলে গেছে। [বিভাগীয় মনোবিজ্ঞান—যে মনোবিজ্ঞান এক একটি মানসক্রিয়ার জন্য মানুষের মনে এক একটি নির্দিষ্ট বিভাগ আছে বলে স্বীকার করে।] মানুষের অন্যান্য বৃত্তি থেকে ধর্মীয় বৃত্তিকে স্বতন্ত্ররূপে কল্পনা করার অর্থই হল মানুষের মনের মৌলিক ঐক্যকে অস্বীকার করা। বৃত্তিবাদীরা মনে করেন যে মানুষের মনের একাংশ অন্যান্য অংশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে কাজ করে। এই চিন্তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। মানুষের চেতন জীবন যে উপাদান দ্বারা গঠিত ধর্মীয় চেতনাও সেই একই মানস-উপাদান দ্বারা গঠিত। সাধারণ মনোবিজ্ঞান যে সব উপাদান (যথা—চিন্তা, ইচ্ছা ও অনুভূতি) নিয়ে আলোচনা করে ধর্মীয় মনোবিজ্ঞানও সে সব মানস-উপাদান নিয়ে আলোচনা করে। মানস প্রকৃতির কোন একটিমাত্র অংশকে ধর্মীয় বলে চিহ্নিত করা যায় না। বলা যায় না মনের এই অংশটি কেবল ধর্মীয় জীবনেই সক্রিয় বা ধর্মজীবনের সকল কাজকর্ম এই অংশটির দ্বারা সংঘটিত হয়।

অনেকে মনে করেন আবেগ থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু আবেগকে ধর্মের উৎপত্তির একটিমাত্র উপাদান হিসেবে গ্রহণ করাও একটি অতি সরলীকরণ দোষের নিদর্শন। ভয়কে ধর্মের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিখ্যাত মতবাদ। পুরাকালে এই মতের সমর্থক ছিলেন এপিকিউরীয় (Epicureau) দার্শনিকগণ এবং ল্যাটিন কবি ল্যুক্রেটিয়াস (Lucretius)। তাঁরা ধর্মবিশ্বাসকে কুসংস্কারের সঙ্গে এক করে দেখতেন। পেট্রোনিয়াসের (Petronius) বিখ্যাত একটি পঙ্‌ক্তিতে এই মতের সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায়। Primus in orbe deos facit timor (প্রাথমিকভাবে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য ভয় থেকে এসেছে)। আধুনিককালে হিউম (Hume) ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের উৎস

হিসেবে ভয়ের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি আরো একটি কথা যোগ করে দিয়েছেন—ঈশ্বরের প্রতি ভয়, তাঁর সদিচ্ছা লাভের রূপ পরিগ্রহ করে। আধুনিককালে অনেক মনোবিজ্ঞানী, যেমন রিবট (Reibot) এই 'ভীতির মতবাদ'কে সমর্থন করেন। আদিম অবস্থায় ধর্মে ভয়ের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অসভ্য মানুষের মনে প্রকৃতির রহস্যময় শক্তির প্রতি একটা অস্পষ্ট আশংকার ভাব সারাক্ষণ প্রচ্ছন্ন ছিল। সেইজন্য তারা শত্রুভাবাপন্ন সেই রহস্যময় শক্তিকে প্রশস্তির দ্বারা নিজেদের অনুকূলে আনার চেষ্টা করত এবং সেই শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করত। সেই আদিম অসভ্য মানুষেরা শুভ শক্তির অস্তিত্বের কথা জানত। কিন্তু তাদের কাছ থেকে আনুকূল্য লাভের চেষ্টা না করে তারা অশুভ শক্তির ক্রোধ প্রশমনের জন্য অধিকতর মনোনিবেশ করত। মনোভাবটা অনেকটা এরকম ছিল—শুভশক্তি যেহেতু শুভ তারা কোন ক্ষতি করবে না। অতএব বলা যেতে পারে যে, অশুভ শক্তির ভয় থেকে ধর্মীয় আচরণের উৎপত্তি হয়েছে। অর্থাৎ কেবলমাত্র ভয়ের আবেগ থেকে ধর্মের সূচনা হয়েছে। কিন্তু সকল ধর্মের কারণ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট নয়। আমরা আগেই স্বীকার করেছি যে রহস্যময় শক্তির প্রতি একটা সভয় বিস্ময়ের ধারণা অন্যতম মৌলিক ধর্মীয় আবেগ। কিন্তু ভয়ের সংমিশ্রণ থাকলেও 'সভয় বিস্ময়'কে কেবলমাত্র ভয় বলা যায় না। ডঃ ম্যারেটের (Dr. Marett) ভাষায় সভয় বিস্ময় এবং বিশুদ্ধ ভয় এক জিনিস নয়। আমরা যদি বিস্ময়, প্রশংসা ভক্তি, শ্রদ্ধা এমন কি ভালবাসাকেও ধর্মীয় মানসিকতার ক্ষেত্রে ভয়ের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গ্রহণ করি তাহ'লে আমরা পেট্রোনিয়াসের মত ভুল করবো।* একটা জিনিস অত্যন্ত স্পষ্ট যে উন্নত ধর্ম-চেতনার ব্যাখ্যায় কেবল ভয়ই যথেষ্ট নয়। সেখানে বিস্ময়, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা প্রভৃতির মত অধিকতর সদর্থক আবেগের সঙ্গে ভয়ের অদ্ভুত একটি সংমিশ্রণ ঘটেছে। আদিম বর্বর মানুষগুলির মনেও কিন্তু আস্থা ও প্রত্যাশার অঙ্কুর ছিল। এবং একটা সদর্থক মূল্যবোধ লাভ করতে তাহারাও চাইত। ধর্মের কুসুমটি ভালবাসার

* R. R. Marett—The Threshold of Religion (2nd ed. 1919), P. 13. For a Psychological analysis of the complex emotion of awe. see W. Mc Dougall op. cit. 131f.

মধ্যেই প্রস্ফুটিত হতে পারে। ভালবাসাই উপাসনার ফুল। প্রকৃত ভালবাসায় ভয়ের অস্তিত্ব থাকে না। ভয়ের অস্তিত্ব থাকে না মানে এই নয় যে ভালবাসা ভয়কে নির্মূল করে দেয়। ভালবাসা ভয়কে রূপান্তরিত করে। ভয় তখন একটি উন্নত ও সংস্কৃত রূপ লাভ করে। ডঃ ম্যাকডুগেল (Dr. Mc Dougall) তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি এবং আবেগের শ্রেণীকরণের মধ্যে দেখিয়েছেন ভয়জাতীয় আবেগের সহযোগী সহজাত প্রবৃত্তিটি হল পলায়নের প্রবৃত্তি। কিন্তু ধর্মীয় ভীতিকে পলায়নের প্রবৃত্তিরূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। দু'টি বিরোধী আবেগের সংমিশ্রণে ধর্মীয় আবেগের উৎপত্তি হয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি ভয়ের ফলে সরে আসার মনোভাব যেমন একদিকে থাকে অন্যদিকে তেমনি বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়ার মনোভাবও দেখা যায়। যদি পূর্ববর্তী আবেগটি পরবর্তী আবেগ অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট হত, অর্থাৎ ভালবাসার আবেগ অপেক্ষা ভয়ের আবেগ তীব্রতর হত তাহ'লে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইত না। আদিম মানুষের ধর্ম-চেতনায় ভয়ের আধিক্য যে দেখা যায় তার একমাত্র কারণ [যেমন অধ্যাপক লিউবা (Leuba) বলেছেন] মানুষের মনে অন্যান্য আবেগের মধ্যে প্রথম ভয়ের আবেগটিই সংহত হয়েছিল। আদিম মানুষকে প্রকৃত ও কাল্পনিক বিপদের বিরুদ্ধে সুতীব্র জীবন-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হত। তার ফলে তাদের চেতন মনে ভয়ের অনুভূতিটি সর্বদা সজাগ হয়ে থাকত। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি না হ'লেও ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতাবোধগুলি ধীরে ধীরে ভয়ের মতই মানুষের মনে জায়গা করে নিল। এবং মানুষের মনের অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে স্বাভাবিকভাবে তা প্রকাশ পেল। ঈশ্বরের বিভীষিকা থেকে নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মীয়তার উপলব্ধি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। রবার্টসন স্মিথ (W. Robertson Smith) এই মত দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেন। তাঁর বহু পরিচিত একটি অনুচ্ছেদ এখানে উদ্ধৃত করা হল। "আদিম মানুষেরা অসংখ্য বিপদের দ্বারা নিজেদের পরিবেষ্টিত বলে মনে করত, সঠিকভাবে তারা বিপদটা কি জানত না ; কিন্তু অদৃশ্য কোন ব্যক্তির রহস্যময় শক্তিই যে বিপদের কারণ তারা সেটা বুঝতে পারত ; এবং এটাও বুঝতে পারত যে সেই ব্যক্তি মানুষের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। —এই মত যতই সত্য হোক না কেন ঐ অদৃশ্য শক্তিকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে একথাকে সত্য বলে স্বীকার করা যায় না। আদিম

কাল থেকেই ধর্ম এবং ইন্দ্রজালের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল। মানুষ একটি স্বজাতি বা বন্ধুভাবাপন্ন সত্তার সঙ্গে সর্বদা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করত। সেই সত্তা নিজেদের মধ্যে কখনো কখনো ক্রোধ প্রকাশ করে থাকতে পারে। কিন্তু সেই ক্রোধকে সহজে শান্ত করা যেত। অবশ্য উপাসকের শত্রুদের প্রতি অথবা স্বধর্ম ও স্বপক্ষ ত্যাগীদের প্রতি তাঁর ক্রোধ ছিল অনির্বাণ। সে যাই হোক, অজ্ঞাত-শক্তির ভয় থেকে নয়, যে দেবদেবী তাঁদের উপাসকদের সঙ্গে আত্মীয়তার দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকতেন, সেই পরিচিত দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা থেকে প্রকৃত অর্থে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে"* স্মিথ সম্ভবতঃ বিষয়টিকে এখানে একটু বাড়িয়ে বলেছেন। তার কারণ তিনি 'টোটেম' প্রথাকেই ধর্মের আদি রূপ বলে স্বীকার করেন। তাঁর মতে গোষ্ঠীর রক্তের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পূর্বপুরুষেরাই হলেন উপাস্য। তবুও স্মিথের বক্তব্যের মধ্যে ভয়ের ভূমিকা কিন্তু থেকে যায়। ধর্মের উন্নতর অবস্থায় ভয়, ভালবাসা, শ্রদ্ধা প্রভৃতিতে উন্নীত হয় সন্দেহ নেই। কিন্তু যতই উন্নয়ন হোক না কেন ধর্মে একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় থেকেই যায়। ওল্ড টেষ্টামেন্টের জনপ্রিয় নীতি হল 'প্রভুর প্রতি ভয়ই হল জ্ঞানলাভের সূচনা' (eg. Ps. exi—10, Prov. ix. 10) এবং নিউ টেষ্টামেণ্টে আমাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে 'ঈশ্বরকে স্বীকার করে নিয়ে উপাসনা কর কিন্তু ঈশ্বর হিসেবে তাঁকে ভয় ও শ্রদ্ধা কর' (Heb. xii-28 Moffatt-এর অনুবাদ)

II

যে সব সিদ্ধান্তে আমরা এখন পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি তা প্রধানতঃ নেতি-বাচক। অর্থাৎ মানুষের মানস-প্রকৃতিতে আমরা এমন কোন পৃথক বৃত্তির খোঁজ পেলাম না যাকে বিশেষভাবে ধর্মীয় বৃত্তি বলা যেতে পারে। এমন কোন সহজাত প্রবৃত্তি বা বিশেষ ধর্মীয় মনোবৃত্তি কিংবা আবেগ অথবা কোন মানস উপাদান নেই যাকে আমরা কেবলমাত্র ধর্মীয় উপাদান হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারি। এমন কি আমরা যদি ধরেও নি যে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে ভয় থেকে, তাহ'লেও এটা স্পষ্ট যে ভয় বিশেষভাবে ধর্মীয় আবেগ মাত্র নয়। কারণ সব রকম ভয় নিশ্চয় ধর্মীয় ভয় নয়। আবার ধর্মীয় চেতনা কেবলমাত্র

* W. R. Smith, The Religion of Semites, P 55. cf. F. Jevous opcit PP. 106-110

কতকগুলি মানস উপাদানের সমষ্টি মাত্র নয়। অংশগুলির যোগফল অপেক্ষা বৃহত্তর একটা সম্পূর্ণতার ধারণাই হল ধর্ম-চেতনা। মানস উপাদানগুলি যোগী ও ভোগী উভয়ের ক্ষেত্রে অভিন্ন। পার্থক্য কেবল সেই উপাদানগুলির সংগঠনে বা উদ্দেশ্যে। সকল সংগঠনই হয় কোন কিছুর জন্য [অর্থাৎ কোন কিছু একটা উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য] ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সবচেয়ে ভাল সমাধান পাওয়া যাবে মনকে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে নয় কিংবা যে উপাদানগুলি মানুষকে ধর্মপ্রবণ করে তুলেছে সেগুলি আবিষ্কার করেও নয়; বরং ধর্মীয় চেতনাকে সহানুভূতিশীল কল্পনার দ্বারা অন্তরে যেমন আছে ঠিক তেমনি রেখে অনুমান করতে হবে তার সামগ্রিক সজীব গতিশীলতাকে। এবং বুঝতে হবে কেন এই গতি? ধার্মিক হয়ে মানুষ কি চায়? তাদের লক্ষ্য কি? কি উদ্দেশ্যে মানস উপাদানগুলি সংগঠিত হয়।

অবয়বী বা স্থিতিশীল মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী এখানে অচল। ক্রিয়াশীল বা গতিশীল মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের আলোচনা করতে হবে। "ক্রিয়াশীল মনোবিজ্ঞানকে প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির মনোবিজ্ঞান হতে হবে"* মানসিক যন্ত্র গঠন তার উদ্দেশ্য নয়। অবশ্য স্থিতিশীল মনোবিজ্ঞানকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। তারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই মনোবিজ্ঞান স্থিতাবস্থায় চেতনার বিভিন্ন দিকটি পর্যালোচনা করে। যে-সব উপাদানে অভিজ্ঞতা গঠিত হয় সেই সব উপাদানকে পৃথক পৃথক অংশে ভাগ করে প্রত্যেক অংশের স্বতন্ত্র আলোচনা করে। কিন্তু মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সেই উপাদানগুলির কাজের কোন আলোচনা করে না। তাহলেও সম্ভবতঃ এই পদ্ধতির সাহায্যেই কেবল আমরা চেতনার বিভিন্ন অবস্থা পুংখানুপুংখভাবে আলোচনা করতে পারি। এই পদ্ধতি কিন্তু একটি ঘটনাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করে। এই পদ্ধতি অনুসারে চেতনা-প্রবাহ অবিভাজ্য। চেতনা-প্রবাহ হল স্থির সারিবদ্ধ কতকগুলো পরমাণু, যে পরমাণুগুলোকে বিভিন্নভাবে সাজান যেতে পারে কিন্তু তার পরও প্রত্যেকের স্বকীয়তা বর্তমান থাকে। যেমন ছেলেদের পকেটে রাখা অনেকগুলো মার্বেল নাড়াচাড়ার ফলে বিভিন্নভাবে সাজানো হলেও মার্বেলগুলির স্ব-পরিচয় অবিঘ্নিত থাকে। যদিও আমরা কখনো কখনো অবয়বী মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্য

* G. A. Coe. The Psychology of Religion (1916). P. 30. See the whole of Chap ii.

নেবো তাহ'লেও আমাদের বুদ্ধিমানের মত ক্রিয়াশীল মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীকে অনুসরণ করতে হবে। কোন মূল্য বা পরিতৃপ্তিলাভের উদ্দেশ্যে চেতনা কাজ করে—এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের চেতনাকে পর্যালোচনা করতে হবে। ধর্ম-চেতনার আলোচনার ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অপরিহার্য। আমাদের প্রথম প্রশ্ন হল—ধর্ম-চেতনার লক্ষ্য কি? কি সে চায়? কোন্ মূল্য বা নৈতিক মূল্যকে সে উপলব্ধি করতে চায়? আমাদের স্মরণ রাখা ভালো যে যখন আমরা উদ্দেশ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করবো, সে আলোচনা কেবল 'লক্ষ্যে'র আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকবে না, উপলক্ষ বা লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায়ও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে। উদ্দেশ্যবাদী আলোচনার লক্ষ্য এবং উপলক্ষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করলে দুটিই অর্থহীন হয়ে পড়ে। লক্ষ্য এবং উপলক্ষ ক্রমবর্ধমান অস্মোপলব্ধির এক-একটি দিক বা এক-একটি মুহূর্ত। প্রথমে যা ছিল উপলক্ষ মাত্র বিবর্তনের ফলে সেটাই এক সময় লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এইভাবে অনুসন্ধানের ফলে এক সময় যাকে উচ্চতর লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা হয় পরবর্তীকালে আমরা সেখানে উপনীত হতে পারি। আমাদের বাসনার এই সমস্যাটি (অর্থাৎ একটা কামনা সিদ্ধির পর উচ্চতর কামনা করা) আশা করি পরবর্তী আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম এখন আমাদের সেখান থেকেই আরম্ভ করা উচিত। আমরা সেখানে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে মানুষের মনেই ধর্মের জন্ম। মানুষের জীবনের উপর রহস্যময় শক্তিগুলির গুরুত্ব-পূর্ণ প্রভাব রয়েছে। রহস্যময় শক্তির অস্তিত্ব অনুমানের ফলে মানুষের মনে যে আবেগ জন্মায় তার থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু এই আবেগ থেকে ধর্মীয় আচারের উদ্ভব হল কি করে? কেন সেই আদিম মানুষগুলি রহস্যময় শক্তির সঙ্গে বন্ধুতার সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইল? স্পষ্টতই তারা বিশ্বাস করত জাগতিক কিছু কিছু বিচিত্র বস্তু (যেমন মানা) হল শক্তির ভাণ্ডার। জীবন সংগ্রামে নিজেদের প্রয়োজনে সেই শক্তি লাভ করা যায়। বাঁচার ইচ্ছাটাকেই তাহ'লে আমরা মৌলিক তাড়না হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। সদর্থক এবং নঞর্থক উভয় অর্থে এই তাড়নাকে গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ মৃত্যু বা ধ্বংসের হাত থেকে আত্মরক্ষার ইচ্ছা এবং জীবনের আনন্দ, সম্পূর্ণতা এবং

ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা—এই উভয়বিধ ইচ্ছাই হল মৌলিক ইচ্ছা। কেবলমাত্র নিজের ক্ষমতা-বলে অস্তিত্ব রক্ষার এই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া আদিম মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তাদের নিপুণতা ও শক্তিবৃদ্ধির যে-কোন সম্ভাবনাকে সাগ্রহে তারা গ্রহণ করত। সেই শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা তারা খুঁজে পেয়েছিল অস্বাভাবিক জিনিসগুলির মধ্যে। তারা বিশ্বাস করত যে একরকম রহস্যময় শক্তি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত রয়েছে। আদিম মানুষ তাদের জীবন-সংগ্রামে নিজ দলভুক্ত করার জন্য সেই সব শক্তিকে আবেদন-নিবেদনের দ্বারা সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করত।

অতএব ধর্মের মূলে রয়েছে জৈবিক প্রয়োজন অথবা বলা যেতে পারে জীবন-সংগ্রাম। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের প্রতি মমত্ব জন্মায়। তাই গুণগত-ভাবে কিংবা পরিমাণগতভাবে জীবনের যখন অগ্রগতি হয়, তখন জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা নিজের থেকেই ক্রমশঃ ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে।* এখন আমরা ধর্মের ক্রমবিকাশের সর্বস্তরে একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে পারি। কারণ মানুষের প্রাথমিক ইচ্ছা যে বাঁচার ইচ্ছা একথা জীবনের ইতিহাসে স্বীকৃত। তা না হ'লে সমগ্র জাতি অনেক আগে আত্মহত্যা করে বসত। ধর্ম হল প্রধানতঃ জীবনের সম্পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতা লাভের জন্য নিরন্তর অনুসন্ধান। গুণগত পরিতৃপ্তি ও সমৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে পরিমাণগত সম্পূর্ণতা ও ব্যাপ্তির অনুসন্ধান করাই হল ধর্মের উদ্দেশ্য।

বৌদ্ধধর্মে ধর্মের একটি সুসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মই সম্ভবতঃ একমাত্র ব্যতিক্রম যেখানে সকল আকাঙ্ক্ষাকে এমনকি বাঁচার আকাঙ্ক্ষাকেও লোপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধদের জীবনের লক্ষ্য নির্বাণ। সকল রকম কামনার দাসত্ব থেকে মুক্তি। একটা পরিপূর্ণ শান্ত সুষুপ্তির অবস্থা। যার সঙ্গে মৃত্যুর কোন পার্থক্য নেই বললেই চলে। আমাদের মূল আলোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাণকে ব্যাখ্যা করা কঠিন নয়। নির্বাণে আবেগ বা আকাঙ্ক্ষার স্থান নেই একথা ঠিক নয়। নির্বাণ হল পরিপূর্ণ এক প্রশান্তি। পার্থিব, সসীম সব কিছু সেই লক্ষ্যে পৌছানোর বাধাস্বরূপ। তাই পার্থিব সব কিছুর উপর নিরাসক্তি বৌদ্ধধর্মের আদর্শ। কিন্তু অসীমকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা বৌদ্ধধর্মেও আছে। অন্ততঃ পরবর্তী বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি নির্বাণ

* J. Lewis—Vital Social Factors in Religion (1920), P. 27

বলতে বুঝেছেন স্বর্গলাভ ; অর্থাৎ যেখানে আত্মা জরা-ব্যাধি-মৃত্যুহীন অনন্ত সুখ ভোগ করতে পারবে। বৌদ্ধধর্ম যেখানে সকল রকম কামনা-বাসনা ও অনুভূতিকে বাদ দিতে চেয়েছে সেখানে সে আর ধর্ম থাকে নি, একটি গূঢ় দর্শনে পরিণত হয়েছে। ধর্ম হিসেবে অনুরূপ কথা খৃষ্টধর্মেও আছে। চতুর্থ সুসমাচারে যীশুকে বলা হয়েছে—মানুষের জীবন থাকতে পারে, কিন্তু সৃজনশীল বাসনাই কেবল সেই জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে পারে। "বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই সৎ লোকেরা জীবন ধারণ করেন।" বিশ্বাসই জীবনের লক্ষ্য। "মৃত্যু নয়, জীবনের জন্যই আমরা উৎসুক, জীবন,—পূর্ণতর জীবন—আরো জীবন আমরা পেতে চাই"।

যাই হোক, আমরা যে 'বাঁচার ইচ্ছার' উল্লেখ করেছি অনেকে তার এই বলে সমালোচনা করতে পারেন যে ঐ আবেগ ত নিতান্তই জৈব-আবেগ। ঐ আবেগকে বিশেষ করে ধর্মীয় আবেগ বলা যায় কি? বাঁচার আকাঙ্ক্ষা কেবল ধর্মকে পরিচালনা করে না সামগ্রিকভাবে জীবনকেও পরিচালনা করে। তাছাড়া এই আকাঙ্ক্ষা কেবল মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সব প্রাণীকেই বাঁচার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। বাঁচার আকাঙ্ক্ষা তাদেরও আছে। কিন্তু যতদূর জানা যায় মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষা নেই। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ধর্ম কি তাহলে জৈবিক প্রয়োজন ছাড়া আর কিছু নয়?

এই প্রশ্নের জবাবে প্রথমে আমরা স্বীকার করবো যে ক্রিয়াশীল মনোবিজ্ঞান এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে বাধ্য। অবশ্য এ ছাড়া আরও অন্য কিছুকে যে তার অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। মানসজীবনের অন্যান্য দিকের মত ধর্মের মূলও রয়েছে জীব-বিজ্ঞানে। অবশ্য ধর্ম সেখানে সম্পূর্ণ বিকশিত হয় নি। [ধর্ম হিসেবে তখন তাকে চেনাও শক্ত] কারণ ফলে যা থাকে শেকড়ে কি তাই থাকে? ফুলের রূপ গুণ গন্ধ কি বীজে খুঁজে পাওয়া যাবে? মানস ক্রিয়ার সঙ্গে জৈবিক ক্রিয়ার আমরা যদি সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হই তাহ'লে আমরা অনেকটা সফল হয়েছি মনে করবো। কৃত্রিম উপায়ে মানুষের উপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোন বিশ্বাসকে তখন আর ধর্ম বলা চলবে না। স্বীকার করতে হবে, জীবনের সকল স্রোতস্বিনী যেখান থেকে প্রবাহিত ধর্মেরও উৎপত্তি হয়েছে সেই একই উৎস থেকে। অর্থাৎ যে শক্তি মানুষের সকল আচরণকে পরিচালিত করে সেই মৌল-শক্তিটি থেকেই ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। তাহলে দেখা গেল ধর্মচেতনা মানুষের সামগ্রিক চেতনার মতই জৈবিক।

দ্বিতীয়তঃ, বলা যেতে পারে যে জীবনের প্রতি মানুষের অতৃপ্ত বাসনা, অন্যান্য অভিজ্ঞতার থেকে ধর্মীয় অভিজ্ঞতাতেই অধিকতর সার্থকতা লাভ করেছে। ধর্ম মানুষকে পরিপূর্ণ জীবনের সন্ধান দিয়েছে যেমনটি আর কোন কিছু থেকে পাওয়া যায় নি। জৈব-আকাঙ্ক্ষার বেড়াজাল ভেঙ্গে ধর্ম জীবনকে অনেক ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে পেরেছে। কেবলমাত্র অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত না রেখে মানুষকে সত্য শিব ও সুন্দরের মধ্যে উন্নততর পরিতৃপ্তির সন্ধান দিয়েছে। অবশ্য একথা সত্য নাও হতে পারে যে ধর্মই কেবল আমাদের এই অভিনব মূল্যের সন্ধান দিয়েছে। কারণ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অভিজ্ঞতার সাহায্যেও মানুষ সত্য-সুন্দরের অন্বেষণ করেছে। কিন্তু ধর্ম-জীবনেই মানুষ ঐ মূল্যগুলিকে একটা বিশাল সুসংবদ্ধ জীবন-যাপন প্রণালীর মধ্যে সুসংঘটিত করতে সক্ষম হয়েছে, এবং এই জীবনকে আদর্শ জীবন হিসেবে গ্রহণ করেছে। যে জীবনে আছে পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধির নির্দেশ, যে জীবনে আছে ইন্দ্রিয় জয় করার উপায় সেই জীবনকেই আমরা অদর্শ জীবন বলি। একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে আদিম মানুষের কাছে এইসব ধারণা ছিল নিতান্ত অস্পষ্ট। স্পষ্টতর রূপ নিতে এই ধারণাগুলিকে বিবর্তনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করতে হয়েছে। এক সময় ধর্ম ছিল লৌকিক শুভ বা পার্থিব মঙ্গল লাভের উপায় মাত্র। যুদ্ধজয়, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি তখন ছিল মঙ্গলের রূপ। এই মঙ্গল আদিম মানুষের জীবন সংগ্রামের সহায়ক ছিল। বিপজ্জনক পরিবেশের মধ্যে নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভের অনুভূতি থেকে আদিম মানুষের মনে এই মঙ্গলের ধারণা জন্মেছিল। কিন্তু এই ধারণা যতই বিকাশ পেতে লাগল কেবলমাত্র জৈব আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির মধ্যে তখন আর সে সীমাবদ্ধ থাকল না। জীবনের বিশেষ এক ধরনের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির পথ সে অন্বেষণ করতে আরম্ভ করল। দৈহিক মঙ্গলের ধারণা এক সময় আত্মিক মঙ্গলের রূপ পরিগ্রহ করল। মানুষ ক্রমে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করল, 'কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়সুখে মানুষ তৃপ্ত হতে পারে না। পাকস্থলী এবং আত্মা দুটি পৃথক জিনিস।' তাছাড়া ধর্ম প্রথম থেকেই আত্মিক প্রকৃতির। একটি অদৃশ্য শক্তির দ্বারা মানুষ সর্বদা নিয়ন্ত্রিত—এই বিশ্বাস থেকেই ধর্মের সূচনা হয়েছিল। সেই অস্পষ্ট অনুভূত অদৃশ্য শক্তির ধারণা, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক ধারনায় ক্রমশ রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয়তঃ, ধর্ম অন্য সব কিছু থেকে আরও একটি কারণে স্বতন্ত্র।

জীবনের সহস্র কামনা-বাসনা চরিতার্থতার জন্য বা আদর্শ লাভের জন্য ধর্ম কিছু কিছু ক্ষমতার সাহায্য গ্রহণ করে। সেই ক্ষমতাগুলি অমানবীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতির। এবং সেই ক্ষমতাগুলিকে ব্যক্তি হিসেবেও কল্পনা করা হয়। তাঁরাই ঈশ্বর। আমরা প্রথম অধ্যায়ে যে মত প্রকাশ করেছি সে কথাকে মেনে নিতে হলে স্বীকার করতেই হয় যে ধর্মের স্থূল সূচনাকালে ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক ধারণার মধ্যে স্পষ্ট কোন পার্থক্য ছিল না। তাই সে সময় ধর্ম এবং ইন্দ্রজাল ছিল অনেকটা অভিন্ন। কিন্তু ধর্ম অদৃশ্য ক্ষমতাগুলিকে যত ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে লাগল পার্থক্যটা ততই স্পষ্ট হয়ে উঠতে আরম্ভ করল। যদিও সেই সময় ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ মনুষ্য-গুণবিশিষ্ট বলে গ্রহণ করা হত না তবু তাঁরা যে অনেকাংশে মানব-সদৃশ ছিলেন এই ধারণা ক্রমশ দৃঢ় হতে লাগল। যাঁরা ধর্মের ক্ষেত্রে কেবল মূল্যবোধের প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং ঈশ্বরের অপরিহার্যতা অস্বীকার করেন আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারি না। অধ্যাপক লিউবার (Leuba) ঘোষণার সঙ্গে আমরা অনেকাংশ একমত। "মানুষের অন্যান্য আচরণ থেকে ধর্মের পার্থক্য এই যে ধর্ম একটি ঐশ্বরিক ক্ষমতার আনুগত্য অনুভব করে…ধর্ম মানুষের অভিজ্ঞতার সেই দিকটি প্রকাশ করে যেখানে সে কতকগুলি ক্ষমতাকে (যাদের প্রকৃতি আধ্যাত্মিক) প্রধানতঃ ব্যক্তি রূপে গ্রহণ করে। তার পর সেই ক্ষমতাগুলির সঙ্গে একটি সম্পর্ক স্থাপন করতে এবং নিজেদের প্রয়োজনে সে ক্ষমতাগুলিকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে।"* "বাঁচার ইচ্ছা তখনই ধর্মে পরিণত হল যখন সেই ইচ্ছা এক শ্রেণীর ক্ষমতার কাছে 'আবেদন' রূপে প্রকাশ পেল। সেই ক্ষমতাগুলির প্রকৃতি আধ্যাত্মিক, অমানবিক এবং প্রধানতঃ ব্যক্তিক। (অবশ্য ব্যক্তি যে হতেই হবে এমন কোন কথা নেই)।"† তাহ'লে ধর্ম হল অপার্থিব শক্তির সহায়তায় জীবনকে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ করার উপায়। মানুষ অপেক্ষা দেবতারা অধিকতর শক্তিশালী। মানুষ কিছু কিছু শর্ত-সাপেক্ষে সেই ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম। লিউবা আরও বলেছেন—'ধর্মীয় অভাববোধ বলে স্বতন্ত্র কোন অভাব নেই। অভাব পূরণের পদ্ধতি বা উপায়ের মধ্যে নিহিত আছে ধর্মের স্বতন্ত্রতা"।‡ "এখানে ঈশ্বর লক্ষ্য নন, উপলক্ষ

---

* J. H. Leuba—A Psychological Study of Religion (1912), P. 52. see the whole of the Part I

† Ibid—P.7

‡ Ibid—P. 8

মাত্র। তাছাড়া লক্ষ্য নির্ধারণের বিষয়ে তাঁর কোন ভূমিকাই নেই"* এই মতবাদকে নির্দ্বিধায় একটি অধর্মীয় মতবাদ বলা যেতে পারে। কারণ লিউবার (Leuba) যুক্তি অনুযায়ী ঈশ্বর ঈশ্বর হিসেবে কারো ভালবাসার পাত্র হতে পারেন না। কারো আরাধ্যও হয়ে উঠতে পারেন না। জীবনের সম্পূর্ণতার জন্যই কেবল তাঁর প্রয়োজন। লিউবা যে ভাবে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন তাতে এধরনের সমালোচনা খুবই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি লক্ষ্য আর উপলক্ষের মধ্যে কোন বাঁধাধরা পার্থক্য নেই। অবশ্য বিবর্তনের রহস্যই হল প্রথমে যা উপলক্ষ থাকে পরে তাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এবং সেই লক্ষ্য তখন উপলক্ষ হিসেবে আরও কার্যকরী হয়ে ওঠে। যেমন সত্য এবং সুন্দর প্রথমে কেবলমাত্র জীবন-সংগ্রামের হাতিয়ার হয়েছিল। জীবন রক্ষার উপায় হিসেবে তাদের প্রয়োজন হত। ক্রমে সত্য এবং সুন্দর নিজেরাই লক্ষ্য হয়ে উঠল। কোন উপযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, কোন কিছু লাভের উপায় হিসেবে নয়, নিজস্ব মূল্যে সত্য সুন্দরকে মানুষ চরম কাম্য বলে মনে করতে লাগল। আর তখনই সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের ধারণা মানুষের জীবনকে সংকীর্ণতামুক্ত করতে অধিকতর সাহায্য করতে পারল। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার জগতেও ঠিক একই জিনিস চলেছে। ধর্ম-জীবনের উন্নত অবস্থায় ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হয় না। জীবনের প্রতি নিরাসক্ত থেকে মানুষ ঈশ্বরকে সেবা করার জন্যই সেবা করে ও ভালবাসার জন্যে ভালবাসে। উন্নত ধর্মে ঈশ্বর কোন লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় নন। তিনি নিজেই তখন পরম লক্ষ্য। ঈশ্বর ব্যতীত কোন কিছুর মূল্য নির্ধারণ করা তখন অসম্ভব! ঈশ্বরই পরম মূল্য হিসেবে স্বীকৃত হন। এবং ঐশ্বরিক ইচ্ছার দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের অন্যান্য লক্ষ্যগুলির মূল্যায়ন সম্ভব হয়। যীশুর প্রার্থনায় ধর্মীয় অভিজ্ঞতার উন্নততম চরিত্রটি প্রকাশ পেয়েছে। "আমার ইচ্ছামত নয়, তোমার ইচ্ছামতই সব কিছু হবে"। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মানুষ উন্নততম ও সমৃদ্ধতম জীবনে ক্রমবিকশিত হয়েছে। অবশ্য মানুষ সচেতন যে সে ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালিত। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করাই তার কাজ এবং সেটাই তার জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম আদর্শ।

এই সব কথা মনে রেখে বহুধাবিভক্ত জটিল ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে একটিমাত্র সূত্রে প্রকাশ করা যে প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার আশাকরি সকলে তা স্বীকার করবেন।

* G. A. Coe, opcit 63

আমরা ভেবেছিলাম ক্রিয়াশীল মনোবিজ্ঞানের আলোচনার সূত্রটি সবচেয়ে সার্থক। ধর্ম মূলতঃ জীবন-জীজ্ঞাসা। কিন্তু ধর্মের সম্পূর্ণ অর্থোপলব্ধি করতে হলে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা 'মানুষ' কথাটিকে এক বচনে ব্যবহার করেছি। এতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা যেন একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে কোন কিছু স্বীকার করা হয় না। একক একটি মানুষের কোন অস্তিত্ব নেই। সে সর্বদা এবং সর্বত্র একটি সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য। সমাজ ছাড়া একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি যেমন অচিন্ত্যনীয়, তেমনি ব্যক্তি ছাড়া সমাজও নিতান্তই একটি কাল্পনিক চিন্তা মাত্র। প্রকৃত ঘটনা হল মনুষ্যজীবনকে যেমন ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে তেমনি সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকেও তার বিশ্লেষণ সম্ভব। কিন্তু জীবন সব সময় একই সঙ্গে ব্যক্তিক ও সামাজিক।* ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে না। সামাজিক জীবনের সহস্র বাঁধনে ব্যক্তিজীবন পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আবার সমাজের প্রাণশক্তি হল ব্যক্তি। কারণ ব্যক্তি নিয়েই সমাজ গঠিত। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ আছে। আমরা এতক্ষণ ধরে জীবনের প্রতি, অথবা বলা যায়, অধিকতর ও পূর্ণতর জীবনের প্রতি যে আকাঙ্ক্ষার উল্লেখ করেছি তা কখনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতে পারে না। গোষ্ঠী ব্যতীত কোন স্বতন্ত্র আত্মার ধারণা করা বা আত্মোপলব্ধি করা কখনই সম্ভব নয়। আকাঙ্ক্ষাটি হল সমগ্র মনুষ্য জীবনোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা। একই সঙ্গে ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবন উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা। আদিম সমাজে আত্মরক্ষার জন্য কোন সংগ্রাম ছিল না। ছিল গোষ্ঠীরক্ষার সংগ্রাম। ব্যক্তিজীবন ও গোষ্ঠীজীবনের নিরাপত্তা ওতপ্রোতভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল।

"কারণ, দলের শক্তি নেকড়ে
এবং নেকড়ের শক্তি দল।"

সমাজ-জীবনে অংশগ্রহণ করে এবং সামাজিক কর্তব্য সম্পাদন করে ব্যক্তি তার জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। আত্মসুখবাদ এবং সর্বসুখবাদের বিরোধ নিতান্তই কৃত্রিম। অভিভাবকত্বের মনোবৃত্তি (যার থেকে সর্বসুখবাদের উদ্ভব) আত্মরক্ষার মনোবৃত্তির মত সুপ্রাচীন। জীবন দেবার প্রবণতা জীবন

* Cf. J. B. Pratt. The Religious Consciousness (1921), P. 76

রক্ষার প্রবণতার মতই আদিম। আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধিই হল জীবনের ধর্ম। "প্রত্যেকটি আত্মত্যাগই হল আত্মসংরক্ষণ। অর্থাৎ আদর্শ আত্মার সংরক্ষণ"* মানুষ ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে আদর্শ জীবন যাপন প্রণালীর পরিজ্ঞান লাভ করেছে। এই ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে ব্যক্তি সংকীর্ণ স্বার্থপর কামনা-বাসনার উর্দ্ধে উঠতে পেরেছে। এবং বৃহৎ সমাজ-জীবনের কাছে নিজে আনুগত্য স্বীকার করে সুশৃংখল জীবনযাত্রার সন্ধান পেয়েছে। প্রথম থেকেই আমরা দেখেছি ধর্ম একটি সামাজিক বিষয় কিন্তু ইন্দ্রজাল সমাজ-বিরোধী। বিশেষতঃ প্রাথমিক যুগে গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করা এবং সুরক্ষিত করাই ছিল ধর্মের লক্ষ্য। ব্যক্তি নয়, গোষ্ঠীই ছিল তখন ধর্মের আধার। [ব্যক্তিধর্ম বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব তখন ছিল না] পরবর্তীকালে ক্রমশঃ যখন ব্যক্তিজীবনের মূল্য উপলব্ধি করা সম্ভব হল, ধর্ম তখন অধিকতর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত ধারণার বিষয় হয়ে উঠল। আত্মোপলব্ধি ও মোক্ষের ধারণা মানুষ লাভ করেছে অনেক পরে। এটি একটি মহৎ লাভ সন্দেহ নেই। কিন্তু সমাজের প্রভাব মানুষ কখনো কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তাছাড়া সমাজের উর্দ্ধে ব্যক্তিকে স্থাপন করলে খুব যে সুবিধে হবে এমন কথাও বলা যায় না। সামাজিক পরিবেশেই যে কেবল ধর্মীয় অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় তাই নয়, সামাজিক মানুষের মধ্যে ধর্ম তার পরম মূল্য লাভ করতে পারে; এবং সেই মূল্য চিরস্থায়ীও হতে পারে।

দুর্খ্যাঁ (Durkheim) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের মতে ধর্ম হল মূলতঃ একটি সামাজিক বিষয়। তাঁদের এই মত সমর্থন করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তাঁরা যখন বলেন ব্যক্তিকে সংযত করার জন্য এবং সমাজের প্রতি অনুগত রাখার জন্য ধর্ম হল সমাজের এক ধরনের হাতিয়ার তখন তাঁদের মতকে পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। একথা ঠিক যে ধর্ম ব্যক্তিকে শক্তিশালী করে তোলে এবং ব্যক্তির মধ্য দিয়েই সমাজেব প্রগতি সম্ভব হয়। সামগ্রিকভাবে সমাজ কিছুটা প্রাচীনপন্থী বা গোঁড়া। ধর্মমত, প্রথা, রীতিনীতি প্রভৃতির সাহায্যে সমাজ একদা আবিষ্কৃত মূল্যগুলিকে সযত্নে লালন করে। কিন্তু উদ্যোগ, প্রগতির বাসনা, নতুন আবিষ্কারের উদ্দীপনা, দাসত্ব মোচনের প্রয়োগ প্রভৃতি দেখা যায় প্রধানতঃ মহাপুরুষদের মধ্যে। তাঁরা প্রচলিত রীতিনীতিকে

* Paulsen, System of Ethics, P. 389.

ভেঙ্গেচুরে পূর্ণতর ও মহত্তর জীবনের জন্য সমাজকে নতুন মূল্যবোধ দান করেন। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে এইসব মনীষী ও মহামানবেরা সমাজেরই দান। সমাজের উন্নতির ক্ষণটিতে তাঁরা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। কোন মহাপুরুষ কোন সত্য আবিষ্কার করে সেই সত্যকে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা করে রেখে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। তাঁরা চান তাঁদের আদর্শ সমাজ-জীবনে প্রচলিত হোক। সকলে গ্রহণ করুক। পরিশেষে তা একটি সামাজিক বিধিতে পরিণত হোক। তাহ'লেই তার উপলব্ধির সার্থকতা। সমগ্র আলোচনার সিদ্ধান্তে এই কথা বলা যেতে পারে যে ব্যক্তি ও সমাজ যতই পৃথক হোক না কেন, পরস্পর পরস্পরের কাছে প্রয়োজনীয়। ব্যক্তিগত ধর্মই হোক আর সামাজিক ধর্মই হোক উভয় প্রকার ধর্মের পেছনে রয়েছে সেই এক আবেগ—জীবন উপলব্ধির তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

III

ধর্মের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাটিকে আরও একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। যে যে মাসন-উপাদান ধর্মের উৎপত্তি ও প্রগতিকে নিয়ন্ত্রিত করে বিশেষ করে সেগুলিকে আবিষ্কারের চেষ্টা করা যাক। এই আলোচনার আগে মানুষের মাসনপ্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। আমরা দেখেছি ধর্মের জন্য মানুষের বিশেষ কোন মনোবৃত্তি নেই। যে মানস-উপাদানের সাহায্যে মানুষ অন্য সকল কাজকর্ম করে, ধর্মীয় আচরণের কারণও সেই একই মানস-উপাদান। চিন্তা ইচ্ছা ও অনুভূতি এই তিনভাগে মানুষের প্রকৃতিকে ভাগ করাই হল প্রচলিত রীতি। আমরাও বর্তমান আলোচনায় এই বিভাজনকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবো। আধুনিক মনোবিদদের মধ্যে অনেকে এরিষ্টটলীয় মনোবিজ্ঞানের মত মনকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। তাঁদের মতে ইচ্ছা ও অনুভূতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। ওদের পৃথক করার কোন অর্থ হয় না। আমাদের প্রয়োজনে কিন্তু তিন ভাগে বিভাজন রীতি অনুসরণ করা সুবিধাজনক। লিউবা (Leuba) সংক্ষেপে যা বলেছেন তাকেই আমরা আমাদের সূচনা হিসেবে গ্রহণ করবো। "চেতনাকে বিমূর্তভাবে কল্পনা না করে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাবে পরিমাণগত তারতম্য থাকলেও ইচ্ছা অনুভূতি ও চিন্তা প্রতি মুহূর্তের চেতনায় উপস্থিত রয়েছে। চিন্তা ইচ্ছা অনুভূতি দিয়েই চেতনা গঠিত। চেতন মন মানে কেবল চিন্তা, কেবল ইচ্ছা বা কেবল অনুভূতি নয়। তিনটি

একই সঙ্গে একটি বিষয়ের উপর সন্নিবিষ্ট হয়।"* প্রতিটি অভিজ্ঞতায়, চিন্তা ইচ্ছা ও অনুভূতি এই তিনটি মানস-উপাদানই উপস্থিত থাকে ঠিক, কিন্তু এর থেকে প্রমাণিত হয় না যে ব্যক্তির বা জাতির বিবর্তনের উপাদান হিসেবে প্রত্যেকটি মানস-উপাদান সমান গুরুত্বপূর্ণ। অথবা কোন একটি মানসিক অবস্থায় বা কোন বিশেষ সময়ে তিনটি উপাদান সমানভাবে কাজ করে। এই তিনটি উপাদানের মধ্যে কোন একটি উপাদান চেতনার কেবল পরিণত অবস্থাতেই নয় পরিবর্তনের কালেও কি প্রধানের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে? মানুষের সামগ্রিক বিবর্তনে এদের কোন একটি উপাদানের কি বিশেষ কোন কার্যাকারিতা রয়েছে?

প্রাচীনেরা চিন্তাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। 'মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী' এই হল প্রচলিত সংজ্ঞা। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী ও ইংরেজ বুদ্ধিবাদীদের মতে আদিম মানুষ ছিল সম্পূর্ণ একটি বুদ্ধিমান প্রাণী। পরবর্তীকালে পুরোহিতদের কথা এবং সভ্যতার বাঁধাধরা রীতিনীতি মানতে গিয়ে তাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধির বিকৃতি ঘটেছে। কিন্তু অসভ্য মানুষদের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করলে দেখা যাবে বুদ্ধিবাদীদের এই বর্ণনা কতটা অবাস্তব। নব্য মনোবিজ্ঞান আজ প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হয়ত আরও ভাল করে প্রমাণ করতে পারবে যে অত্যাধুনিক একজন শিক্ষিত ইউরোপীয়ও সম্পূর্ণ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত নন। একজন শিক্ষিত মানুষ কতটা বেশী যুক্তিহীন ভাবাবেগের দ্বারা অথবা নির্জ্ঞান মনের গোপন বাসনার দ্বারা পরিচালিত তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। নিজের কাজের সমর্থনে কোন শিক্ষিত লোক পরে যে সব যুক্তি দেখান সেটি অসীম ধূর্ততার সঙ্গে প্রকৃত বাসনাকে গোপন করার একটা কৌশল মাত্র।

সম্প্রতিকালে বুদ্ধিবাদ থেকে সরে এসে বাসনার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাসনাবাদীদের মতে চেতন মনকে প্রধানতঃ ইচ্ছা বা বাসনাই নিয়ন্ত্রিত করে। কাণ্ট (Kant) একসময় বিশুদ্ধ চিন্তা অপেক্ষা কার্যকরী চিন্তার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বর্তমানকালের বাসনাবাদীরা সেখান থেকেই তাঁদের প্রথম সমর্থন লাভ করেন। তারপর তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থন পেয়েছেন ফিক্‌টে (Fichte) সোপেনহাওয়ার (Schophenhaur) প্রভৃতি দার্শনিকদের কাছ থেকে। ভুণ্ড্‌ট্ (Wundt), হফ্‌ডিং

* J. H. Leuba—The Psychological Origin and Nature of Religion. P. 8

(Hoffding) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের কাছ থেকেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। লিউবা (Leuba) বাসনাবাদকে এইভাবে প্রকাশ করেছেন "ইচ্ছাই প্রধান। চেতন মনের সকল ক্রিয়া লক্ষ্য করলে দেখা যাবে হয় সে কিছু পেতে চাইছে নইলে কোন কিছুকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। এই ইচ্ছার প্রকাশ সেই মুহূর্তে হতে পারে অথবা দীর্ঘকাল পরেও হতে পারে।" তাঁর মতের সমর্থনে লিউবা আরও বলেন, "চিন্তা ব্যতীত ইচ্ছা সম্ভব, (নিশ্চয় নয়, পরের পৃষ্ঠাতেই লিউবা স্বীকার করেছেন, প্রত্যেকটি চেতনা হল চিন্তা, ইচ্ছা ও অনুভূতির মানসিক যৌগ) কিন্তু ইচ্ছা ব্যতীত চিন্তা সম্ভব নয়। এমন কি তথাকথিত আগ্রহহীন তাত্ত্বিক চিন্তাও ইচ্ছা ছাড়া অসম্ভব। ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা বা অভিপ্রায় ব্যতীত কোন চিন্তা হয়ও না হতেও পারে না। লক্ষ্যহীন চিন্তা দিয়ে স্বপ্নও সম্ভব নয়। যদি হয় তা হ'বে অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন কতকগুলো চিন্তন-অণুর সমষ্টি মাত্র। উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ই চিন্তাকে চিন্তা করে তোলে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের সাহায্যে চিন্তা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা ইচ্ছা করি বলে চিন্তা করি। চিন্তার নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই। চিন্তা হল ইচ্ছার একটি হাতিয়ার মাত্র। বিশ্বাসের ইতিহাসে চিন্তার উপর ইচ্ছার সম্পূর্ণ প্রভুত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।* ইচ্ছার উপর এই অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান এবং চিন্তাকে ইচ্ছার হাতিয়ার রূপে বর্ণনা করা প্রধানতঃ একদেশদর্শী বুদ্ধিবাদী মনোবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে একটি সোচ্চার প্রতিবাদ মাত্র। বুদ্ধিবাদীরা মনে করতেন, বুদ্ধি চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অর্থাৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে স্বতন্ত্র ভাবে কাজ করতে পারে। মানুষ যে কখনো কেবলমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী ছিল না (এখনো নেই) এর থেকে সুনিশ্চিত সত্য আর কিছু হতে পারে না। মানুষ কোন সংকল্প ছাড়া চিন্তা করে না। এই সংকল্পের মূলে থাকে আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু লিউবা যখন বলেন ইচ্ছা ছাড়া চিন্তা হতে পারে না এবং ইচ্ছাই চিন্তাকে পরিচালিত করে তখন মনে হয়, মানুষের ইচ্ছাটাই যেন চিন্তা করার ইচ্ছা। প্রত্যেক ইচ্ছাতেই চিন্তা থাকে। যত অস্পষ্টই হোক না কেন প্রত্যেকটি ইচ্ছায় একটি আকাঙ্ক্ষিত বিষয় থাকে। কেবলমাত্র চিন্তা করা যেমন অসম্ভব তেমন কেবলমাত্র ইচ্ছা করাও সম্ভব নয়। আমরা অবশ্যই কোন কিছু একটা আকাঙ্ক্ষা করি। এবং

* J. S. Leuba—The Psychological Origin and Nature of Religion (1900), Pp. 6—8.

ঐ 'কিছু একটা'ই হল চিন্তার বিষয়। তাহ'লেও আমরা স্বীকার করি, আদিম মানুষের বিবর্তনের ক্ষেত্রে চিন্তার থেকে ইচ্ছাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

মানুষের ইতিহাসে 'বাঁচার ইচ্ছার' অনেক পরে যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তা আবির্ভূত হয়েছে। এবং তার পরও বাঁচার ইচ্ছার হাতিয়ার হিসেবে ঐ চিন্তা ক্রমবিকশিত হয়েছে। বাঁচার বিষয়েই মানুষের প্রধান আগ্রহ। এবং সেইজন্যই সে জানতে চেয়েছে কি করে বাঁচা যায়? [প্রথম ইচ্ছা অর্থাৎ বাঁচার ইচ্ছা—তারপর চিন্তা অর্থাৎ কি করে বাঁচা যায় তার চিন্তা] এখানেও প্রথমে যা ছিল উপলক্ষ পরে তাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপাত উপযোগিতা ছাড়াই সত্য মূল্যবান হতে পারে। সত্যের জন্য সত্যানুসন্ধানই হল আদর্শ। এই আদর্শ আমাদের নাগালের ঊর্ধ্বে নয়। অবশ্য এই আদর্শ অনুসন্ধান সম্ভব হয়ে উঠবে না যদি আমাদের অনুসন্ধানের ইচ্ছা না থাকে বা আদর্শ লাভের ইচ্ছা না থাকে।

ইচ্ছা অপেক্ষা অনুভূতিকেও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মানস-উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। অবশ্য একথা ঠিক যে ব্যক্তি ও সমাজের বিবর্তনের প্রাথমিক অবস্থায় ইচ্ছা ও অনুভূতির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। তারা পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। কিন্তু চিন্তার সাহায্যে উভয়কে সহজে পৃথক করা যায়। কারণ অনুভূতি [অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ] নিষ্ক্রিয়। কিন্তু ইচ্ছা সক্রিয়। অনুভূতি ব্যক্তিত্বের গভীরতম অন্তরঙ্গ দিকটি প্রকাশ করে। সুখ-দুঃখের অনুভূতিই হল জীবনের প্রধানতম উপাদান। এর সাহায্যে আমরা আমাদের স্বতন্ত্রতা ও জীবনীশক্তির উপলব্ধি লাভ করতে পারি। অনুভূতিই হল আমাদের সুস্পষ্ট ও সুগভীর অভিজ্ঞতা। প্রথমে শ্লায়ারমেকার (Scheleiermacher) এবং পরে লোটজার (Lotze) দর্শন থেকেই আধুনিক ধর্মতত্ত্বে অনুভূতি অভিজ্ঞতার প্রাথমিক উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

1. অনুভূতি থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে এই দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের ক্রমবিকাশের প্রশ্নটি আলোচনা করা যাক। অনুভূতি দিয়ে সুরু হয়েছে স্বীকার করে নিলেও সূচনায় ধর্ম চিন্তা ইচ্ছা ব্যতীত কেবলমাত্র অনুভূতির বিষয় ছিল—একথাটি সম্ভবতঃ ঠিক নয়। আমরা দেখেছি চিন্তা ও ইচ্ছা ছাড়া অনুভূতির অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। আমাদের বক্তব্য হল ধর্মের আদিতে চিন্তা ও ইচ্ছা অপেক্ষা অনুভূতির ভূমিকা ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি সর্বাপেক্ষা

উন্নত ধর্মেও অনুভূতি অপরিহার্য। অনুভূতির মধ্য দিয়ে ধর্মের একান্ত ব্যক্তিগত এবং গুরুত্বপূর্ণ দিকটি প্রকাশিত হয়। যদি ঈশ্বরের প্রতি মানুষের মনোভাব আবেগে পরিপ্লুত না হত, এমন কি তাতে শান্তি ও পরিতৃপ্তির অনুভূতিটি যদি প্রচ্ছন্ন না থাকত তাহ'লে সম্ভবতঃ তাকে ধর্মীয় মনোবৃত্তি বলা যেত না। শ্লায়ারমেকারের (Scheleiermacher) পর থেকে অনেক চিন্তাবিদ ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় অনুভূতির গুরুত্বকে স্বীকার করে আসছেন। শ্লায়ারমেকারের Redenuber die Religion (1799) গ্রন্থটিতে এই মতের সবচেয়ে ভালো আলোচনা রয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন, অসীমকে পাওয়ার এবং তাঁর মধ্যে নিজেকে লীন করে দেবার ফলে আত্মার তাৎক্ষণিক যে অনুভূতি হয় তার মধ্যেই ধর্মের মূলতত্ত্ব নিহিত রয়েছে। তাঁর পরবর্তীকালের আরও পরিণত গ্রন্থে (Der christliche Glaube 1821—22) ধর্মের বিখ্যাত সংজ্ঞাটি পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন—ঈশ্বরের প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভরতার অনুভূতিকেই ধর্ম বলে। অধ্যাপক উইলিয়ম জেম্‌স (William James) তাঁর সাড়াজাগানো বক্তৃতায় (The Varieties of Religious experience) বলেছেন 'অনুভূতি হল ধর্মের গভীরতম উৎস'। দার্শনিক এবং ধর্মতাত্ত্বিক সূত্রগুলি এসেছে তার পরে। অনেকটা একভাষা থেকে অন্যভাষায় অনুবাদ করার মত। (পৃঃ 431) এই লেখকদের কোনরকম সমালোচনা না করে আমরা ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় অনুভূতির প্রাধন্যকে স্বীকার করে নিতে পারি।

কিন্তু কি ধরনের অনুভূতিকে ধর্মীয় অনুভূতি বলা হবে? এই প্রশ্নের জবাব অনেকে অনেকভাবে দিয়েছেন। লুক্রেটিয়াস (Lucretius) বলেছেন—'ভয়'। শ্লায়ার-মেকারের (Scheleiermacher) ভাষায় 'ঈশ্বরের প্রতি চরম নির্ভরতার অনুভূতিই হল ধর্মীয় অনুভূতি'। হফ্‌ডিং (Hoffding) বলেছেন মূল্যবোধের উপর আস্থার অনুভূতিকে ধর্মীয় অনুভূতি বলা যায়।* আমরা আগেই সিদ্ধান্ত করেছি যে আদিম ধর্মে অজ্ঞাত শক্তিশালী আত্মার উপস্থিতির প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ভয়ের অনুভূতি প্রবল ছিল। কিন্তু উন্নত ধর্মীয় আবেগ যথেষ্ট জটিল। ক্ষমতা প্রাপ্তির অনুভূতি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি, আশা, শান্তি, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, নির্ভরতা, ভয়, বিস্ময়, ভালবাসা, আনন্দ,

* See J. Oman's translation, Scheleiermacher on Religion : speeches to its cultured Despisers. (1893). Hoffding's Religions philosophie (1901), P. 96 E. Tr. (1906) Pp. 106 f. et passim.

উল্লাস, উচ্ছ্বাস প্রভৃতি অনুভূতিগুলি উন্নত ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ; অধিকতর আদিম ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রকাশ হত বীভৎস উল্লাস বা ভয়ংকর উত্তেজনার মধ্য দিয়ে। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, হাত পা ছুড়ে মৃগীরোগীর মত মূর্চ্ছা যেতেও দেখা যেত। যেমন আমেরিকার ভারতীয়দের এবং আফ্রিকার নিগ্রোদের ধর্মীয় নৃত্য অথবা অস্ট্রেলীয়দের দীক্ষাদান উৎসব। প্রাচীন ডাইনোসাস উপাসনার সময় মাতাল পূজকের রাত্রিকালীন বন্য উন্মত্ততা অথবা প্রাচীন ও আধুনিক কালের 'ভৈরবী চক্র' প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে লাম্পট্য প্রভৃতি এই শ্রেণীর উপাসনার অন্যতম নিদর্শন। উন্নততর উপাসনা-পদ্ধতিগুলি অধিকতর স্বাভাবিক—আবেগ যথেষ্ট সংযত এবং বৌদ্ধিক ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু ধর্মীয় ধারণা যতই উন্নত ও সংস্কৃত হোক না কেন, ধর্মে অনুভূতির ভূমিকা থাকবেই। অনুভূতি ছাড়া উপাসনা হয় না। যদি হয় তাহ'লে তা হবে অস্বাভাবিক, যান্ত্রিক ও ভাবলেশহীন। প্রচলিত প্রথার নিতান্ত একটা নিয়ম রক্ষার ব্যাপার। তাছাড়া অতীন্দ্রিয়বাদ স্বীকার করলে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অনুভূতির প্রাধান্যকে নতুন করে স্বীকার করতে হয়। অতীন্দ্রিয়বাদীরা মনে করেন হৃদয়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাহায্যে পরমেশ্বরের সঙ্গে সরাসরি সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব। এঁরা একদিকে যেমন শুষ্ক বুদ্ধিবাদের বিরোধিতা করেন তেমনি বিরোধিতা করেন পূজাপদ্ধতির, উপাসনার এবং নিয়মনিষ্ঠার বাড়াবাড়ির। অতীন্দ্রিয়বাদ অনুসারে পরমার্থ দুর্জ্ঞেয় এবং তার কোন নাম বা রূপ নেই। অনুভূতির সাহায্যেই কেবল তার ধারণা লাভ করা যায়। কিন্তু যতক্ষণ না সেই ধারণা কোন চিন্তা বা ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় ততক্ষণ সেই অনুভূতি সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। যেমন উইলিয়ম জেমস (W. James) স্বীকার করেছেন, যে অনুভূতি মূক এবং নিতান্ত ব্যক্তিগত ; তার কোন প্রকাশ সম্ভব নয়। এর ফলাফল গূঢ় এবং বিভ্রান্তিকর। বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কখনো কখনো পরস্পর-বিরোধী এবং অস্বাভাবিক অনুভূতিকে ইচ্ছে করে এড়িয়ে যাওয়া হয়। ধর্মকে ক্ষতিকর গোপনীয়তা থেকে উদ্ধার করে সর্বজনীন রূপ দান করা বুদ্ধির কাজ। এর সঙ্গে আরও একটি কথা যোগ করতে হয়। ধর্মীয় অনুভূতিকে ইচ্ছা ও বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। আবার কেবল চিন্তা করলে চলবে না, কাজের মধ্যে তার প্রকাশও চাই।

2. তাহ'লে ধর্ম হল এক ধরনের ক্রিয়া বা আচরণ। তীব্র আবেগের

বহিঃপ্রকাশ হবেই। যখন এরকম কোন বহিঃপ্রকাশ দেখা যাবে না, বুঝতে হবে তখন কোন প্রকার অস্বাভাবিক অবদমন ঘটেছে। যে আবেগের বহিঃপ্রকাশ নেই জীববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেই আবেগকে পূর্ণাঙ্গ আবেগ বলা যায় না। এবং সেই আবেগ থেকে কোন ক্রিয়ারও উৎপত্তি হতে পারে না। মন একটি জৈব-যন্ত্র; সে স্বভাবতঃ সক্রিয়। বস্তুতপক্ষে আবেগই হল এক ধরনের ক্রিয়া। 'একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়াকেই আবেগ বলা হয়। প্রত্যেক আচরণের একটা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্যহীন আচরণ যে অনুভূতিকে প্রকাশ করে সেই অনুভূতির কোন অর্থ থাকে না। তা অন্ধ। যদি ইচ্ছার মত অনুভূতিরও একটি বাস্তব লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে তবেই সেই অনুভূতি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবেগের যে বহিঃপ্রকাশ হয় সেই বহিঃপ্রকাশই আবার আবেগকে তীব্রতর করতে সাহায্য করে। এ সব কিছুই ধর্মীয় জীবনে সত্য। ধর্ম অন্তরের আবেগ। সেই আবেগের বহিঃপ্রকাশ স্বাভাবিক। কেবলমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক আবেগ মনোবিজ্ঞানের মতে অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ হতে গেলে আবেগকে উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত এক রকমের আচরণ বা ক্রিয়া হতে হবে। প্রকৃতির এক রহস্যময় ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ভয় বা সম্ভ্রমকে ধর্ম বলা যেত না যদি না সেই অনুভূতির ফলে সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে সেই ক্ষমতাগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বা বন্ধুত্বলাভের চেষ্টা প্রকাশ পেত। ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে জীবন-সংগ্রামের বাস্তব প্রয়োজন থেকে—আমরা এই অভিমত আগেই প্রকাশ করেছি। সেই প্রয়োজন যত বৃদ্ধি পাচ্ছে ধর্মও তত বিস্তৃত ও উন্নত হচ্ছে। আবেগের যখন বহিঃপ্রকাশ হয় তখন তা আচরণে রূপান্তরিত হয়। ধর্মীয় আবেগের প্রকাশ থেকে ধর্মীয় আচার-আচরণ ও বিভিন্ন রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে। তাহ'লে দেখা গেল অদৃশ্য ক্ষমতাগুলির কাছ থেকে জীবন-সংগ্রামের জন্য এবং সুযোগ-সুবিধে লাভের জন্য আদিম মানুষের যে আবেগ প্রকাশ পেত তার থেকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। শিকার অথবা যুদ্ধে সফল হওয়ার তীব্র আবেগের ফলে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্য এক ধরনের আদিম ধর্মীয় অনুষ্ঠান। আদিম মানুষের কাছে এগুলিই ধর্মীয় অনুষ্ঠানরূপে গণ্য হত। প্রথমের দিকে এই অনুষ্ঠানগুলি যথেচ্ছ থাকলেও পরে রীতিনীতির নিয়ন্ত্রণের ফলে এই স্বতঃস্ফূর্ত আচরণগুলি শৃংখলাবদ্ধ হয়ে পড়ল। কারণ এই ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান কোন ব্যক্তি বিশেষের অনুষ্ঠান ছিল না। একটি সমগ্র গোষ্ঠী এতে অংশ গ্রহণ করত। এইভাবে এই

অনুষ্ঠানগুলি সুনির্দিষ্ট হয়ে সর্বজনীন হয়ে উঠল। পরবর্তীকালে অনুষ্ঠানগুলিকে পবিত্র বলে গণ্য করা হল এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করল। ধর্মের একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা আছে। একই ধর্মীয় অনুষ্ঠান অপরিবর্তিত থেকে অথবা অল্প কিছুটা পরবর্তিত হয়ে বংশপরম্পরায় পুণরাবর্তিত হতে লাগল। এই আবর্তনের ফলে মূল আবেগ পুণর্জাগরিত হল এবং ফলে অধিকতর তীব্রতা লাভ করল। জনগণের উপাসনা পদ্ধতি ছিল দু'রকমের—উৎসর্গ ও প্রার্থনা। সাধারণত এই দু'টিকে কেন্দ্র করে দেবস্থান, পুরোহিত সম্প্রদায় এবং ধর্মের সহস্র আচারণবিধি গড়ে উঠল।

যদিও আদিম মানুষের আচরণের বৈশিষ্ট্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তবুও কেবলমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষের আচরণকে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। ধর্মীয় আচরণ ছাড়াও মানুষের আবেগের প্রকাশ বিভিন্ন ভাবে হত। যেমন ক্ষমতাশালী কোন লোককে সন্তুষ্ট করতে গেলে বিশেষ এক ধরনের আচরণ করতে হয়। কিন্তু তার সঙ্গে বিধিবদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সম্পর্ক নেই। অথবা সেই ধরনের আচরণকে ধর্মীয় আচরণও বলা যায় না। ধর্মের ক্রমবিকাশের কালে হয়ত বা সূচনা থেকেই নৈতিকতা ধর্মীয় আচরণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ধর্মের অভিভাবকত্বে থেকে থেকে ধীরে ধীরে নৈতিকতা তার নিজের স্থানটি পাকা করে নিল। ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য কেবলমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। তার পরিধি বিস্তৃত হল। সমগ্র দিনের আচরণ কর্তব্য হয়ে উঠল। বন্ধুর প্রতি অথবা প্রতিবেশীর প্রতি আচরণকেও ধর্মানুগ হতে হল। ধর্মীয় আচরণের দু'টি দিক ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠল। (১) ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিক, (২) তার নৈতিকতার দিক। প্রথম দিকটি গুরুত্ব দিল পবিত্রতা-অপবিত্রতার উপর। দ্বিতীয়টির লক্ষ্য হল সমগ্র জীবনটিকে পবিত্র করে তোলা। প্রথমটি পুরোহিত প্রথা বা যাজকতন্ত্র এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানকেই প্রাধান্য দিল। বিপরীত পক্ষে দ্বিতীয়টির লক্ষ্য হল সমগ্র জীবনকে একটি পবিত্র উৎসব করে তোলা। অতএব দু'টি চিন্তাধারার পার্থক্যটি বেশ স্পষ্ট। সেইজন্য পুরোহিত-দের সঙ্গে মহাপুরুষদের প্রায়ই বিরোধ দেখা দিত। পুরোহিতদের লক্ষ্য নিখুঁত-ভাবে ধর্মীয় আচরণগুলির পুনরাবৃত্তি করা। আর মহাপুরুষদের লক্ষ্য হল অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব না দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করা। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ওল্ড টেষ্টামেণ্টে আনুষ্ঠানিক ধর্ম অপেক্ষা নৈতিকতার উপর অধিকতর

গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। (Isa 1,10-17, Mic vi 6-8 ef Js 27) এখন প্রশ্ন উঠতে পারে উন্নততর ধর্মগুলিতে কি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীতা আছে? ধর্মের ক্ষেত্রে মিলিত উপাসানা কি অত্যাবশ্যক? পার্থিব ও অপার্থিবের মধ্যে কিংবা পবিত্র ও অপবিত্রের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকবে না এমন কোন ব্যাপকতর ধারণা কি ধর্ম দিতে পারে? এর উত্তরে আমরা বলতে পারি, ধর্মের নৈতিকতার দিকটি ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত হতে পারে। কিন্তু মিলিত উপাসনার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবেই। ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে বন্ধ করা ধর্মের সমস্যা নয়। অনুষ্ঠানকে প্রগতিশীল মানব আত্মার বিকাশের উপযোগী করে তোলা এবং আরও ঘনিষ্ঠভাবে তার সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক স্থাপন করাই হল ধর্মের সমস্যা। এই সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিপদের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এবং সে সম্পর্কে সর্বদা সতর্কও থাকতে হবে। প্রাচীনপন্থী এবং সুবিধাবাদীদের হাতে পড়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বহিরঙ্গের উপর যখন অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় তখন ধর্ম নিজেই বিপন্ন হয়ে পড়ে। ধর্ম তখন একটা যান্ত্রিক ও রুটিন মাফিক কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তখন তার একমাত্র লক্ষ্য হয় প্রচলিত ধারা ও প্রথা অনুসরণ করা। বৌদ্ধিক জীবন থেকে অথবা পরমাত্মাকে জানার নৈতিক ও ঐকান্তিক আগ্রহ থেকে ধর্ম তখন দূরে সরে যায়। ধর্মে তখন না থাকে বৌদ্ধিক ক্রিয়া আর না থাকে পরমাত্মাকে জানার ঐকান্তিক বাসনা। ধর্ম তখন ব্যক্তিগত ধর্মপ্রবণতাকে উপেক্ষা করে। অর্থাৎ ধর্মের অন্তরঙ্গ দিকটি তখন অবহেলিত হয়। এইসব প্রকৃত বিপদের সম্ভাবনা থাকলেও ধর্মভাবের সুশৃংখল ও সম্মিলিত প্রকাশের জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক।

3. ধর্ম ও বিশ্বাস—ইচ্ছা ও অনুভূতির মত ধর্মের একটি বৌদ্ধিক দিকও আছে। তার মানে এই নয় যে জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলির বৌদ্ধিক সমাধানের চেষ্টা থেকে ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। আমরা দেখেছি যে তুলনামূলক হিসেবে বিবর্তনের অনেক পরবর্তী যুগে জ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে। তখন জ্ঞান কেবলমাত্র জানার ইচ্ছা ছিল না, ছিল বাঁচার ইচ্ছার একটি অবলম্বন। বুদ্ধিবাদী মনো-বিজ্ঞানীরা অবশ্য মনে করেন ধর্মীয় ধারণাগুলি যুক্তি-নির্ভর। এই ধারণাগুলির নিজস্ব একটি বৌদ্ধিক সত্তা আছে। এই বুদ্ধিবাদের অযথার্ততার কথা কো (Coe) সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ঐ ধারণাগুলি বুদ্ধি ছাড়া অন্য কিছুর

উপর নির্ভর করে। তীব্র আবেগ এবং অনুভূতি ধর্মকে হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক করে তোলে। ধর্ম কোন বৌদ্ধিক অবকাশের সৃষ্টি নয়। এর সৃষ্টি হয়েছে অস্তিত্ব রক্ষার সুতীব্র সংগ্রাম থেকে। এই সংগ্রাম পরিশেষে মুক্তি ও আনন্দ লাভের নিরন্তর প্রচেষ্টায় রূপান্তরিত হয়।* ম্যারেট (Marett) খুব সুন্দর করে বলেছেন—অসভ্য আদিম মানুষের ধর্মে যত না ছিল চিন্তা তার থেকে অনেক বেশি ছিল নাচ। তাই বলে বুদ্ধির ভূমিকাটিকে একেবারে নগন্য করে দেখাব প্রবণতাকেও আমরা সমর্থন করি না। ধর্মের উৎপত্তিতে বুদ্ধির ভূমিকা হয়ত কিছু ছিল না, কিন্তু বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসা ব্যতীত ধর্মের ক্রমবিকাশ কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। সেদিক থেকে বিচার করলে ধর্মের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বুদ্ধি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিচারবুদ্ধি ছাড়া অন্তরের অনুভূতিই হোক বা বাহ্য আচরণই হোক উভয়েই গোঁড়ামির পর্যায়ভুক্ত হবে। জ্ঞানের আলোকে নিজেকে পরখ করে নেবার জন্য অন্তরে অনুভূতিকে ক্রমাগত পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হতে হবে।

এমন কি ধর্মের একেবারে আদিম অবস্থাতেও বৌদ্ধিক উপাদান বা বিশ্বাসের অস্তিত্ব ছিল। সেই অবস্থায় সহজাত প্রবৃত্তির প্রভাবে বুদ্ধির স্বাধীনতা বড় একটা ছিল না। কিন্তু কোন একটি বিচিত্র বা অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক বিষয়কে শক্তির ভাণ্ডার (মানা) বলে কল্পনা করা বা অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব চিন্তা করার মধ্যে বিচারবুদ্ধির অস্তিত্ব যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা ও সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যকার সম্পর্কটি ক্ষীণ হয়ে এল। এবং এক সময় সৃজনশীল কল্পনা তার মুক্ত পাখা মেলে দেবার সুযোগ পেয়ে গেল। পুরাণে বা দেবদেবীর উপাখ্যানে উন্নত ধরনের সৃজনশীল চিন্তার উদাহরণ পাওয়া গেল। পুরাণে ধর্মীয় আচরণের উৎপত্তির কাহিনী রয়েছে। কিন্তু এই কাহিনীগুলির অনেক আগে থেকেই ধর্মীয় আচরণের প্রচলন হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে অনেক শিশুসুলভ কল্পনার নিদর্শন দেখা যায়। তাহ'লেও এইসব কাহিনীগুলিতে ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও দর্শন থেকে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির পার্থক্য হল যে এইসব উপাখ্যানে কল্পনাকে যথেচ্ছ প্রয়োগ করা হয়েছে এবং কাব্যিক ভাষায় ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। হেগেলের মতে ধর্ম কল্পনার সহায়তায় পরমসত্তা সম্পর্কে অনুমানের প্রাথমিক

* G. A. Coe. The Philosophy of Religion (1916), P. 60

স্তরটিও অতিক্রম করতে পারে নি। সত্তার পরিপূর্ণ রূপটি দার্শনিক চিন্তার সাহায্যেই কেবল অনুধাবন করা সম্ভব। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস ও দর্শনের মধ্যে এই ধরনের কোন ধরাবাঁধা পার্থক্য সব সময় রক্ষা করা সম্ভব নয়। প্রকৃত ঘটনা হল দর্শন অপেক্ষা ধর্ম যথেচ্ছ উপমা ব্যবহার করতে পারে। দর্শনও কিন্তু উপমাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে পারে না। বাদ দিতে গেলে দর্শনে ভাষা ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে হয়। কারণ ভাষা সব সময় উপমার কল্পরসে সিক্ত থাকে। বিপরীত পক্ষে ধর্মে যদিও উপমার বাড়াবাড়ি আছে তাহ'লেও উপমেয় ও উপমানের সঙ্গে একটি সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টাও আছে। উপমানের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন না করে উপমেয়কে যথার্থ বলে স্বীকার করে নেওয়া এক ধরনের ব্যক্তিগত আত্মতুষ্টি হতে পারে, কিন্তু যে বিষয় সম্পর্কে এই আত্মতুষ্টি তার সঙ্গে এই তুষ্টির অনুভূতির একটি সম্পর্ক স্থাপন করতে গেলে বুদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়।

ধর্মের উন্নত অবস্থায় ধর্মতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। ধর্মীয় মূল্যবোধকে বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টার নামই হল ধর্মতত্ত্ব। তার পরবর্তী অধ্যায়ের নাম ধর্মদর্শন। ধর্মদর্শনের কাজ হল ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অর্থ বিশ্লেষণ করা এবং তার বাস্তব ভিত্তির যথার্থতা পরীক্ষা করে দেখা। সার্বিক বাস্তব সত্যে পৌঁছানোর জন্য উন্নত চিন্তার প্রয়োজন। আমরা দেখেছি ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রাথমিক উপাদান হল অনুভূতি। কিন্তু অনুভূতি ব্যক্তিগত। চিন্তার লক্ষ্য নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞান দান করা। যখনই তুমি তোমার অনুভূতিকে অপরের কাছে প্রকাশ করতে চাইবে, এমনকি তার অর্থটি নিজেই বুঝতে চাইবে তখন তোমাকে কিছু সাধারণ ধারণা এবং ভাষা ব্যবহার করতে হবে। চিন্তার কাজ হল ঐ সাধারণ ধারণাগুলি নিতান্ত তোমার ব্যক্তিগত অনুভূতি, না তাদের বাস্তব সত্যতা রয়েছে তাই পর্যালোচনা করে দেখা। ধর্মে যতখানি অনুভূতি রয়েছে ততখানি চিন্তাও রয়েছে। কিন্তু ধার্মিক মন সব সময় ধর্মতত্ত্ব চায়। কারণ ধর্মতত্ত্ব তার স্বীকৃত সত্যের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুর যৌক্তিকতা সম্পর্কে সকল চিন্তা-ভাবনা হয় ঐ স্বীকৃত সত্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে। ফলে যে ধর্মমত এক যুগে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বৌদ্ধিক প্রকাশ হিসেবে গণ্য হয়, সেই মতই পরবর্তী যুগে প্রগতির বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মমত যেন একটি চিরাচরিত পরিশুদ্ধ ধারণা। একেবারে অভ্রান্ত, অপরিবর্তণীয় এবং চূড়ান্ত।

সেইজন্য ধর্মমতগুলি স্থির, পরিবর্তনহীন ও গতিহীন। বিপরীতপক্ষে আধ্যাত্মিক জীবন হল পরিবর্তনশীল এবং পরীক্ষামূলক। নিরন্তর সে অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে চায়। ঠিক বের্গস‌ঁ (Bergson) যেমন বলেছেন, 'পরম সত্তার নীচে তত্ত্বশাস্ত্র একটি গভীর সুড়ঙ্গ খনন করেছে। বৈজ্ঞানিকেরা তার উপর একটি সুদৃঢ় সেতু নির্মাণ করেছেন। কিন্তু কৃত্রিম ঐ দু'টি সৃষ্টিকে স্পর্শ না করে ভাবৎ জিনিস নদীর মত বয়ে চলেছে।'* আমরা তাহ'লে বলতে পারি ধর্মমত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সজীবতাকে একটি অনঢ় সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। এখন প্রগতিশীল ধর্মীয় চিন্তার কাজ দু'রকম—
1. নঞর্থক ক্রিয়া—অর্থাৎ যে ধর্মমতগুলি বিশ্বাসের বৌদ্ধিক ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ হওয়ায় বাতিল হয়ে গেছে অথবা হতে বসেছে, মানুষের ক্রমবিস্তৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সেই বিশ্বাসগুলির অযথার্থতা প্রমাণ করা,
2. সদর্থক ক্রিয়া—অর্থাৎ সমসাময়িক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে হবে, ধর্মীয় সত্যকে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পুণর্গঠন করা। এইভাবে অন্যান্য সব ক্ষেত্রের মত ধর্মের প্রগতির ক্ষেত্রেও বুদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন হয়ে উঠতে পারে। জীবনও ঈশ্বর সম্পর্কে কয়েকটি স্থূল, অজ্ঞ, অপর্যাপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের পরিবর্তে বুদ্ধি মনুষ্য আত্মাকে যথার্থ বিকশিত করে প্রকৃত আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করতে পারে। অবশ্য একথা সত্য যে ধর্মের সকল সৃজনশীল পদ্ধতি রয়েছে ধার্মিকতাকে কেন্দ্র করে, ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার মধ্যে নয়। তর্ক-পদ্ধতি অপেক্ষা অভিজ্ঞতা অনেক বেশি সমৃদ্ধ। তাহ'লেও এখন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছে। আমরা এখন এমন এক যুগে বাস করছি যখন ধর্মের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার একান্ত প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

ধর্মের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ সম্পর্কে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে মনোবৈজ্ঞানিক আলোচনা করলাম, অনেকে মনে করতে পারেন, কেবলমাত্র চেতন মনের উপর নির্ভর করে এটি একটি পুরানো ধারার আলোচনা। অবচেতন মন থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে বলে উইলিয়ম জেম্‌স (William James) প্রভৃতিরা যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, অথবা ফ্রয়েড (Freud), য়ুঙ্ (Jung) প্রভৃতি নব্য মনোবিজ্ঞানিগণ যে বলেছেন, ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে অন্ধকার

* Bergson—An Introduction to Metaphysics E. Tr. 1913.

নির্জ্ঞান মন থেকে, আমরা সে সব প্রসঙ্গের অবতারণা এখানে করি নি। না করার একটিমাত্র কারণ হল বর্তমান আলোচনায় সেগুলি প্রাসঙ্গিক হত না। আমরা যা অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছিলাম তা হ'ল চেতন মনে ধর্ম বলতে আমরা কি বুঝি। যে-কোন পদ্ধতিতেই হোক, আমরা যদি বুঝতে পারি চেতন মন থেকে কি করে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে, তাহ'লে ধর্মের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য জানতে পারবো। আমরা অবশ্য একথা অস্বীকার করছি না যে চেতন মনের উপর বিশাল নির্জ্ঞান মনের অপরিসীম প্রভাব রয়েছে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এবং সর্বোত্তম দিকটির সন্ধান পাওয়া যায় চেতন অবস্থায়। মনের অন্ধকার গভীরে যেখানে কোন মূল্যবোধ নেই, নৈতিক মূল্য যেখানে অর্থহীন, সেখানে ধর্মের উৎপত্তির অন্বেষণ করা বৃথা। ধর্মকে কেবল চেতন মনের সাহায্যেই বোঝা যেতে পারে। এবং ধর্মের কার্যকারিতার জ্ঞানও আমরা চেতন মনেই লাভ করতে পারি। নব্য মনো-বিজ্ঞানিগণ ধর্মবিশ্বাসের বাস্তব অস্তিত্বের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা মনে করেন আমাদের যুক্তিহীন নিজ্ঞান অনুভূতি থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। যখন ধর্মের যথার্থতার প্রসঙ্গ আলোচনা করবো তখন এবিষয়ে আমরা পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করবো।

ধর্মের উৎপত্তি আলোচনা প্রসঙ্গে নৃতত্ত্বে মনোবিজ্ঞানের উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ ধর্মের প্রকৃত উৎসের অনুসন্ধান করতে হবে মানুষের মনে। মানুষের মনে এমন কি আছে যার ফলে মানুষ ধর্মপ্রবণ হয়ে উঠল ?

1

এই প্রশ্নের একটি বহু-পরিচিত জবাব হল ; মানুষের ধর্মপ্রবণতা একটি সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ তথা মনুষ্যেতর সকল প্রাণী আত্মরক্ষার জন্য কতকগুলি সহজ প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এটি এখন মনোবিজ্ঞানের স্বীকৃত সত্য। কিন্তু তাই বলে মানুষের সকল আচরণকে সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে কি ? আমরা বাজার করি, অতএব আমাদের বাজার করার একটি সহজাত প্রবৃত্তি আছে ; আমরা পরোপকার করি অতএব আমাদের পরোপকারের সহজাত প্রবৃত্তি আছে অথবা আমরা চক্রান্ত করি, সুতরাং আমাদের চক্রান্ত করার সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে—এইভাবে সহজাত প্রবৃত্তির একটি সুদীর্ঘ তালিকা প্রণয়ন করে আমাদের সকল আচরণের অতি সহজে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে সহজাত কথাটিকে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থে গ্রহণ করা হয়। সহজাত প্রবৃত্তি হল কোন সুনির্দিষ্ট ধারণার প্রতি কোন নির্দিষ্ট সরল স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া মাত্র। যার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। কিন্তু ধর্মীয় ধারণা এমন কোন অযৌগ ধারণা নয় যে তার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়! বরং ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগের সংমিশ্রণ দেখা যায়। সুতরাং সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা ধর্মের উৎপত্তির অনুসন্ধান সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি মতবাদের উল্লেখ করা যায়। অনেকের মতে মানুষের মনে বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। এক একটি বিভাগ এক এক রকম কাজ করে। ধর্মের জন্যও মানুষের মনে স্বতন্ত্র একটি বিভাগ রয়েছে। সেই বিশেষ মনোবৃত্তি থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। সমালোচনা প্রসঙ্গে একটিমাত্র কথা বলা যায় যে বিভাগীয় মনোবিজ্ঞানের যুগ চলে গেছে। এই মতের অসারতা এখন সর্বজনস্বীকৃত।

ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে আর একটি সুপ্রাচীন মতবাদ হল—ভয় থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। অনেক প্রখ্যাত প্রাচীন এবং আধুনিক মনীষী এই মতবাদের

সমর্থক। আদিম ধর্মে ভয়ের যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃতির রহস্যময় শক্তি সম্পর্কে আদিম মানুষের মনে একটা সম্ভ্রম বা শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয় সর্বদা থাকত। তাই তারা যাদের অশুভ শক্তি বলে মনে করত, তাদের সন্তুষ্ট করত যাতে তারা কোন অনিষ্ট করতে না পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা প্রকৃতিতে শুভ শক্তির অস্তিত্বেও বিশ্বাস করত। কোন কিছু পাওয়ার জন্য তাদের কাছে উপাসনা করত। ধর্ম যদি কেবল ভয় থেকে উৎপন্ন হত তাহ'লে বীভৎস ও ভয়ংকর বস্তুগুলিই কেবল উপাস্য হয়ে উঠত। কিন্তু তা ত হয় নি। যাকে মানুষ ভয় করে, তার থেকে দূরে সরে থাকতে চায়। ধর্মে কিন্তু দেখা যায় উপাসক উপাস্যের সংস্পর্শে আসার জন্যে ব্যাকুল। সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা প্রভৃতিকে কেবলমাত্র ভয় বলা যায় না। এগুলি এক একটি মিশ্র আবেগ। ধর্মের মূলে রয়েছে ভালবাসা। বর্তমান যুগের প্রায় সকল মনীষী এবং সকল ধর্মতত্ত্ব এই সত্য স্বীকার করে নিয়েছে। ঈশ্বরের বিভীষিকা থেকে নয়, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার উপলব্ধি থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে।

II

ধর্ম তাহ'লে কোন একটিমাত্র মানস উপাদানে গঠিত নয় কিংবা একাধিক উপাদানের যোগফল মাত্রও নয়। কারণ সকল মানুষের মানস উপাদান ত এক। কিন্তু তারা কি সকলে সমান ধর্মপ্রবণ? নিশ্চয় নয়। তাহ'লে এই সমস্যার সমাধান পেতে হলে উদ্দেশ্যের প্রশ্নটিকে আমাদের আলোচনা করে দেখতে হবে। কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ ধার্মিক হল? ধর্মের মধ্য দিয়ে মানুষ কি চায়?

স্থিতিশীল মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী এখানে অচল। অর্থাৎ মানস উপাদানকে পৃথক পৃথক অংশে ভাগ করে এবং সেগুলিকে আবার স্বতন্ত্রভাবে ভাগ করে আমরা কোন সমাধানের সূত্র খুঁজে পাবো না। আমাদের ক্রিয়াশীল মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করতে হবে। ধর্মচেতনার লক্ষ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের আগে পেতে হবে। কিন্তু আলোচনাকে কেবল লক্ষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। উপলক্ষও লক্ষ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আজ যা লক্ষ্য কাল তা উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। অথবা এক সময়ের লক্ষ্য পরবর্তী-কালে উপলক্ষ হয়ে পড়ে।

আমরা স্বীকার করেছি ধর্মের উৎপত্তির ক্ষেত্রে আবেগের একটি ভূমিকা

রয়েছে। কিন্তু আবেগ থেকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উদ্ভব হল কি করে? আদিম মানুষ রহস্যময় শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। জীবন-সংগ্রামে তারা সেই শক্তির সাহায্য কামনা করত। ধর্মের মূলে রয়েছে জৈবিক প্রয়োজন—বাঁচার ইচ্ছা। কিন্তু 'বাঁচার ইচ্ছার' মত একটি নিতান্ত জৈব আবেগকে অনেকে ধর্মীয় আবেগ বলে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করেন। কারণ এই ইচ্ছা থেকে কেবল ধর্মীয় আচরণ কেন, মানুষের সকল রকম ক্রিয়ারই উৎপত্তি হয়েছে বলা যায়। তাছাড়া অন্য প্রাণীদেরও বাঁচার ইচ্ছা আছে। কিন্তু তাদের কি ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষা আছে?

তা হ'লেও আমরা স্বীকার করছি মানুষের সকল আচরণের উৎস 'বাঁচার ইচ্ছা'। ধর্মের মূলও রয়েছে সেখানে। কিন্তু ধর্ম সেখানে বিকশিত হয় নি। সম্ভাবনা হয়ে রয়েছে। বীজে ফুল থাকে না। কিন্তু ফুলের সম্ভাবনা থাকে। তাই উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের সেখানেই যেতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, জীবনের প্রতি মানুষের যে অতৃপ্ত লালসা আছে, ধর্মীয় অভিজ্ঞতাতেই তা সবচেয়ে বেশি চরিতার্থ হয়। ধর্ম মানুষকে একটি পরিপূর্ণ জীবন দান করে। সত্য শিব ও সুন্দরের মধ্যে উন্নততর পরিতৃপ্তির সন্ধান দেয়। সত্য শিব ও সুন্দরের পৃথক পৃথক আলোচনায় (যেমন—তর্কবিদ্যা, নীতিবিদ্যা ও নন্দনতত্ত্বে করা হয়ে থাকে) সেই পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় না। তার জন্য চাই এক বিশাল সুসংবদ্ধ জীবন। সেই জীবনই আদর্শ জীবন। ধর্ম মানুষকে জীবন দান করে। সূচনায় অবশ্য এই জীবনের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। স্পষ্টতর রূপ পেতে তাকে বিবর্তনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করতে হয়েছে।

তৃতীয়তঃ, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল রহস্যময় শক্তিগুলিকে সে ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। জীবন-সংগ্রামে সেই ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনা করেছে। ধর্ম হল অপার্থিব শক্তির সহায়তায় জীবনকে সমৃদ্ধ করার উপায়। লিউবা বলেছেন, ধর্মীয় অভাববোধ বলে কোন অভাব নেই। অভাব পূরণের পদ্ধতির মধ্যে ধর্মের স্বতন্ত্রতা নিহিত আছে। ঈশ্বর লক্ষ্য নন। উপলক্ষ মাত্র। আগেই বলেছি, লক্ষ্য এবং উপলক্ষের মধ্যে বাঁধাধরা কোন পার্থক্য আমরা স্বীকার করি না। সত্য শিব ও সুন্দরের একদিন প্রয়োজন ছিল জীবন-ধারণের উপায় হিসেবে, ক্রমে তারাই লক্ষ্য হয়ে উঠল। বিবর্তনের এটাই রহস্য। ধর্মজীবনে একই ঘটনা ঘটেছে। একদিন পার্থিব জীবনের সুখ-সুবিধে লাভের

জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন ছিল। ঈশ্বর ছিলেন উপলক্ষ মাত্র। ক্রমে তিনিই লক্ষ্য হয়ে উঠেছেন।

এই জটিল ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে কোন একটি মাত্র সূত্রে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের জীবনকে যেমন ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায়, তেমনি সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করা যেতে পারে।

পরিপূর্ণ জীবনোপলব্ধি কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতে পারে না। আদিম যুগে আত্মরক্ষার জন্য কোন সংগ্রাম ছিল না, ছিল গোষ্ঠীরক্ষার সংগ্রাম। আত্মত্যাগের প্রবণতা আত্মরক্ষার প্রবণতার মতই প্রাচীন। আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধিই হল জীবনের ধর্ম। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে ব্যক্তি সংকীর্ণ স্বার্থপরতার ঊর্দ্ধে উঠতে পারে। সামাজিক পরিবেশে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার চরম প্রকাশ সম্ভব। দুর্খাঁ্যা প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানিগণ ঠিকই বলেছেন,—ধর্ম মূলত সামাজিক বিষয়। কিন্তু তাই বলে ব্যক্তির আনুগত্য আদায় করার জন্য সমাজ ধর্মকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করে তাঁদের এই কথাটি আমরা সমর্থন করি না। সমাজ প্রাচীনপন্থী, গোঁড়া। স্বীকৃত সত্যগুলিকে সে আঁকড়ে থাকতে চায়। কিন্তু সেই সমাজের কোলে মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেন। নতুন সত্য দান করেন। সমাজ আবার সেই সত্যকে স্বীকার করে নেয়। ক্রমে তা সামাজিক প্রথা হয়ে ওঠে। সে যাই হোক, ব্যক্তিগতই হোক, আর সামাজিকই হোক, উভয় প্রকার ধর্মের পেছনে থাকে জীবনোপলব্ধির তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

III

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হল যে সব মানস উপাদান ধর্মের উৎপত্তি ও প্রগতিকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের বিশ্লেষণ করা। চিন্তা ইচ্ছা ও অনুভূতি এই তিন ভাগে মানুষের মনকে ভাগ করা হয়। কিন্তু ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এই তিনটি উপাদানের মধ্যে কোন্‌টির ভূমিকা প্রধান?

সম্প্রতিকালের অনেকে ইচ্ছার প্রাধান্য স্বীকার করেন। লিউবা বলেন, ইচ্ছাই প্রধান। চিন্তা ব্যতীত ইচ্ছা সম্ভব। কিন্তু ইচ্ছা ব্যতীত চিন্তা সম্ভব নয়। চিন্তার নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই। আমরা ইচ্ছা করি বলেই চিন্তা করি।

চিন্তার প্রতি এই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ চরম বুদ্ধিবাদের প্রতিক্রিয়া। বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন চিন্তা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে। কিন্তু সংকল্প ছাড়া

মানুষ কোন কিছু করে না। আদিম মানুষের বিবর্তনের ক্ষেত্রে চিন্তা অপেক্ষা ইচ্ছার ভূমিকা যে প্রবল ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মানুষের ইতিহাসে যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তার আবির্ভাব ঘটেছে অনেক পরে।

অনেকে আবার অনুভূতির ভূমিকাকে ইচ্ছার থেকে প্রবলতর বলে মনে করেন। প্রাথমিক অবস্থায় ইচ্ছা ও অনুভূতির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কিন্তু পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন নয়। ইচ্ছা সক্রিয় কিন্তু অনুভূতি নিষ্ক্রিয়। শ্লায়ারমেকার, লোটজা প্রভৃতি দার্শনিকগণ অনুভূতিকে ধর্মের প্রাথমিক উপাদান হিসেবে স্বীকার করেছেন।

1. অনুভূতি থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে এই দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের ক্রমবিকাশের প্রশ্নটি আলোচনা করা যাক। অনুভূতির মধ্য দিয়ে ধর্মের একান্ত ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গ দিকটি প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরের প্রতি মানুষের মানোভাব যদি আবেগে পরিপ্লুত না হত তাহ'লে মানুষ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারত না।

কিন্তু কি ধরনের অনুভূতিকে ধর্মীয় অনুভূতি বলা যাবে? কেউ বলেছেন, ভয়; কেউ বলেছেন ঈশ্বরের প্রতি চরম নির্ভরতার অনুভূতি। আবার কেউ বলেছেন মূল্যবোধের উপর আস্থার অনুভূতি। আদিম ধর্মে শক্তিশালী রহস্যময় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ভয়ের অনুভূতি প্রবল ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু উন্নত ধর্মের আবেগ যথেষ্ট জটিল। যতক্ষণ না অনুভূতি কোন চিন্তা বা ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় ততক্ষণ অনুভূতি নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হ'য়ে থাকে। অনুভূতিলব্ধ অভিজ্ঞতাকে সার্বিক রূপ দান করতে হলে বুদ্ধির প্রয়োজন। অতএব ধর্মীয় অনুভূতিকে অবশ্যই ইচ্ছা ও বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে।

2. আবেগের বহিঃপ্রকাশ হবেই। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি ধর্মীয় আবেগের বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ এক ধরনের ক্রিয়া। কিন্তু এই ক্রিয়া উদ্দেশ্যহীন নয়। রহস্যময় শক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি হয়ে থাকে। প্রথম দিকে আবেগের এই প্রকাশ যথেচ্ছ ও স্বতঃস্ফূর্ত হলেও পরে সামাজিক রীতিনীতির প্রভাবে তাতে শৃংখলা দেখা দেয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠান কোন ব্যক্তি-বিশেষের অনুষ্ঠান ছিল না। সমগ্র গোষ্ঠী এতে অংশগ্রহণ করত। বংশপরম্পরায় একই আচরণ অনুষ্ঠিত হতে হতে তা ব্যক্তির কাছে সংস্কার হয়ে উঠল। এইভাবে ধর্মের সহস্র আচরণবিধি গড়ে উঠল।

বিবর্তনের ফলে ধর্মীয় আচরণের দু'টি দিক স্পষ্ট হয়ে উঠল। (1) ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিক, (2) তার নৈতিকতার দিক। প্রথমটিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটির উপর লক্ষ্য রাখা হত। কিন্তু দ্বিতীয়টির লক্ষ্য ছিল জীবনকে সুন্দর ও পবিত্র করে তোলা। নৈতিকতা প্রথমে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও পরে ক্রমশঃ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হয়ে উঠল। একসময় সকল উন্নত ধর্ম নৈতিকতার এই স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে নিল।

এখন প্রশ্ন হতে পারে ধর্মের উন্নত অবস্থায় ধর্মীয় অনুঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? উত্তরে বলবো অবশ্যই আছে। সম্মিলিত অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ধর্মে সব সময় থাকবে। পুরোহিতেরা যখন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বহিরঙ্গের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন তখন কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। মানুষ তখন বিভ্রান্ত হয়। লক্ষ্যকে ছেড়ে উপলক্ষ নিয়ে মাতামাতি করে।

3. ম্যারেট বলেছেন—ধর্মে নাচ যত আছে চিন্তা তত নেই। উক্তিটি ধর্মের প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা প্রযোজ্য হতে পারে। কারণ অনেক পরবর্তী যুগে ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ হয়েছে। তাহ'লেও ধর্মের বৌদ্ধিক দিকটি আমরা অস্বীকার করতে পারি না। উৎপত্তির জন্য না হলেও ক্রম-বিকাশের জন্য বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসার প্রয়োজন।

এমন কি একেবারে আদিম স্তরে ধর্মেরও একটি বৌদ্ধিক দিক ছিল। অবশ্য তা ছিল অস্পষ্ট। অপরিণত বুদ্ধির উদাহরণ পাওয়া যায় পৌরাণিক উপাখ্যানে। অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থায় ধর্মীয় মূল্যবোধকে বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। এই চেষ্টার ফলে উদ্ভব হয়েছে ধর্মতত্ত্বের। তারপর দেখা দিয়েছে ধর্মদর্শন। ধর্মদর্শনের কাজ হল ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অর্থ বিশ্লেষণ করা, তার বাস্তবতা পরীক্ষা করা, ধর্মের ব্যক্তিগত অনুভূতিকে সার্বিক রূপ দেওয়া এবং কোন ধর্মমতকে অভ্রান্ত বা চিরকালীন মনে না করে বিচার-বিশ্লেষণ করা। ফলে দেখা গেল এক যুগের স্বীকৃত সত্য পরবর্তী যুগে প্রগতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বুদ্ধি দিয়েই কেবল ধর্মের গতিশীল দিকটি ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ধর্মীয় চিন্তার দু'টি প্রধান কাজ—(1) যে ধর্মবিশ্বাসে বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ সম্ভব নয় তাকে বর্জন করা, (2) সমসাময়িক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধর্মবিশ্বাসের পুনর্গঠন করা।

ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে নব্য মনোবিজ্ঞানিদের মতবাদ এখানে উল্লেখ করা হয় নি। তাঁরা মনে করেন মানুষের নির্জ্ঞান মন থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। ঐ সব মনোবিজ্ঞানিগণ ধর্মের বাস্তব অস্তিত্বের উপর সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাই ধর্মের যথার্থতার আলোচনা প্রসঙ্গে এই মনোবিজ্ঞানীদের মতবাদ আমরা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করবো।

——

ধর্মের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে ইতিহাসের যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে ধর্মের দার্শনিক আলোচনা করা যায় না। আমাদের নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে অথবা যে সভ্য সমাজে আমরা বসবাস করি সেই সভ্য সমাজের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করলেও এই আলোচনা সম্ভব নয়। মানুষের সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মের যে ক্রমবিকাশ হয়েছে তার প্রত্যেকটি পর্যায়ের সব কিছু আমাদের জানতে হবে। মানুষের সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে তার সহস্ররকম ব্যর্থতা বা সাফল্যের জন্য ধর্ম কি করেছে তা না জানলে, ধর্ম কি, তা আমরা জানতে পারবো না। আমরা এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মের ঐতিহাসিক বিবর্তনের একটি ক্ষুদ্র বিবরণ দেবার চেষ্টা করবো। আধুনিক গবেষণার ফলে এ বিষয়ে প্রচুর তথ্য পাওয়া গেছে। তাই আলোচনা করতে একটু বিব্রত বোধ করছি। কারণ এই অসংখ্য অভিমতকে একটি সুসংহত রূপ দেওয়া খুব সহজ কাজ নয়। সংক্ষিপ্তীকরণের বা সামান্যীকরণের যে ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা থাকলে এ কাজ করা সম্ভব হত, আশংকা করি, আমাদের সে ক্ষমতা নেই। আমরা পাঠকদের এই আলোচনার বিরাট পরিধি সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা দিতে পারি মাত্র। আর সেই সঙ্গে ধর্মের সংস্কার ও সমালোচনা অথবা দার্শনিক ব্যাখ্যার জন্য ঐতিহাসিক জ্ঞানের কতটা প্রয়োজন, সে বিষয় সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করতে পারি।

ঘটনাগুলিকে সাজিয়ে নেবার জন্য প্রথমে কোন একটা কার্যকরী শ্রেণী-বিন্যাস প্রয়োজন। অনেকে অনেকভাবে এই শ্রেণী-বিন্যাস করেছেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা এত বেশি যে তাদের আলোচনা করা দূরে থাক, আমরা এখানে তাদের উল্লেখও করতে জায়গা পাবো না। টাইলে (Tiele) তাঁর বিখ্যাত গীফোর্ড (Gifford) বক্তৃতায় ধর্মকে দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন—(1) প্রাকৃত ধর্ম, (2) নৈতিক ধর্ম। ডাঃ গ্যালওয়ে (Galloway) ধর্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—(1) উপজাতীয় বা গোষ্ঠী ধর্ম, (2) জাতীয় ধর্ম, (3) বিশ্বজনীন ধর্ম। মোটামুটিভাবে আমরা গ্যালওয়ের এই শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করবো। তার কারণ এই শ্রেণীবিভাগ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে সামাজিক অবস্থার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মও বিবর্তিত হয়েছে। ধর্মীয় উন্নতির স্তরগুলি সামগ্রিকভাবে সমাজ ও সংস্কৃতির

বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলে।* সবচেয়ে সহজ ধরনের সমাজব্যবস্থা বলতে আমরা 'উপজাতি'দের সমাজব্যবস্থার কথাই জানি। অতএব আমরা উপজাতীয় ধর্ম দিয়ে আলোচনা আরম্ভ করবো।

1. উপজাতীয় ধর্ম

উপজাতীয় সমাজব্যবস্থা সমাজের আদিম রূপ। বর্তমান যুগের সমস্ত অসভ্যদের মধ্যে এই সমাজব্যবস্থা প্রচলিত। আকৃতিতে এই সমাজ অত্যন্ত ছোট—একটি পরিবারের বর্ধিত রূপ বলা যেতে পারে। রক্তের সম্পর্কে এই সামাজিক বন্ধন প্রতিষ্ঠিত ছিল। গোষ্ঠীর বাইরের অন্যান্য সকলকে কোন-না-কোন কারণে শত্রু বলে মনে করা হত। কিন্তু গোষ্ঠী-সমাজ আকারে ছোট হলেও সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে অত্যন্ত সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। ব্যক্তি হিসেবে কাউকে গণ্য করা হত না। ব্যক্তি তার নিজস্ব মূল্য তখনও আবিষ্কার করতে পারে নি। গোষ্ঠীই ছিল সবকিছু। সমগ্র গোষ্ঠীকে একজন মাত্র ব্যক্তি হিসেবে ভাবা হত এবং সেইমত কাজ চলত। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের (Word worth) 'মেঘের' মত 'যদি তাদের কোথাও যেতে হত তারা একসঙ্গে যেত'। তখন কোন ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রশ্নই ছিল না। কারণ ব্যক্তিস্বতন্ত্রতার ধারণা জন্মেছে অনেক পরে, সমাজের ক্রমবিকাশের অনেক উন্নত স্তরে এসে। সামাজিক রীতিনীতি পালনের মধ্যেই ব্যক্তিচিন্তা তখন সম্পূর্ণ নিমজ্জিত ছিল। তখনো মানুষ নিজের বিবেক অনুযায়ী কাজ করার অভ্যাস লাভ করতে পারে নি। সামাজিক নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম হলে ভয়ংকর শাস্তি পেতে হত। দুর্খেইম (Durkheim) সম্ভবত ঠিক বলেছেন যে অসভ্যরা সামাজিক প্রথার একটি বাস্তব শক্তি উপলব্ধি করত। ঐ রহস্যময় শক্তির চেতনা বংশপরম্পরায় চলে আসত। বিশেষ করে দীক্ষাদান অনুষ্ঠানের প্রভাবটির রহস্যময়তা ছিল সর্বাধিক। এই উৎসবের পর বয়ঃপ্রাপ্ত তরুণদের পূর্ণ সামাজিক সদস্য করে নেওয়া হত। সূচনায় ধর্মও স্বাভাবিকভাবে এই সর্বব্যাপ্ত গোষ্ঠী-চেতনাকে প্রকাশ করত। গোষ্ঠীপতিদের দ্বারা প্রচলিত কতকগুলো প্রথার প্রতি স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তি তার আনুগত্য প্রকাশ করত। এর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ধারণার কোন যোগ ছিল না। কারণ তখন ব্যক্তিস্বতন্ত্রতার ধারণাই ছিল দুর্লভ। এই

* See George Galloway, Philosophy of Religion (1914), Chap II. and Principles of Religious Development (1909), Chap II.

অবস্থায় মানুষকে অনবরত তীব্র জীবন-সংগ্রাম করতে হত। এই জীবন-সংগ্রামই তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্ধারণ করত।—যেমন খাদ্যের সন্ধান করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষা করা, শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করা ইত্যাদি। এই অবস্থায় মানুষ পার্থিব প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি। এবং তাদের ধর্মও সেইখানে থেকে গেছে। ধর্মীয় প্রথা এবং অন্যান্য প্রথার মধ্যে যে সব আগ্রহ নিহিত ছিল সেগুলি হ'ল—'খাদ্য, বিবাহ, জন্ম, ব্যাধি, মৃত্যু, দীক্ষা, যুদ্ধ, বন্য প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া' প্রভৃতি। জীবন তখনো বিভিন্ন বিভাগে [যেমন ধর্মীয় জীবন, নৈতিক জীবন ইত্যাদিতে] বিভক্ত হয় নি। অন্যান্য আগ্রহের মধ্যে ধর্মীয় আগ্রহ ছিল নিতান্ত অস্পষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ দীক্ষাদান উৎসবের উল্লেখ করা যায়। এটি একই সঙ্গে ধর্ম, নৈতিকতা, ইন্দ্রজাল প্রভৃতির সমাহার।

অতএব মানুষ আত্মাকে প্রথমতঃ একটা প্রাকৃতিক বিষয় বলে মনে করত। শারীরিক প্রয়োজনে তা নিয়ন্ত্রিত হত। আত্মার দেহাতীত দিকটি তখনো চেতনার পশ্চাৎপটে অপেক্ষমাণ ছিল। তাহলেও অদৃশ্য জাগতিক শক্তির প্রতি মানুষের একটা তীব্র আবেগ প্রকাশ পেত। 'যেসব জিনিস প্রত্যক্ষ করা যায় তার মধ্যে নয়, যা প্রত্যক্ষ করা যায় না' তার সাহায্যে আদিম মানুষ জীবনের অজ্ঞাত দিকটি জানবার চেষ্টা করত। আমরা আগেই দেখেছি যে রহস্যময় শক্তির উপস্থিতির প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ভীতির অনুভূতি হল ধর্মের প্রথম নীতি। নিঃসন্দেহে এই অনুভূতি গভীর অজ্ঞতাপ্রসূত। কিন্তু পরবর্তীকালে এই অনুভূতি বহুবার সংস্কৃত হয়েছে। যৌক্তিকতা ও নৈতিকতার সংযোগ ঘটেছে এর সঙ্গে। তারপর ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বা ধর্মীয় আচরণ একটি উন্নততর অবস্থায় পৌঁছাতে পেরেছে। আদিম ধর্মবিশ্বাসগুলি মানা, সর্বপ্রাণবাদ ও টোটেমবাদের ভেতর দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। চরাচর ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা-বিশিষ্ট, অসংখ্য আত্মায় সমাকীর্ণ, এই বিশ্বাস থেকেই ধর্মের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের সূচনা। এই বিশ্বাসের প্রভাবেই নানারকম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে। 'মানা'র অস্পষ্ট ধারণা যখন জীবন্ত আত্মার ধারণায় রূপান্তরিত হল, অগ্রগতির প্রথম লক্ষণটি তখন স্পষ্টভাবে দেখা দিল। প্রকৃতিস্থ আত্মাকে মানুষ নিজের আত্মার সদৃশ মনে করত। তাই প্রকৃতিস্থ আত্মাকেও সে সজীব বলে মনে করল। তারপর যখন সে বিশ্বাস করল যে প্রাকৃতিক জিনিসে

(যেমন নদী, পাহাড়, গাছ ইত্যাদিতে) আত্মা আবদ্ধ থাকে এবং খুশিমত সেইসব জিনিস ত্যাগ করতেও পারে (যেমন, একসময় ভাবা হত ঘুমের সময় মানুষের আত্মা দেহ ছেড়ে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতে পারে) তখনই পরবর্তী অগ্রগতির লক্ষণটি পরিস্ফুট হয়ে উঠল। এইরূপে সর্বপ্রাণবাদ আত্মাবাদে রূপান্তরিত হল। আত্মাবাদে অগ্রগতির চিহ্নটি খুবই সুস্পষ্ট। কারণ এখানে অনুমান করা হয়েছে (টাইলের বক্তব্যানুসারে) "শরীরের থেকে আত্মা শ্রেষ্ঠ। দেহ এবং আত্মা পরস্পর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র" "আত্মাবাদ চেতনাকে সজাগ করে। উপাস্যদের আত্মাবিশিষ্ট বলে মনে করে। এই আত্মা সকল পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তিত থাকে। এইভাবে অধ্যাত্মবাদের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। ঈশ্বরই আত্মা যে 'ঈশ্বরকে উপাসনা করে সে আত্মাকে এবং সত্যকেও উপসনা করে' এই ধরনের বিশ্বাসের মধ্যে অধ্যাত্মবাদের চরম বিকাশ ঘটেছে। যদিও এটি একটি শিশুসুলভ অকপট মতবাদ তাহলেও এখানে একটি মহৎ সত্য ঘোষিত হয়েছে"।*

ধর্মের ইতিহাস একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রগতির ইতিহাস এরকম অনুমান করার কোন কারণ নেই। অনেক পুনরাবৃত্তি, অবক্ষয় ও কুসংস্কারের জটিল আবর্তনের কাহিনী রয়েছে ধর্মের ইতিহাসে। কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা জাতির ইতিহাস আলোচনা না করে আমরা যদি সমগ্র মানবজাতির একটা সুবিস্তৃত ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহ'লে আমরা বিচিত্র ক্রমবিকাশের অজস্র উদাহরণ খুঁজে পাব। যুগে যুগে প্রগতি যখন এক জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে অন্যত্র তখন সে বিকশিত হওয়ার নতুন পথ আবিষ্কার করে নিয়েছে। প্রগতিকে চিহ্নিত করতে পারে এমন স্তরগুলির উপর আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখবো। ধর্মের আদিম যুগের ফেটিশবাদ (Fetishism) প্রগতি নয়, প্রত্যাবর্তন বা পশ্চাৎগতির নিদর্শন। (টাইলে অবশ্য অন্য কথা বলেন)। Fetish কথাটি এসেছে পর্তুগীজ Feitico কথা থেকে। Feitico কথার অর্থ মুগ্ধ হওয়া বা বিস্মিত হওয়া। Feitico এসেছে ল্যাটিন factitius শব্দ থেকে। Factitius শব্দের অর্থ কৃত্রিম। মধ্যযুগীয় ল্যাটিনে এই শব্দটির অর্থ ছিল—ঐন্দ্রজালিক। পশ্চিম আফ্রিকার আদিবাসীদের উপাস্য-বস্তুকে উল্লেখ করার জন্য পঞ্চদশ শতকের পর্তুগীজ নাবিকেরা এই শব্দটি ব্যবহার করত। ফেটিশ একটি জড় পদার্থ।

* C. P. Tiele, The Science of Religion. (Gifford Lectures, 1896 Vol. i. p. 74).

আত্মা বা রহস্যময় শক্তির একটি আবাসস্থল। অন্তত কিছু সময়ের জন্য এই বস্তুটির উপর আত্মা ভর করে বলে বিশ্বাস করা হত। সেইজন্য জড় বস্তুটিকে উপাসনা করা হত এবং সৌভাগ্যলাভের চেষ্টা হত। প্রাকৃতিক বস্তু হিসেবে ফেটিশের নিজস্ব কোন মূল্য ছিল না। যে আত্মা তাতে বসবাস করে সেই আত্মার গুণে ফেটিশের মূল্যায়ন করা হত। হয়ত কোন অদ্ভুত-দর্শন প্রাকৃতিক জিনিস, যেমন অস্বাভাবিক একটা পাথর, কিংবা লাঠি, অথবা হাড় বা নখ প্রথম মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করত। তারা ভাবত হয়ত এখানে অপার্থিব কোন শক্তি থাকতে পারে। তাকে তারা উপাসনা করতে আরম্ভ করত। কিন্তু পশ্চিম আফ্রিকায় যত না ফেটিশ দেখা যায় তার থেকে অনেক বেশি বানায় গুণী ও ওঝারা। ফেটিশ বা তার আশ্রিত শক্তিটির মধ্যে কোন জৈব-সম্পর্ক থাকত না। জিনিসটিকে ফেলে আত্মা যখন খুশি চলে যেতে পারে। তখন সেই জিনিসটা তার সমস্ত ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ফেটিশের কাছে উৎসর্গ ও প্রার্থনা করা হত। কিন্তু যদি দেখা যেত তাতে কোন লাভ হচ্ছে না তখন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি চাওয়া হত। তাতেও না পাওয়া গেলে আদেশ করা হত। কিন্তু তার পরও যদি আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি না পাওয়া যেত তখন আরম্ভ হত গালাগালি। এমন কি চাবুকও মারা হত। কিন্তু যদি তাও ব্যর্থ হত তখন ধরে নেওয়া হত জিনিসটিকে ছেড়ে আত্মা চলে গেছে। জিনিসটাকে আর ফেটিশ হিসেবে স্বীকার করা হত না। তখন আবার নতুন ফেটিশ খোঁজা আরম্ভ হত। প্রয়োগবাদের আদিমতম রূপটি সম্ভবতঃ এখানে প্রকাশ পেয়েছে। একটা ফেটিশ থেকে যতক্ষণ কাজ পাওয়া যায় ততক্ষণ সে পবিত্র। নইলে দাও আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে। অবশ্য এর ফলে ফেটিশবাদের শেষ হচ্ছে না। একটা ফেটিশ গেলে নতুন একটা বস্তুকে ফেটিশ হিসেবে গ্রহণ করা হবে। স্পষ্টতঃ ফেটিশবাদ অত্যন্ত অনুন্নত মানের ধর্ম। এই বিশ্বাসের পেছনে কিন্তু আছে অধ্যাত্মবাদ। অধ্যাত্মবাদ অবশ্যই একটি উন্নত চিন্তা। কিন্তু ফেটিশবাদ ধর্মীয় ক্রমবিকাশের প্রধান সড়কটি ছেড়ে যেন একটা অন্ধগলিতে ঢুকে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বাসের সংযোগ ধর্ম অপেক্ষা ইন্দ্রজালের সঙ্গেই যেন বেশি। ফেটিশ একটি ব্যক্তিগত দেবতা। অসভ্যরা নিজেদের নির্দেশে তাঁকে কাজ করতে বাধ্য করত। এই ধারণা ব্যক্তিগত এবং খামখেয়ালী চিন্তার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ধর্মের মান এখানে নিম্নমুখী। এটিকে কোনমতেই প্রগতি বলা যায় না, স্পষ্টতঃ এটি প্রত্যাবর্তন।

এরপর আমরা আরও একটি ধর্মীয় মানের অধোগতির আলোচনা করতে পারি। ফেটিশবাদের মত বহু আত্মা উপাসনাবাদ (Polydœmonism) ও ধর্মীয় মানের অধোগতির নিদর্শন। সমগ্র চরাচর অসংখ্য আত্মায় পরিব্যাপ্ত। মানুষ প্রতি মুহূর্তে নিজেদের সুবিধা বা অসুবিধার জন্য তাদের উপস্থিতি বুঝতে পারে। স্বপ্ন থেকে যে এই ধারণার উৎপত্তি হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই সব আদিম মানুষদের কাছে স্বপ্নের অভিজ্ঞতা জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতার মতই বাস্তব ছিল। তারা আত্মাকে নিজেদের অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট প্রতিরূপ বলে ভাবত। ঘুমের সময় আত্মা দেহ ছেড়ে ঘুরে বেড়ায় আবার জেগে ওঠার আগে দেহে ফিরে আসে—এইভাবে তারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করত। স্বপ্ন এবং মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য হল স্বপ্নে আত্মা ফিরে আসে কিন্তু মৃত্যু হলে আত্মা আর দেহে ফিরে আসে না। অথবা বলা যেতে পারে আত্মা দেহে না ফিরে এলে মৃত্যু হয়। আদিম মানুষ নিজের আত্মার মত তার চতুর্দিকের জীব ও জড় সবকিছুর মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করত। জগতের এই অসংখ্য আত্মাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (ফেটিশের কথা এখানে উল্লেখ করবো না। কারণ ফেটিশ কোন শ্রেণীভুক্ত নয়। তারা নিজেরাই একটা শ্রেণী) (1) নদী, হ্রদ. পর্বত, সমুদ্র, গাছ, পাথর, পাখি, সাপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক জিনিসে যে-সব আত্মা থাকে তাদের এক শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এইসব জিনিসেরই যে উপাসনা করা হত এমন নয়। আমরা আগেই দেখেছি সর্ব-প্রাণবাদে কোন ধর্ম নেই। অসংখ্য আত্মার মধ্য থেকে যখন কিছু কিছু আত্মাকে নির্বাচন করে তাদের তুষ্টি সাধনের জন্য প্রার্থনা করা হত তখন তা ধর্ম হয়ে উঠত। এই নির্বাচিত আত্মাগুলিকে আদিম মানুষেরা নিজেদের থেকে শক্তিশালী বলে মনে করত। অন্ততঃ এদের অনিষ্ট করার ক্ষমতা যে বেশি সেটা তারা বিশ্বাস করত। মনুষ্য আকৃতি-বিশিষ্ট, অদ্ভুত দর্শন, অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক বস্তুগুলি অসভ্য মানুষদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করত। (2) আরেক শ্রেণীর আত্মা হল মৃত মানুষের আত্মা। মৃত্যুর পরও যে আত্মা বেঁচে থাকে এ সম্পর্কে অসভ্য মানুষদের মধ্যে কোন সন্দেহ ছিল না। মৃত্যুর ফলে আত্মার ভাল বা মন্দ করার ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় বলে তারা বিশ্বাস করত। পূর্বপুরুষদের উপাসনা সকল অসভ্য সমাজে প্রভূত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ধর্মের আদিম রূপ হিসেবে পূর্বপুরুষ উপাসনাবাদকে অস্বীকার করার স্বপক্ষে আমরা

আগেই আমাদের যুক্তি দেখিয়েছি। এটি বিশেষ এক ধরনের আত্মাবাদ। প্রকৃতি-উপাসনারূপে আগেই এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। অবশ্য এই বিশ্বাসের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এই উপাসনার একটি সুস্পষ্ট সামাজিক দিকও রয়েছে। এর ফলে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। (3) বিশাল প্রাকৃতিক বস্তুর আত্মাগুলিকে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি এক সময় মানুষের উপাস্য হয়ে উঠেছিল। এইসব বিশাল বিস্ময়উদ্দীপক জিনিসগুলি অপেক্ষা দৈনন্দিন জীবনে যে-সব তুচ্ছ সাধারণ জিনিসের প্রয়োজন হয় তারাই আদিম মানুষের অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করত—এই ধারণা সম্ভবতঃ সত্য। কিন্তু মানুষের ধারণা যখন কিছুটা উন্নত হয়েছিল তখন তাদের মনোযোগ গেল এই বিশাল প্রাকৃতিক জিনিসগুলি সম্পর্কে। এই বিশাল আত্মাগুলি তখন সাধারণ আত্মা অপেক্ষা স্বতন্ত্র এক শ্রেণীর আত্মা হয়ে উঠল। অনেকে এমন ধারণাও পোষণ করেন যে সব আত্মার পশ্চাতে এক সার্বভৌম আত্মার ধারণাও অসভ্য মানুষদের মনে অস্পষ্টভাবে বর্তমান ছিল। এন্‌ড্রু ল্যাঙ্গে (Andrew Lange) তাঁর Making of Religion গ্রন্থে বলেছেন—সর্বপ্রাণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অসভ্য মানুষেরা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করলেও তারা সংজ্ঞার সাহায্যে একজন পিতার বা সর্বকিছুর স্রষ্টার কল্পনা করত। তিনি আদি। অন্যান্য সাধারণ আত্মা অপেক্ষা তাঁর স্থান ঊর্ধ্বে। সেই আত্মার পরিপ্রেক্ষিতে তারা নিজেদের আত্মা বলে আর মনে করতে পারত না। তিনি এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে 'অসভ্যদের মধ্যে অনেকে খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের মতই একেশ্বরবাদী ছিল। তাদেরও একজন পরমেশ্বর ছিলেন'* একথা হয়ত সত্য যে সমস্ত কিছুর অস্পষ্ট পশ্চাৎপটে একজন পরমেশ্বরের ধারণা অসভ্যদের মধ্যে একেবারে অপরিচিত ছিল না। কিন্তু এই ধারণাকে কোন মতে আদিম ধারণা বলা যায় না। কিছুটা উন্নত অবস্থাতেই এই ধারণা জন্মলাভ করেছে। যেখানেই এ ধারণার সন্ধান পাওয়া গেছে, দেখা গেছে এই ধারণাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট। বাস্তব জীবনের কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এই বিশ্বাসের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। তাছাড়া আদিম মানুষেরা এই অতি-অতীন্দ্রিয় সত্তার উপাসনাও করত না। আফ্রিকার একজন মিশনারীর ভাষায়, তিনি 'এক অনুপস্থিত দেবতা'। তবুও এই পরমেশ্বরের

* Andrew Lange : The Making of Religion (2nd Ed. 1900), P. 167.

ধারণা অনেক অসভ্য সমাজে (যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু উপজাতিদের মধ্যে) দেখা যায়। এবং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে একেশ্বরবাদের প্রতি বিশ্বাসের প্রবণতা, খুব অস্পষ্টভাবে হলেও, সভ্যতার অত্যন্ত অনুন্নত অবস্থা থেকেই তার সূচনা হয়েছিল।

উপজাতীয় ধর্মের ত্রুটি অসংখ্য। ভয়ের ভূমিকাই এখানে প্রধান। সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী আদিম মানুষ অনুভব করত যে শত্রুভাবাপন্ন অসংখ্য আত্মার দয়ার উপর নির্ভর করে তাদের বাঁচতে হয়। তাই তারা সেই আত্মাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করত। আত্মার সংখ্যা যত বেড়ে যেত তাদের সম্পর্কে ভয়ও তত বাড়ত। এই ধরনের বিশ্বাস জীবনের ঐক্যে বাধা দেয়। উপজাতীয় ধর্ম খুবই সংকীর্ণ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী। এই ধর্ম নিজ গোষ্ঠীর সদস্য ভিন্ন অন্যান্য কাউকে স্বীকারই করে না। অন্য কোন গোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসের প্রতি বিন্দুমাত্র সহনশীলতা নেই। ধর্ম কোন ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয়। সমগ্র গোষ্ঠীর বিশ্বাস। গোষ্ঠীর মধ্যে কোন ধার্মিক ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই। ব্যক্তিজীবনের অল্প কিছুটা বিকাশ ঘটলেও উপাস্যের চরিত্র বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তখন আশ্চর্য রকম অনুপস্থিত ছিল। এইসব আত্মাদের দেবতা আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ তাদের ব্যক্তিত্ব ছিল নিতান্ত অস্পষ্ট ও অব্যাখ্যাত। আত্মাদের কোন স্বতন্ত্র চরিত্র ছিল না। কেবল তাদের শক্তিশালী সত্তা হিসেবে গণ্য করা হত। বহু ঈশ্বরবাদের দেবতাদের সঙ্গে এইসব আত্মার পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কারণ এইসব আত্মাদের পৃথক করে চেনার কোন উপায় নেই। এমন কি তাদের একটা নামও ছিল না। তারা এক একটি অনামী সত্তা। কেবল তাদের এক একটা বাসস্থান ছিল। তারা মানুষের থেকে কোন মহত্তর সত্তা নয়। কেবল তারা ছিল ধূর্ত ও ক্ষমতাশালী। অসভ্য মানুষেরা এই আত্মাদের সঙ্গে কোন নৈতিক গুণের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে নি। তারা পবিত্র, সত্যবাদী কিংবা ভালবাসার পাত্রও ছিল না। একটিমাত্র গুণ অসভ্য মানুষেরা এই আত্মাদের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছিল। সেই গুণটি হল ক্ষমতা। আর তার জন্যই ঐ সব আত্মাদের কাছে উৎসর্গ ও প্রার্থনা করা হত। সুন্দর জীবন যাপনের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা হত না, প্রার্থনা করা হত স্বাস্থ্য, সন্তান, খাদ্য, যুদ্ধজয় প্রভৃতির জন্য।

এই সব অজস্র ত্রুটি এবং স্থূলতা, ছেলেমানুষী এবং অজ্ঞতা থাকার পরও বলা যায় যদি একটু সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হয় তাহ'লে উপজাতীয়

ধর্মে অনেক ভাল সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতি খুঁজে পাওয়া যাবে। (1) অসভ্য মানুষেরা যেমন হোক একটা আত্মার ধারণা লাভ করেছিল। হোক তা অসম্পূর্ণ, কিন্তু সেই আত্মার ধারণাই ত সংস্কৃত হতে হতে বর্তমানের আত্মার ধারণায় রূপান্তরিত হয়েছে। সভ্য মানুষের আত্মার ধারণা অসভ্যদের আত্মার ধারণারই সংস্কৃত রূপ। টাইলর (E. B. Tylor) তাঁর Primitive Culture গ্রন্থের প্রথম খণ্ড শেষ করেছেন এই কথা বলে—আত্মা সম্পর্কিত মতবাদ (সর্বপ্রাণবাদ) ধর্মের দার্শনিক পদ্ধতির একটি প্রধান অংশ। বর্বরদের ফেটিশ উপাসনা এবং সুসভ্য খৃশ্চানদের উপাসনার মধ্যে মানসিক সংযোগের যে অবিচ্ছিন্ন ধারাটি রয়েছে তা এই মতবাদের ফলেই সম্ভব হয়েছে। যে বিভেদ বিশ্বের সকল বৃহৎ ধর্মমতগুলিকে পৃথক করে রেখেছে এবং কতকগুলি অসহিষ্ণু শত্রুভাবাপন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে রেখেছে সেই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সুগভীর পার্থক্যের তুলনায় সর্বপ্রাণবাদ এবং জড়বাদের পার্থক্য অনেক বাহ্যিক। (2) উপজাতীয় ধর্ম সমাজে ঐক্য এনেছে এবং একটা সর্বজনীন দায়িত্বের ধারণা দিয়েছে। টোটেমবাদের ক্ষেত্রে এই কথাটি বিশেষভাবে সত্য। গোষ্ঠীর রীতি-নীতির প্রতি আনুগত্য থেকে নৈতিক চেতনা বিকশিত হয়েছে। গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য থেকে রক্ষণশীলতা যেমন প্রশ্রয় পেয়েছে, তেমনি আত্মিক উন্নতির একটি পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তির ইচ্ছা সামাজিক মানদণ্ডে নিয়ন্ত্রিত হত। এক একটি ছোট গোষ্ঠী যুক্ত হয়ে যখন বৃহৎ গোষ্ঠী গঠিত হল তখন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীও প্রশস্ত হল। ব্যক্তি তখন সেই বৃহৎ গোষ্ঠীর প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করল। এইভাবে প্রগতি সম্ভব হল।

II—জাতীয় ধর্ম

অনেক সময় কোন সাধারণ শত্রুর ভয়ে ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলি একত্রিত হত। আবার কখনো কোন শক্তিশালী গোষ্ঠী দুর্বলতর গোষ্ঠীগুলিকে জয় করে একটি বৃহৎ জনসমষ্টিতে পরিণত হত। তার ফলে মানুষের মানসিক দিগন্তের বিস্তৃতি ঘটত এবং তার জীবনবোধও গভীরতর হত। সামাজিক সংগঠনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনাও বিকশিত হত। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে ধর্মের এই উন্নততর পরিণতির ঘটনাটি সচেতন চিন্তা-ভাবনার দ্বারা হয় নি। হয়েছিল সামাজিক সংগঠনের উন্নতির ফলে বাস্তব প্রয়োজনের চাপে পড়ে।

বৃহৎ গোষ্ঠীকে উপজাতি না বলে জাতি বলা হয়। উপজাতীয় জীবন থেকে জাতীয় জীবনে উত্তরণের ফলে ধর্মীয় চিন্তায় বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। বহুআত্মাবাদ বহুঈশ্বরবাদে রূপান্তরিত হল। আগে যে বহুআত্মার উপাসনা হত সেই আত্মাগুলিকে কোনমতে দেবতা বলা যায় না। তাদের কোন ইতিহাস ছিল না, ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল না, এমনকি একটা নামও ছিল না। উপজাতীয় ধর্মে এমনি অনামী আত্মাদের উপাসনা হত। এই বহু আত্মাবাদ থেকে বহু ঈশ্বরবাদে পৌঁছানো নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগমন। তারপর প্রাকৃতিক আত্মাগুলি ক্রমশঃ মনুষ্য গুণসম্পন্ন হয়ে উঠল। কল্পনা করা হল, মানুষের মত তাঁদেরও ভাললাগা মন্দলাগা রয়েছে, আবেগ উচ্ছ্বাস আছে, তাঁদের আহ্বান করা যায়, এবং তাদের এক একটি নামও রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে এর পর নদী, গাছ, আগুন, মেঘ, আকাশ প্রভৃতিতে যে-সব আত্মা বসবাস করতেন তাঁরা আর থাকলেন না। পূর্বে যে সব স্বর্গীয় দেবতাদের পূজা করা হত না তারাই এসে আত্মার স্থান দখল করে বসল। প্রকৃত ঘটনাটা কিন্তু অন্য রকম। নতুন কোন স্বর্গীয় ঈশ্বর তখন এসে হাজির হয় নি, ঐ সব প্রাকৃতিক আত্মাগুলি ক্রমশঃ দেবত্বের মর্যাদা পেতে লাগল। কল্পনা করা হতে লাগল দেবতারা স্বর্গবাসী। কিন্তু তাহ'লেও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের আদিম সম্পর্কটি একেবারে মুছে গেল না। ধীরে ধীরে অবশ্য দেবতাদের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক কমে আসতে লাগল। দেবতারা ক্রমশঃ নৈতিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন বিভাগে তাঁরা এক এক জন প্রধান হয়ে উঠলেন। যেমন যুদ্ধের দেবতা, ভালবাসার দেবতা, কৃষি, শিল্প ও সৌভাগ্যের এক একজন করে দেবতা কল্পিত হল। "আমরা সব সময় নিখুঁতভাবে দেবতাদের প্রাকৃতিক উৎস নির্ধারণ করতে পারি না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে নির্ণয় করা অসম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বৈদিক 'অগ্নি' আগুনের দেবতা। পারস্যের অহুরা আলোর দেবতা, ব্যাবিলনের মার্দুক এবং মিশরের রা হলেন সূর্যদেবতা। গ্রীসের জীউস এবং ল্যাটিন জুপিটার স্বর্গীয় দেবতা। জার্মানের ওডিন এবং বৈদিক ইন্দ্র ঝড়ের দেবতা। এইসব ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বনিয়াদের উপর আশ্রয় করে ধর্মীয় কল্পনার জাল বুনে দেবতাদের ব্যক্তিত্বের রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে।"*

* G. Galloway - The Philosophy of Religion (1914), P. 113

প্রাকৃতিক আত্মায় মানবত্ব আরোপ করার ফলেই কিন্তু সকল দেবতার সৃষ্টি হয় নি। এছাড়া ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতির মধ্য থেকে এবং উৎসর্গ ও প্রার্থনার দ্বারা অনেক দেবতার সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের অনেক জাতীয় দেবতার নাম এখানে উল্লেখ করা যায়। যেমন ভারতীয় ব্রহ্ম, মিশরের ওশিরিস, গ্রীসের এ্যাপোলো, ল্যাটিন মার্স, বৈদিক বরুণ এবং বিষ্ণু, হিব্রু জেহোবা প্রভৃতি। একবার যখন এ'দের ব্যক্তিগত গুণ আরোপ করা হল তখনই তাঁদের মরজগতের ঊর্ধ্বে, একটা অর্ধেক বাস্তব ও অর্ধেক আত্মিক জগতে স্থাপন করার মানসিক প্রবণতা দেখা দিল। সেই জগতে দেব-দেবীদের নিয়ে একটি সমাজের কল্পনা করা হল। তাঁদের জীবনে, পারস্পরিক ঈর্ষা আছে, ভালবাসা, যুদ্ধ, চক্রান্ত [অলিম্পিক পাহাড়ের চূড়ায় গ্রীক দেবতাদের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে] প্রভৃতি সব কিছু নাটকীয়তা কল্পনা করা হল। দেবতাদের জীবনের এইসব গল্প থেকে পৌরাণিক উপাখ্যানের জন্ম হল।

পৌরাণিক কাহিনী বা দেবদেবীর উপাখ্যানের অর্থ এবং উৎপত্তির প্রশ্নটি এখন পৃথকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। যে শাস্ত্রে দেবদেবীদের কাহিনী বর্ণনা করা হয়ে থাকে তাকে পুরাণ বলে। দেবতাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং দেবতাদের মানুষ ও জগতের সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে মানুষের অপরিণত চিন্তার ফলশ্রুতি হল এইসব আখ্যায়িকা। পুরাণে বিশেষভাবে কার্য-কারণ সম্পর্ক দেখাবার একটা চেষ্টা রয়েছে। কিন্তু সেই সম্পর্কটি বিশুদ্ধ চিন্তার সাহায্যে স্থাপন করা সম্ভব হয় নি, হয়েছে কল্পনার সাহায্যে, নাটকীয়তা যার প্রধান অবলম্বন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের, কৃষি উৎসবের, সভ্যতার, জগতের, এবং জাগতিক সব কিছুর যেমন, ঊষা ও গোধূলী, শরৎ ও বসন্ত, বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝা প্রভৃতির কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা হয়েছে পুরাণতত্ত্বে। এই অর্থে তা'হলে পুরাণ-তত্ত্বকে আদিম বিজ্ঞান বা দর্শন বলা যেতে পারে। চিত্র ও ঘটনার সাহায্যে এখানে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। আদিম কৌতূহল চরিতার্থ করতে এই বিশ্লেষণই যথেষ্ট ছিল। আজকের দিনের শিশুরা যেমন সান্তা ক্লজকে কিংবা পরীর গল্পে বিশ্বাস করে মানব সভ্যতার শৈশবেও মানুষ এইসব পৌরাণিক গল্পে বিশ্বাস করত। পৌরাণিক আখ্যানগুলিতে কষ্টকল্পনার স্থান নেই আছে স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনা। কোন ব্যক্তির স্বতন্ত্র চিন্তার প্রতিফলন এখানে নেই, আছে একটি সামগ্রিক চিন্তার প্রকাশ। ভাষা ও সামাজিক

রীতিনীতিকে কেউ যেমন চেষ্টা করে আবিষ্কার করে নি, তেমনি পৌরাণিক কাহিনীগুলিকেও কেউ চেষ্টা করে বানায় নি। এগুলি স্বাভাবিকভাবেই জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে সচেষ্ট অলংকরণ ও সংযোজন অস্বাভাবিক নয়। কারণ পৌরাণিক কাহিনীতে এমন সব ঘটনার আলোচনা রয়েছে যা বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার আওতার বাইরে। কল্পনাগুলিকে বাস্তব সমর্থন না পেলেও চলত, কারণ তার একমাত্র কাজ ছিল বিশ্বাস উৎপাদন করা। সকল সমাজ ও সংস্কৃতিতে এই রকম একটা আধা বৈজ্ঞানিক বা সহজ বিশ্বাসের যুগ ছিল। আমরা সুপরিচিত কয়েকটি পৌরাণিক কাহিনীর এখানে নামগুলি মাত্র উল্লেখ করছি।—ব্যাবিলন সৃষ্টির কাহিনী, জলপ্লাবনের গল্প, ভারতের প্রাচীন বৈদিক সূত্র, গ্রীসের হোমারের কবিত্ব প্রভৃতি। পুরাণ হয়ত খুব প্রাচীন নয়। বহুঈশ্বরবাদের প্রচলনের পর এর আবির্ভাব। কিন্তু মানুষের এই ধরনের গল্প বানানোর প্রবণতা অনেক আগেই দেখা দিয়েছিল। সর্বাত্মবাদে আত্মার যেহেতু কোন ব্যক্তিগত ইতিহাস নেই, কোন বিশেষ চরিত্র নেই, এমন কি একটা নামও নেই, সেইজন্য তাদের দিয়ে গল্প বানানোর কোন সুযোগ ছিল না। তাই সর্বাত্মবাদ বহু ঈশ্বরবাদে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন পুরাণের আবির্ভাব হয় নি।

আমরা পুরাণ এবং ধর্মকে এক করে ফেলার ভুলটি নিশ্চয় করবো না। পুরাণে আছে একটিমাত্র ধর্মীয় উপাদান। আমরা বলতে পারি ধর্মের বৌদ্ধিক উপাদানটি পুরাণে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই উপাদান খুব প্রাচীন নয় এবং গুরুত্বপূর্ণও নয়। ধর্ম বুদ্ধিধর্মী হওয়ার আগে থেকেই বাস্তবধর্মী ও আবেগ-প্রধান। ধর্ম হল একরকমের অনুভূতি এবং সেই সঙ্গে চিন্তা ও ইচ্ছার সংমিশ্রণ। যথেচ্ছ কল্পনা অপরিণত চিন্তার প্রকাশ। ধর্ম যেমন আদিম মানুষের কবিতা ও রোমান্স, তেমনি তার বিজ্ঞান ও দর্শন। বস্তুতপক্ষে কেবল কাল্পনিক সত্য বাস্তব সত্যের মধ্যে অথবা গল্প ও ঘটনার মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। শিশুরা যা কল্পনা করে তাই তাদের কাছে সত্য। তেমনি আদিম মানুষেরা যা কল্পনা করত তাই ছিল তাদের কাছে সত্য। পুরাণ ধর্মও নয় কিংবা ধর্মের উৎসও নয়। তবুও পুরাণ ধর্মের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। তাছাড়া কবিতা, দর্শন এবং ধর্মতত্ত্ব যদিও ধর্ম নয়, তবুও ধর্মের সঙ্গে এদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। পুরাণের আগেই উপাসনার আবির্ভাব হয়েছে। পুরাতত্ত্বে

উপাসনার যে বিকাশ লক্ষ্য করা যায় তা কিন্তু ধর্মীয় আগ্রহে হয় নি। চিন্তা-ভাবনার উন্নতির ফলে মানুষ যখন পৌরাণিক যুগ পেরিয়ে এল, তখনো কিন্তু সে পুরাণগুলিকে মূল্যহীন বলে বর্জন করে নি। বরং পুরাণকে রূপক ও প্রতীকধর্মী গল্প হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। এই সব কাহিনীর একটা অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ রয়েছে বলে মানুষ বিশ্বাস করে। যখন দেব-দেবীদের নিয়ে পৌরাণিক গালগল্প উন্নততর চিন্তাশীল মানুষের কাছে অবাস্তব বলে মনে হয়েছে তখনই তারা পুরাণের একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছে। পৌরাণিক কাহিনীর স্রষ্টারা নিশ্চয় কাহিনীগুলিকে প্রতীকধর্মী বলে মনে করতেন না। পরবর্তীকালে উন্নত সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য এই উপাখ্যানগুলির বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয়েছে। এক যুগের ছেলেমানুষীকে পরবর্তী যুগে রূপক কাব্য বলে মনে করা হয়েছে। এমন কি যে প্লেটো হোমরের কাব্যের তীব্র সমালোচক ছিলেন, তিনিও উপাখ্যানগুলির প্রতীকধর্মিতা স্বীকার করেছেন। প্লেটোর মতে উপাখ্যানগুলি স্কুল শিক্ষকের মত উপদেশ দেবার জন্যে মূল্যবান।

জাতীয় ধর্ম-বিকাশের ক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গতিভঙ্গী সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। যথা—(1) দেবতাদের উপর নৈতিক গুণ আরোপ, (2) একেশ্বর-বাদ অভিমুখী গতি। এই দুই গতিভঙ্গী বিশ্বজনীন ধর্মের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করে তুলেছে। এই দুটি গতির সঙ্গে তৃতীয় একটি গতির অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। তাহ'ল বিশেষভাবে উৎসর্গ, প্রার্থনা প্রভৃতি ধর্মীয় আচরণের উল্লেখ-যোগ্য ক্রমবিকাশ।

(1) দেবতাদের উপর নৈতিক গুণারোপ ঃ—প্রাকৃতিক বস্তুর আত্মা সম্পর্কে কোন নৈতিক আলোচনা হতে পারে না। কিন্তু যখন আত্মার ধারণা প্রাকৃতিক বস্তুর আওতা ছাড়িয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ঊর্ধ্বে মোটামুটি একটি অতীন্দ্রিয় জগতে স্থাপিত হল এবং আত্মাকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করা হ'ল, অন্ততঃ আত্মাকে মনুষ্যগুণসম্পন্ন বলে মনে করা হল, তখন দেবতাদের ন্যায়বান ও মঙ্গলময় বলে ধারণা করার পথ প্রশস্ত হয়ে গেল। এর পর ক্রমশঃ দেবতারা মানুষের আদর্শ এবং নৈতিক অভিভাবক হয়ে উঠলেন। তিনি সৎকে পুরস্কৃত করেন এবং অসৎকে শাস্তি দেন। বিশুদ্ধ একটা প্রাকৃতিক শক্তির উপর মানুষ একদা নির্ভর করত। সেই শক্তিই ক্রমে দেবতা হয়ে উঠলেন। এবং সেই

দেবতারা ক্রমশঃ নৈতিক গুণসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। তারপর দেবতাদের নৈতিক জগতের ধারক ও বাহকরূপে কল্পনা করা হতে লাগল। যে চরম আদর্শ মানুষ কামনা করে দেবতারাই হলেন তার আধার। হফ্‌ডিং (Hoffding) বলেছেন, "প্রাকৃত ধর্ম থেকে নৈতিক ধর্মে উত্তরণকে ধর্মের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিসেবে যে গণ্য করা হয় তা যথার্থ। বহুঈশ্বরবাদী ধারণার একেশ্বরবাদে পরিবর্তিত হওয়ার ঘটনা অপেক্ষা এই পরিবর্তন অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ"* কিন্তু এই দুই ধরনের মধ্যে বিরোধ তত তীব্র ছিল না। হফ্‌ডিং (Hoffding) আরও বলেছেন, "এমন কি প্রাকৃত ধর্মেও নৈতিকতা ছিল। মানুষ দৈব শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ করতে বাধ্য থাকত। তার জন্য তারা দেবতাদের সম্মানে উৎসব-অনুষ্ঠান করত। তা'হলে দেখা যাচ্ছে, মানুষকে একটা আনুগত্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণের যুগ অতিক্রম করতে হয়েছে। পারিবারিক উপাসনা, গোষ্ঠী উপাসনা বা জাতীয় উপাসনায় সকলে অংশ-গ্রহণ করত বলে তার থেকেই একটা ঐক্যের ধারণা জন্মেছিল। পরবর্তীকালে এই ধারণা নৈতিক তাৎপর্য লাভ করেছিল।" কিন্তু দেবতাদের যখন নৈতিক গুণসম্পন্ন বলে মনে করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই নৈতিক ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। এই পরিবর্তনটি দীর্ঘদিন ধরে ঘটেছিল। এখনো এই রূপান্তর এখানে ওখানে হচ্ছে। হোমার (Homer), হেসিয়ড (Hesiod) এবং এসকাইলাস (Aeschylus) প্রমুখ প্রধান গ্রীক কবিদের রচনায় দেবতাদের যে স্থূল ও অনৈতিক বিবরণ রয়েছে প্লেটো (Plato) তার নিন্দা করেছেন। দেবতাদের পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ, তাদের শত্রুতা, নিষ্ঠুরতা, কামনা প্রভৃতি দেবতাদের অশোভন চরিত্রণ প্লেটোর (Plato) ভালো লাগে নি। "দেবতাদের কথা যদি বলতে হয়, তা কবিতা, মহাকাব্য, নাটক যেখানেই তাঁদের কথা বলা হোক না কেন, বলতে হবে দেবতার মত করে। দেবতারা কি মঙ্গলময় নন? তাহলে তাঁদের কি সেইভাবে বর্ণনা করা উচিত নয়? নিঃসন্দেহে উচিত"† উরিপিডিস্ (Euripedes) লিখেছেন, "দেবতারা মন্দ যদি কিছু করেন, তাহ'লে তাঁরা দেবতাই নন।"

দেবতাদের এই ভাবে নৈতিক গুণ আরোপ করার কালে এক একজন দেবতা

---

* H. Hoffding—The Philosophy of Religion (E. T., 1906), P. 326.

† Plato's Republic—ii L8.

এক একটি গুণের প্রতীক হয়ে উঠলেন। বিভিন্ন জাতির কাহিনী থেকে কতকগুলি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। যেমন—ইন্দ্র (বেদ), মার্স (ল্যাটিন), থর (টিউটানিক) প্রভৃতি দেবতারা হয়ে উঠলেন বিশেষ করে সৌন্দর্যের প্রতীক। বরুণ (বেদ) এবং ওশিরিস (মিশরীয়) হলেন ন্যায়বিচারের দেবতা। পল্লস এ্যাথেনী (গ্রীক) প্রজ্ঞার দেবী, হেসিটা (গ্রীক) সতীত্ব ও গার্হস্থ্য আদর্শের দেবী, জরথুস্ত্র ধর্মের প্রধান দেবতা আহুর মাজ্দা অন্ধকার ও মন্দের শত্রু, আলোক ও মঙ্গলের দেবতা। জিউস্ (গ্রীক্) হলেন অমঙ্গলের শত্রু এবং বিশ্বে নৈতিকতার পরিচালক। খৃষ্টপূর্ব ধর্মে ওল্ড টেষ্টামেণ্টেই দেবতাদের সম্পর্কে নৈতিক ধারণা সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছেছিল। এখানেও নৈতিকতার ধারণার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানোর জন্য খুব ধীর ক্রমবিকাশের লক্ষণ দেখা যায়। অবশেষে অবতারদের বাণীতে এই ধারণা চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবতারগণ এবং ধর্মগীত রচয়িতারা প্রকৃত পক্ষে তাঁদের বর্ণনায় দেবতাদের সম্পূর্ণ নৈতিক চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। "যিনি এখনো আছেন ভক্ত ও অনুতপ্তের জন্য, তিনি উচ্চ এবং পবিত্র, যিনি অনন্ত কাল ধরে অবস্থান করেন, তিনি পবিত্র, সৎ, জ্ঞানী, দয়াময় ও শুভা-শুভের বিচারক (Isa lvii 15) তিনি 'মঙ্গল দেখেন, অমঙ্গল দেখেন না এবং পাপ সহ্য করতে পারেন না' (Hab i 13) তিনি সততার সঙ্গে সব কিছু বিচার করেন এবং সৎলোকদের পরিচালনা করেন (Ps IX 8) 'তিনি মহান ও দয়ালু, অতি সহিষ্ণু, সৎ ও মঙ্গলময়। ভ্রষ্ট, অনাচারী ও পাপীদের জন্যও তাঁর অসীম করুণা' (Exod XXX N 6) তাঁর মধ্যে দয়া এবং সত্য একাকার, সততা এবং শান্তি পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় বাঁধনে বাঁধা। (Ps IXXXV 10) তিনি অকম্পণীয়. এক ও সম্পূর্ণ। প্রাচীন ধর্মের অনেক পবিত্র গ্রন্থে দেবতাদের নৈতিক চরিত্রের উচ্ছ্বসিত বিবরণ দেখা যায়। দীর্ঘদিন ধরে অন্ধকারে ক্লান্তিকর অনুসন্ধানের পর ধর্মীয় অভিজ্ঞতা পরিশুদ্ধ হয়ে দর্শনের সুউচ্চ শীর্ষে এসে পৌঁছেছে। উন্নততর অবস্থায় এসে গুণ হিসেবে 'মঙ্গলময়' কথাটি যখন ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হল, প্রাচীন বা নবীন উভয় ধর্ম-চেতনার কাছে সেদিন এমন একটি সমস্যা দেখা দিল যে সমস্যা ধার্মিকদের কাছে একটি চিরকালের সমস্যা হয়ে রয়েছে। কি করে ঈশ্বরের সম্পূর্ণতা এবং মঙ্গলময়তাকে বাহ্য জগতের অসম্পূর্ণতা, বিশেষ করে পাপ ও দুঃখ-কষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যাবে?

ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান এবং সর্বমঙ্গলময় তাহ'লে জগতে এত অমঙ্গলের কারণ কি? সমস্যাটি পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে।

(2) একেশ্বরবাদের দিকে অগ্রগতি—বহুঈশ্বরবাদ তিন ভাবে একেশ্বরবাদে রূপান্তরিত হতে পারে।*

(a) জাতীয় ধর্মে অনেক দেবতার মধ্যে কোন একটি দেবতাকে বেশি করে প্রশংসা করার একটি প্রবণতা দেখা যায়। মানুষের সামাজিক জীবনের উপমার সাহায্যে দেবতাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হত। পৃথিবীর সমাজে একজন রাজা থাকেন, অতএব দেবতাদের সমাজেও একজন রাজা থাকা স্বাভাবিক। এর পর অন্য দেবতাদের আর সমান ক্ষমতাসম্পন্ন থাকা সম্ভব হয় না। স্বর্গে একজন প্রধান দেবতার নেতৃত্বে অন্যান্য দেবতাদের প্রাধান্য অনুসারে ক্রমপর্যায়ে সাজানো হল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় গ্রীক দেশের লোকেরা বিশ্বাস করত—'দেবতাদের এবং সকল মানুষের পিতা হলেন জিউস। রোমানদের মতে জুপিটার প্রধান। ব্যাবিলনে মার্দুক, আসিরিয়ায় অসুর এবং প্রাচীন চীনা-ধর্মে তায়েন (স্বর্গ) এবং সাংতি (দেবতাদের প্রধান) কে প্রধান বলে মনে করা হত। জগতের সর্বত্র, সকল জাতীয় ধর্মে দেবতাদের একজন রাজা কল্পনা করার প্রবণতা দেখা যায়। এই ধরনের বিশ্বাসকে দেবতাদের রাজতন্ত্রবাদ (monarchianism) বলা যেতে পারে।

(b) ম্যাক্সমূলার (Max Muller) যাকে একদেব প্রাধান্যবাদ (Henothedism) বলেছেন তার মধ্যেও এই এক দেবতার প্রাধান্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই অবস্থায় যদিও অনেক দেবতার অস্তিত্ব থাকে, ভক্ত কিন্তু তাদের মধ্যে কোন একজন দেবতাকে এমন নিবিষ্টভাবে আরাধনা করে যে অন্তত সেই সময়ের জন্য সেই দেবতাটি ভক্তের কাছে, সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে গৃহীত হন। অন্য দেবতারা তখন সেই দেবতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। ধর্মের প্রতি কোন রকম অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করে আমরা এই ধরনের মানসিকতার একজন প্রেমিকের উপমা দিতে পারি। অন্যান্য রমণীর অস্তিত্ব প্রেমিক অস্বীকার করে না। কিন্তু তার প্রেয়সী ব্যতীত অন্য সকলে তার কাছে তুচ্ছ ও নগন্য। অন্তত যতক্ষণ তার সেই

* For other ways of approach to monotheism besides these, see the full treatment in D'Alisellas Hirbbert Lecturer, Origin and Growth of the concept of God (1892) chap V.

মানসিক অবস্থা থাকবে ততক্ষণ তার প্রেয়সীই তার কাছে একমাত্র নারী। এটি কোন তাত্ত্বিক বিশ্বাস নয়, ধর্মাচরণের একটি বিশেষ মানসিকতা মাত্র। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে ম্যাক্সমূলার এই প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। কখনো দেবী অদিতি, কখনো দেবতা বরুণ অথবা মিত্র শ্রেষ্ট দেবতা হিসেবে গন্য হয়েছেন। ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনার দায়দায়িত্ব তাদের উপর বর্তেছে। অন্যান্য দেবতারা সাময়িকভাবে আড়ালে পড়ে গেছেন। কিন্তু ভক্তির তীব্রতাটি কমে যাওয়ার পর একদা শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃত দেবতাটি অন্য সকলের মত সাধারণ হয়ে পড়েছেন। বেদ ব্যতীত অন্য ধর্মেও এই প্রবণতা দেখা যায়। প্রাচীন মিশরীয় ধর্মে পর্যায়ক্রমে রা, ওসিরিশ, টা, আম্মান এবং আরও অনেকে প্রধান দেবতার স্থান গ্রহণ করেছিলেন।

(c) আরও এক ভাবে বহুর ধারণা 'একে' বিলীন হয়ে গিয়েছিল। চিন্তনের সহায়তায় সকল দেবতাকে এক ঈশ্বরের বহুরূপে প্রকাশ বলে সিদ্ধান্ত করার একটি প্রবণতা দেখা যায়। বহু দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করেও একেশ্বরের ধারণা এইভাবে লাভ করা যায়। প্রাচীন মিশরে সূর্যদেবতাকে সকল দেবতার আত্মারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। "আমিই স্বর্গ ও মর্ত্যের স্রষ্টা,...আমিই সকল দেবতার প্রাণ ... আমি সকালের চেপেরা (Chepera), দুপুরের রা (Ra) এবং সন্ধ্যায় ৎমু (Tmu)" ভারতে অনেক বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে এই প্রবণতার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে বহু পরিচিত মন্ত্রটি হল 'ওগো অগ্নি, তুমি যখন জন্মগ্রহণ কর তখন বরুণ, যখন নিহত হও তখন মিত্র, তুমিই সকল দেবতা।" তিনি এক। মুনিরাই তাঁকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। পরবর্তীকালে উপনিষদের যুগে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ব্রহ্ম বা পরমসত্তা এক। পার্থিব জগতের এই বহুত্বের ধারণা ভ্রমজ্ঞান বা মায়া। বহুর মধ্য দিয়েই 'এক' নিজকে প্রকাশ করেছেন। বহু দেবতার ধারণাও অন্যান্য সব কিছুর মত এক সত্তার ধারণায় রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতবর্ষে এই একেশ্বরবাদ ব্যবহারিক প্রয়োজনে বহু ঈশ্বরের উপাসনা স্বীকার করে নিয়েছে। গ্রীসদেশে এই প্রবণতার বিকাশ হয়েছিল প্রধানতঃ জেনোফেনিস (Zenophanes), পারমেনিডিস (Permanides) এবং স্টয়িক (stoics) দার্শনিকদের প্রভাবে। গ্রীসে মানবরূপী বহু ঈশ্বরের ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জেনোফেনিস্ (Zenophanes) এক পরম ঐক্যের ধারণায় উপনীত

হয়েছিলেন। ইন্দ্রিয়জ কল্পনার দ্বারা সেই 'এক' কে কখনো জানা যাবে না। সর্বেশ্বরবাদীদের মত স্টয়িক দার্শনিকগণও ঈশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা হিসেবে এবং বিশ্বচরাচরের অন্তবর্তী কারণ হিসেবে কল্পনা করেছিলেন।

(d) ইস্রাইলে ধর্মের একেশ্বরবাদের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল। পৌত্তলিক ধর্মগুলিতে অতি অল্পসংখ্যক ভাগ্যবানের অন্তর্দৃষ্টিতে একেশ্বরবাদী ধারণা কখনো কখনো প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কখনো এটি জনগণের ধর্ম হয়ে উঠতে পারে নি। পারস্যের জরথুস্ত্র (Zarathustra) একেশ্বরবাদের কাছাকাছি এসেছিলেন। কিন্তু তিনি যে সব দেবতাদের নির্বাসিত করেছিলেন, জেন্দা এভেস্তায় (Zend Avesta) তাঁর উত্তরাধিকারীরা সেই সব দেবতাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্লেটো (Plato) তাঁর চিন্তায় অবশ্যই একেশ্বরবাদী। কিন্তু প্রচলিত ধারার প্রতি সম্মান দেখিয়ে তিনি গ্রীসের বহু ঈশ্বরবাদী ভাষা সর্বত্র প্রয়োগ করেছেন। পরিবর্তনশীল ধর্মীয় চিন্তা থেকে গ্রীক্-দর্শন এতদূরে সরে গিয়েছিল যে জনপ্রিয় ধর্মকে সংস্কার করে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। এমন কি ইস্রাইলেও আমরা সূচনা থেকে প্রকৃত অর্থে একেশ্বরবাদের সাক্ষাৎ পাই না। জাতীয় জীবনের সূচনায় কেবল শিক্ষকেরা এবং নেতারাই জেহোবা (Yahovah) কে একমাত্র দেবতা বলে স্বীকার করতেন। কিন্তু অন্যান্য জাতীয় দেবতাদের অস্তিত্বকে তখনো অস্বীকার করা হয় নি। মোয়াবাইট (Moabites) জাতির দেবতা ছিলেন ক্যামস (Chamosh), এ্যামোনাইটদের (Ammonites) দেবতার নাম ছিল মোলক (Moloch), জীদোনীয়দের (Zidonians) দের দেবতা ছিলেন বাল (Baal) প্রভৃতি। তবুও জেহোবাই ছিলেন একমাত্র দেবতা, যে দেবতাকে ইস্রাইলের লোকেরা উপাসনা করত। জেহোবা ছিলেন তাদের একমাত্র ধর্মীয় আকর্ষণ। যা কিছু ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বা যা কিছু ধর্মীয় আদর্শ তারা লাভ করত, সব কিছুই তারা পেত জেহোবার কাছ থেকে। অন্য দেবতার উপাসনা রাজদ্রোহ হিসেবে গণ্য হত। তার মানে এই নয় যে সব লোক অন্য দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করত। তাহ'লেও তাদের কাছে জেহোবাই ছিলেন ইস্রাইলের একমাত্র দেবতা। একে ঠিক একেশ্বরবাদ বলা যায় না। বরং একে দেবতা উপসনা বলা যেতে পারে। এ্যামোসের (Amos) সময় থেকে ইস্রাইলের জননায়কগণের উপলব্ধি হতে আরম্ভ হল যে জেহোবার ঐশ্বরিক এবং নৈতিক রাজত্ব এতদূর বিস্তৃত যে তাঁকে ইস্রাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ

রাখা সঙ্গত নয়। তাঁর রাজত্ব রয়েছে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে। অন্য কোন দেবতার স্থান আর সেখানে নেই। বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় Deutero-Isaiah (Isa XIV6)। এর পর থেকে ঈশ্বরের একত্ব এবং সার্বভৌমত্বের বিশ্বাস ইহুদী ধর্মের স্তম্ভ হয়ে উঠল। ঈশ্বরের সর্বোচ্চ নৈতিক চরিত্রের ধারণা বা এক কথায় নৈতিক একেশ্বরবাদের ধারণা ভবিষ্যৎ মনুষ্য সভ্যতাতে ইহুদীজাতির প্রধান অবদান।

3. **বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্রমবিকাশ ঃ** উৎসর্গ ও প্রার্থনা।

ধর্মের ইতিহাস কেবলমাত্র দেবতাদের সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসের ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত নয়, যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সাহায্যে মানুষ দেবতাদের সঙ্গে একাত্ম সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল, সেই আচার-অনুষ্ঠানের ক্রমবিকাশের ইতিহাসও ধর্মের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। ব্যবহারিক প্রয়োজনকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র ঐশ্বরিক বিষয়ের আলোচনাকেই ধর্ম বলে না। দেবতাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা থেকে এর সূচনা, এবং সেবা ও আত্মোৎসর্গে এর পরিণতি। আমরা এখানে সেই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার এবং সংরক্ষণের অথবা সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের দুটি প্রধান উপায়ের উল্লেখ করবো। উৎসর্গ ও প্রার্থনার সূচনা হয়েছিল উপজাতীয় বা আদিম ধর্মে। কিন্তু জাতীয় অথবা বহুঈশ্বরবাদী ধর্মে উপাসনার ক্ষেত্রে উৎসর্গ ও প্রার্থনার উল্লেখযোগ্য বিকাশ দেখা যায়। উৎসর্গ ও প্রার্থনা প্রভৃতি তখন থেকে আরও সুনির্দিষ্ট, ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

(a) **উৎসর্গ ঃ** উৎসর্গের উৎপত্তি, প্রকৃত অর্থ এবং ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি এখনো যথেষ্ট বিতর্কিত বিষয়। আমরা এখানে বিষয়টির অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি মাত্র। উৎসর্গকে চারটি মানসিকতায় ভাগ করা যায়। আমরা সরল থেকে আরম্ভ করে ক্রমশঃ জটিল আলোচনাগুলির দিকে অগ্রসর হব। আর আমরা যেভাবে পরপর আলোচনা করবো, সম্ভবত (নিশ্চিত নয়) সেইভাবে উৎসর্গের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ হয়েছে। প্রথম মানসিকতা হল দেবতাদের অনুগ্রহ লাভ করবার ফলে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতার মানসিকতা। এই মানসিকতা প্রকাশ পায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন, গাছের প্রথম ফলটি উৎসর্গ করা প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে। মানুষ তার জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য

জিনিসগুলি, যথা—খাদ্য পানীয় প্রভৃতি, ক্ষমতাশালী দেবতাদের কাছ থেকে লাভ করে। তাই ক্ষমতাবানের কাছে কৃতজ্ঞতার সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হল উৎসর্গ। আমরা এখনো খাওয়ার আগে যে প্রার্থনা করি বা শুভেচ্ছা প্রকাশ করি এবং উপকার পাওয়ার পর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, এসবের মধ্য দিয়ে সেই উৎসর্গের মানসিকতাই কাজ করে। পরবর্তীকালে ফল ফুল দিয়ে পূজা করা, বা গীর্জা ও মসজিদ সাজানো স্পষ্টতঃ সেই প্রথম ফুল বা ফল উৎসর্গের পরিবর্তিত রূপ মাত্র।

কিন্তু এই কৃতজ্ঞতার মানসিকতাটি কালক্রমে দেবতাদের উপহার দিয়ে প্রতিদানে কিছু পাওয়া যাবে, এইরকম একটা দরকষাকষির মানসিকতায় রূপান্তরিত হল। কত সহজে এই বিশুদ্ধ কৃতজ্ঞতার মানসিকতা ব্যবসায়িক মানসিকতায় পরিবর্তিত হতে পারে তার সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে বাসুতোল্যাণ্ডের অধিবাসীদের প্রার্থনার মধ্যে। যখন তারা তাদের প্রথম পুষ্পটি উৎসর্গ করে, বলে, 'দেবতাদের ধন্যবাদ। আগামীকালও আমাদের রুটি দিও'। ঘটনাটি আমাদের ডাঃ জনসনের কৃতজ্ঞতার বিখ্যাত সংজ্ঞাটি স্মরণ করিয়ে দেয়। 'কৃতজ্ঞতা হল অনুগ্রহ প্রাপ্তির জ্বলন্ত সচেতনতা' [ঈশ্বরের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কের উদাহরণ সব ধর্মেই পাওয়া যাবে। কোথাও স্থূল। কোথাও মার্জিত]। প্লেটো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই মানসিকতার নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, এর ফলে উপাসনা হয়ে উঠবে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক। তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন, অসাধু সুদখোরদের সঙ্গে ঈশ্বরকে এক করে দেখা উচিত নয়।* তবুও ঈশ্বরকে উপহার দেবার মধ্যে অনুকম্পা লাভের হীন বাসনার পরিবর্তে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনার একটা ঐকান্তিক ইচ্ছাও প্রকাশ পেতে পারে। উৎসর্গের তৃতীয় রূপটি দেখা যায় দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের তীব্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। উৎসর্গীকৃত খাদ্যকে দেবতাদের মধ্যে এবং তাঁর উপাসকদের মধ্যে ভাগ করে দেবার একটি প্রথা রয়েছে। এর মধ্য দিয়ে দেবতাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের মানসিকতাই প্রকাশ পায়। উপাসক যে দেবতাদের সঙ্গে কেবল খাওয়া-দাওয়া করে তাই নয়, অনেক সময় দেবতাদেরই খেয়ে ফেলতে পারে। এইভাবে দেবতাদের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করা বা একাত্ম হওয়া যায়। রবার্টসন

---

* See Adam, Religious Teachers of Greece. P. 44.

স্মিথ (Robertson Smith) তাঁর Religion of the Semities গ্রন্থে এই কথা বলেছেন। টোটেম গোষ্ঠীর প্রাণীকে হত্যা করে সমাজের সকলে এক সঙ্গে খেলে সেই খাদ্যের মধ্য দিয়ে দেবতাদের গুণ সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে, এটা ছিল আদিম মানুষের বিশ্বাস। স্মিথ মনে করেন টোটেম প্রথার মধ্য দিয়ে সকল ধর্ম ক্রমবিকশিত হয়েছে। তাই তিনি উৎসর্গের উৎপত্তি সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করেছেন। কিন্তু আমরা যুক্তিযুক্তভাবে আগেই টোটেমবাদকে খণ্ডন করেছি। তবুও অনেক জায়গায় উৎসর্গের ধারণার মধ্যে দেবতা-ভক্ষণ যে রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। উদাহরণস্বরূপ 'অরফিক কাল্ট' ও 'থে্রসিয়ান ডাই' ও 'যীসাসের' উল্লেখ করা যায়। এমন কি রোমান ক্যাথলিকদের 'খৃষ্টের রক্ত ও মাংসকে মদ্য ও রুটিতে পরিবর্তন করা' এই পদ্ধতির মার্জিত রূপ ছাড়া আর কি হতে পারে। উৎসর্গের চতুর্থ রূপটি প্রকাশ পায় ঈশ্বরের সঙ্গে বোঝাপড়ার ইচ্ছার মধ্যে। দেবতাদের সন্তুষ্ট করে বা নিজের কৃতকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে অসন্তুষ্ট দেবতাকে মানুষ প্রসন্ন করে তুলত। মানুষের কিছু কিছু আচরণে দেবতারা অসন্তুষ্ট হতেন। মানুষের প্রতি তখন আর তাঁদের অনুকম্পা থাকত না।* দেবতাদের সঙ্গে ঐক্যের সম্বন্ধটি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কিছু উৎসর্গের প্রয়োজন হত। পাপীদের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য বিভিন্ন রকম উৎসর্গের পদ্ধতি সব ধর্মে না থাকলেও বেশির ভাগ ধর্মেই দেখা যায়। অনেক উন্নত ধর্মেও এই অনুষ্ঠান বেশ স্থূল ও অপ্রীতিকরভাবে প্রকাশ পায়। আবার উন্নত আত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রেও এই অনুষ্ঠান ফলপ্রদ। খৃষ্টজন্মের পূর্বে প্রতিনিধি উৎসর্গ বা প্রতীকস্বরূপ পশুবলি প্রচলিত ছিল। [Deutero —Isaiah (esp Isa Chap iii) র জেহোবার 'Suffering Servent' চিত্রে এই পদ্ধতির মর্মস্পর্শী চিত্রটি রয়েছে।] উৎসর্গের জন্য প্রাণীটি যদি অনিচ্ছুক হত তবে মানুষ স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গ করত। এই উৎসর্গ পদ্ধতি মানুষের জীবনে অভিনব এক নৈতিক মান সংযোজন করল। যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আত্মোৎসর্গও খৃশ্চানদের চিন্তায় পরিপূর্ণ একটি প্রতিনিধিমূলক উৎসর্গের উদাহরণ। জগতের সকল পাপীদের প্রতিভূ হিসেবে তাদের কল্যাণের জন্য

* আদিম ধর্মে ভয়ের প্রাধান্য থাকার জন্য সন্তুষ্টীকরণকে উৎসর্গের একেবারে প্রাথমিক রূপ হিসেবে গণ্য করা উচিত ছিল এবং চতুর্থ ভাগে আলোচনা না করে প্রথমে এই আলোচনা সঙ্গত হত।

যীশু আত্মোৎসর্গ করেন] এই পদ্ধতি তখন সর্বত্র কম বেশি প্রচলিত ছিল। নৈতিক দিকের গভীরতা যত বৃদ্ধি পেতে লাগল, প্রায়শ্চিত্তের বাহ্য পদ্ধতি-গুলিকে ততই অযথার্থ বলে মনে হতে আরম্ভ করল। মহাপুরুষ হোসেয়া (Hosea) বলেছেন, "আমি করুণা চাই, আত্মত্যাগ নয়। উৎসর্গ করার থেকে আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে চাই।" কনফুশিয়স (Confucius) বলেছেন, 'শষ্যকণা থেকে সুগন্ধ পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধতা ও সততাই সে সুগন্ধ দিতে পারে।' চিন্তা যতই উন্নত হোক তবু উৎসর্গের রীতিটি থাকবেই। পল (Paul) বলেছেন, 'আমি তোমাদের কাছে আবেদন করি, তোমাদের দেহ যেন জীবন্ত উৎসর্গ হয়ে ওঠে, ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। তোমার সামাজিক এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যেন তদনুরূপ হয়।' (Rom, xii I. Moffatt's translation.)

প্রার্থনা ঃ প্রার্থনা ধর্মের মতই বিশ্বজনীন। ধর্মীয় আচরণে প্রার্থনা এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে সবেটর (Sabatier) বলেছেন প্রার্থনাই ধর্মের মূল জিনিস। তিনি বলেছেন, "ধর্ম হল হৃদয়ের প্রার্থনা। যে সব মানসিকতা ধর্মের অনুরূপ বা ধর্মের কাছাকাছি, যেমন নৈতিক ধারণা বা সৌন্দর্যের অনুভূতি, তাদের থেকে ধর্মকে প্রার্থনাই স্বতন্ত্র করে তোলে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ধর্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাসটি সম্ভবত সবচেয়ে ভাল পাওয়া যাবে।" প্রার্থনার বিবর্তন দু'দিক থেকে আলোচিত হতে পারে। প্রথমত—মন্ত্রের থেকে পৃথক করে প্রার্থনার পদ্ধতি। দ্বিতীয়ত—প্রার্থনীয় বিষয়। প্রকৃত প্রার্থনা-পদ্ধতি স্বভাবতঃ মন্ত্রের থেকে ভিন্ন। প্রার্থনা হল আবেদনের বা নৈতিক প্রবর্তনার পদ্ধতি। সুতরাং এর লক্ষণ হল বিনয় এবং শ্রদ্ধা। কিন্তু মন্ত্র হল ঐন্দ্রজালিক আদেশ ও অবরোধের পদ্ধতি। এর মধ্যে থাকে স্বনির্ভরতা এবং আত্মসম্পূর্ণতার মনোভাব। যদিও যুক্তি দিয়ে এদের পার্থক্যটি সহজেই ধরা পড়ে, তবুও বেশির ভাগ আদিম ধর্মে এমনকি অনেক উন্নত ধর্মেও প্রার্থনা এবং মন্ত্র পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে আনার ক্রমিক প্রণালী হল ধর্মীয় বিবর্তন। এটি এমন একটি প্রণালী যা কখনোই সুসম্পূর্ণ হয় না। অবশ্য মানুষের বৌদ্ধিক এবং নৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথকীকরণেরও উন্নতি হয়েছে। এই প্রণালীর অন্য দিকটি হল প্রার্থনীয়ের প্রতি প্রার্থনাকে ক্রমাগত অধ্যাত্মীকরণ। আদিম যুগে পার্থিব প্রয়োজনের জন্যই

প্রার্থনা করা হত। উন্নততর ধর্মেও এই ধরনের প্রার্থনার অভাব নেই। 'আজ আমাদের আজকের রুটিটি দাও'। টেলরের (Tylor) মতে সংস্কৃতির আদিম অবস্থায় কোথাও নৈতিক মঙ্গলের জন্য বা সুন্দর জীবনের জন্য যেমন ক্ষমা কর, সাহায্য কর জাতীয় প্রার্থনা দেখা যায়নি।* কিন্তু ক্রমশঃ নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাড়তে লাগল। বিশেষ কোন প্রয়োজনের জন্য আবেদন না করে ঐশ্বরিক ইচ্ছার আনুগত্য এবং ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা লাভই প্রার্থনার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। আত্মার শুদ্ধতার উপর ক্রমশঃ গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে লাগল। এবং চিন্তা ও উদ্দেশ্যের সংযম হয়ে উঠল প্রকৃত প্রার্থনার অনিবার্য শর্ত। জাপানী শিক্ষার দেবতা তেমাঙ্গু তাঁর দৈববাণীতে বলেছেন—'তোমরা যারা আমার কাছে তোমাদের বাসনা পূরণ করার আশায় এসেছো, মিথ্যে থেকে হৃদয়কে শুদ্ধ কর, অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ পরিষ্কার কর, যাতে সত্য আয়নার মত প্রতিবিম্বিত হতে পারে'। প্লেটো সক্রেটিশকে দিয়ে প্রার্থনা করিয়েছেন (phoedrus এ) 'যে সব দেবতারা এখানে আছ দেখ, তোমরা আমাকে আমার অন্তরে সৌন্দর্য দাও। মানুষ যেন অন্তরে বাহিরে এক হয়। আমি যেন জ্ঞানী ব্যক্তিদের ধনী ভাবতে পারি। একজন সুস্থ লোক যতখানি সহ্য করতে পারে (অর্থাৎ লোভী হয়ে না ওঠে) আমাকে ততখানি সোনা দাও।" প্রার্থনায় অনেক সময় একই শব্দ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয়। যার ফলে প্রার্থনার একটা রহস্যময় ক্ষমতা জন্মায়। প্রার্থী যেন তার ইচ্ছা জোর করে প্রার্থনীয়ের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। কিন্তু উন্নততর প্রার্থনা ত কেবল মন্ত্র পড়ে পরমেশ্বরের উপর ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা বিস্তার নয়, প্রার্থনা হল ঈশ্বরের উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য অথবা অসীমের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ মাত্র।

III—বিশ্বজনীন ধর্ম

বিবর্তনের একটি পর্যায়ে জাতি ও গোষ্ঠী অভিন্ন ছিল। আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে ঐ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। (যদিও আমাদের আলোচনা সব সময় ঐ সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি)। এই অবস্থায় ধর্ম ছিল জাতীয় জীবনের একটি দিক, রাষ্ট্রের একটি বিভাগ মাত্র। ব্যক্তিজীবনে ধর্মের ভূমিকা ছিল নিতান্ত গৌণ। ব্যক্তিগত রুচি বা তার পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি তখনো

* E. B. Tylor—Primitive Culture, vol. II, pp. 364 ff. cf.

ছিল অনুপস্থিত। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য এবং জাতীয় রীতিনীতির সঙ্গে সামাঞ্জস্য বিধানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত বিশ্বাস গড়ে উঠ্ত। মাতৃভূমি বা মাতৃভাষা নির্বাচন করার কোন সুযোগ যেমন ব্যক্তির হাতে নেই, তেমনি ধর্মের বিষয়েও মানুষের পছন্দ-অপছন্দের অবকাশ নেই [অর্থাৎ যে গোষ্ঠীতে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, সেই গোষ্ঠী-ধর্ম স্বাভাবিকভাবে অথবা অনিবার্যভাবে তাকে অনুসরণ করতে হয়। অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করার কোন স্বাধীনতা ব্যক্তির ছিল না] তাছাড়া উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রচারের দ্বারা ভৌগোলিক সীমার বাইরে জাতীয় ধর্মকে প্রসারিত করার কোন প্রবণতা তখনো দেখা দেয় নি। যুদ্ধে জয়লাভের ফলে জাতির ভৌগোলিক সীমা যখন বিস্তৃত হত, জাতীয় ধর্মের পরিধিও তখন বিস্তার লাভ করত। ক্রমে বিজিতগণ বিজেতাদের ধর্ম গ্রহণ করত। প্রাচীন দেবতাদের উপসনা তখন কুসংস্কার বলে বর্ণিত হত। বিজেতাদের ধর্ম এক সময় জনমন অধিকার করত সন্দেহ নেই। কিন্তু উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ধর্ম প্রচারের কোন উদ্যোগ তখনো দেখা যায় নি। অতীত ও বর্তমানের প্রায় সকল ধর্ম এই গোত্রের। ব্যতিক্রম কেবল বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টধর্ম ও ইসলামধর্ম। এই তিনটিকে বিশ্বজনীন ধর্ম বা প্রচারধর্মী ধর্ম বলা যেতে পারে। বৌদ্ধধর্মে, খৃষ্টধর্মে এবং ইসলাম ধর্মে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য উপদেশ আছে বলে দাবি করে। এই ধর্মগুলি কোন একটি দেশের সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে দূর দূরান্তে তাই ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে।

ধর্মের বিশ্বজনীনতার পেছনে যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল। হঠাৎ করে এর আবির্ভাব হয় নি। কিছু কিছু জাতীয় ধর্মে তখন এই ধরনের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। গ্রীস ও রোমান জগতে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত যে রহস্যময় ধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছিল তার মধ্যে বিশ্বজনীনতার লক্ষণ ছিল সুস্পষ্ট। ইস্রাইলে খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত মহান ধর্মযাজকেরা বিশ্বজনীন ধর্মের শিক্ষা দিয়েছিলেন। গ্রীস ও রোমান জগতে জাতীয় দেবতাদের প্রাচীন পদ্ধতিতে উপাসনা করা হত। কিন্তু সেই উপাসনা পদ্ধতি মানুষের গভীর আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে ব্যর্থ হত। তার ফলে ক্রমশঃ প্রাচীন উপাসনা পদ্ধতির স্থান রহস্যপূর্ণ ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। অবশ্য স্বেচ্ছায় এই বিষয়ে প্রাথমিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার পর এই অনুষ্ঠান-রীতি গ্রহণ করা যেতে পারত। এই ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ

কতকগুলি বিষয় এসেছিল বিদেশ থেকে। যেমন phrygia থেকে cybele এবং Attis ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি এবং মিশর থেকে সেরাপিস্ (serapis), অসিস (Asis) ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি এবং পারস্য থেকে মিত্র (Mithra) ধর্মানুষ্ঠান রীতি ক্রমশঃ ইউরোপে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বিশ্বজনীন ধর্ম অপেক্ষা এই সব ধর্মানুষ্ঠানে আবেগ ও উল্লাসের আতিশয্য ছিল। তাছাড়া এই সব ধর্মানুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উপাসকদের কোন একজন দেবতার সঙ্গে রহস্যময় ঐক্য সম্পর্ক স্থাপন করা এবং পরম সুখের অমরতার নিশ্চয়তা প্রদান করা। এ সম্পর্কে ধর্মগুপ্তি পালন করা হত। দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারত না। তা সত্ত্বেও এই রহস্যবাদীদের গুপ্ত সমিতি আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ যারা দীক্ষা নিয়ে এই ধর্মানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে চাইত (অবশ্য অপরাধীদের এবং অসভ্যদের কোন মতে গ্রহণ করা হত না) তাদের সকলের জন্য এর দ্বার ছিল উন্মুক্ত। প্রাচীন জাতীয় ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে এই ধর্মানুষ্ঠানগুলির পার্থক্য সুস্পষ্ট। সেগুলি ছিল নিজ সমাজ বা জাতির মধ্যে আবদ্ধ। আর এই ধর্মানুষ্ঠান অংশ গ্রহণেচ্ছু সকলের জন্য মুক্ত। প্রাচীন ধর্মানুসারে যে যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করত সে সেই জাতির বিশেষ ধর্মানুষ্ঠান ছাড়া অন্য কোন ধর্মানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারত না। দীক্ষা গ্রহণের পর এখন অন্য ধর্ম গ্রহণ করার বিধান জাতীয় ধর্মের গণ্ডীকে প্রশস্ত করল এবং বিশ্বজনীন ধর্মের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করল। মানুষ এ বিষয়ে ইচ্ছার নীতি (বিবেকের নির্দেশ) অনুসরণ করতে পারত। জাতির গণ্ডী আর কোন বাধা হতে পারল না। এইভাবে রহস্যময় ধর্মানুষ্ঠান নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও অদ্ভুত ভাবে (দীক্ষার ভিত্তিতে) প্রারম্ভিক বিশ্বজনীনত্বের সঙ্গে যুক্ত হল।

ইস্রাইলে এ্যামোস (Amos), ইশা (Isaiah) এবং দ্বিতীয় ইশার শিক্ষায় জাতীয় ধর্মানুষ্ঠান অপেক্ষা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অন্তরের বিশ্বাস বড় হয়ে উঠেছিল। এই সব ধর্মের সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক এমনভাবে সংযুক্ত হয়েছিল যে তাকে নির্দ্বিধায় বৈপ্লবিক ঘটনা বলা যেতে পারে। জারেমিয়া (Jeremiah) যখন ঘোষণা করেছিলেন, ঈশ্বর তাঁর শিষ্যদের নিয়ে 'নতুন ধর্মশালা' গড়ে তুলতে বলেছেন, তখনই ধর্মের ইতিহাসে 'আদর্শের বৃহত্তম এবং নবতম মূল্যায়ণ' হয়েছিল বলা যায়। 'আমি আমার আইন তাদের অন্তঃকরণে স্থাপন করবো, এবং তা তাদের হৃদয়ে লিপিবদ্ধ করে দেবো' (Jer. xxxi 31-34)।

ধর্ম যখন জন্মস্বত্ব বা বাহ্য অনুষ্ঠানের বিষয় না থেকে হৃদয় ও মনের বিষয় হয়ে উঠল তখনই তা প্রচ্ছন্নভাবে বিশ্বজনীনতা লাভ করল। যদি ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্ক আন্তরিকতা ও নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহ'লে যারাই সেই শর্ত পালন করবে তাদের সকলের জন্য ধর্মের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। জারেমিয়া অবশ্য ঠিক এই ধরনের কোন সিদ্ধান্ত করেন নি। কারণ তখনো তাঁর চিন্তা ইস্রাইলের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তবুও তাঁর 'নতুন ধর্মশালা'র ধারণার মধ্যে এই সিদ্ধান্তটি প্রচ্ছন্ন ছিল। একই সঙ্গে ইস্রাইলে আর একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। জেহোবা কেবল ইস্রাইলের নন, সমগ্র বিশ্বের একমাত্র ঈশ্বর। এই বিশ্বাসকে একেশ্বরবাদ বলা যেতে পারে। তিনি ইস্রাইলের মানুষের যেমন বিচার করবেন তেমনি আসিরয়া এবং ব্যাবিলোনের মানুষেরও বিচার করবেন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও শাসনকর্তা। পরবর্তী-কালে ইহুদীরা এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে এবং জুডাবাদ ক্রমশঃ একটি সংকীর্ণ বিশেষ মতবাদে প্রত্যাবর্তন করে। এইভাবে ইস্রাইলের ধর্ম বিশ্বজনীন খৃষ্টধর্মের বনিয়াদ গড়ে দিলেও নিজে জাতীয় ধর্মই থেকে যায়।

বৌদ্ধধর্ম ঃ বৌদ্ধধর্মই প্রথম শ্রেণী ও জাতির বাধা ভেঙ্গে সকল মানুষকে পরিত্রাণের পথ দেখিয়েছিল। যেমন খৃষ্টধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল জুডাবাদ থেকে, তেমনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তার সংস্কার সাধন করে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর ধর্ম। এই ধর্মে আছে অত্যন্ত শ্রমসিদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কৃচ্ছ্রতাসাধন এবং সর্বেশ্বরবাদী দূর কল্পনা। এটি একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যে তিনটি বিশ্বজনীন ধর্মই তিনজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অন্যান্য অসংখ্য জাতীয় ধর্মের কোন প্রতিষ্ঠাতার নাম জানা যায় নি। গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তিনি খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধে উত্তর ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। জগতের দুঃখ যন্ত্রণা গৌতম গভীরভাবে অনুভব করেন। এই দুঃখ কষ্টের প্রকৃত তাৎপর্য কি তা জানার জন্য এবং এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় আবিষ্কারের জন্য তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেন। তাঁর বিক্ষুব্ধ হৃদয় শান্তি লাভ করল যখন তিনি বুঝতে পারলেন জগৎ হল সম্পূর্ণ মায়া। এই মায়ার উৎপত্তি হয় তীব্র আবেগ ও কামনা-বাসনা থেকে। অবশেষে তিনি এই পরিজ্ঞান লাভ করলেন যে কামনা-বাসনাই সকল দুঃখের মূল। অতএব

দুঃখকষ্টের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের পথ বা মুক্তির পথ হল সকল বাসনাকে দমন করা।

এই নব আবিষ্কৃত মুক্তির পথ সকলের জন্য। যারাই এর শর্ত পালন করবে তারাই মুক্তিলাভ করতে পারবে। ধর্মীয় ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এখানে পাপ থেকে পরিত্রাণের কথা চিন্তা করা হয় নি। দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের কথা বলা হয়েছে মাত্র। যখন সকল আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা এমন কি বাঁচার আকাঙ্ক্ষাও লোপ পাবে, তখনই মানুষ নির্বাণ লাভ করতে পারবে। নির্বাণ হল সম্পূর্ণ নিস্পৃহ এক শান্তির অবস্থা। আগুন যেমন জ্বালানীর অভাবে নিভে যায়, তেমন আত্মচেতনার শিখাও কামনা-বাসনারূপ ইন্ধনের অভাবে নির্বাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে নির্বাণ মানে লয় নয়। আত্মার পরিসমাপ্তিও নয়। কারণ যা কখনো ছিলই না তার শেষ হবারও কোন সম্ভাবনা নেই। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আত্মা সম্পর্কিত অনেক ধারণাকেই বুদ্ধদেব অস্বীকার করেছেন। ব্রাহ্মাণ্য ধর্মে আত্মা দ্রব্য হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু বুদ্ধদেব তাও স্বীকার করেন নি। [হিউমও যেমন অস্বীকার করেছেন।] তাঁর মতে তথাকথিত আত্মা মায়া মাত্র। মানুষ কতকগুলো কামনা-বাসনার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষ যা করে তার মধ্য দিয়েই তার মনুষ্যত্বের প্রকাশ হয়। কর্মযোগই প্রকৃত সত্য। মানুষ যেমন কাজ করে তেমনি সে ফল লাভ করে। তার কর্মের শেষ বর্তমান জন্মে নাও হতে পারে। যতক্ষণ বাসনার না নিবৃত্তি ঘটে ততক্ষণ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে মানুষকে ঘুরতে হয়। এমন কি মৃত্যুর পরও পুনর্জন্ম গ্রহণ করলে পরজন্মের কর্মফল ভোগ করতে হয়। সচেতনতা থাকলেই দুঃখ থাকবে। আত্মা না থাকলেও যতক্ষণ পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা আবেগ প্রভৃতি অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ পুনর্জন্মের নিরবচ্ছিন্ন ধারাটি চলতেই থাকবে। চেতনার উপাদানগুলি মৃত্যুর পর আবার এসে একত্রিত হয়ে নতুন ব্যক্তির সৃষ্টি করবে এবং মানসিক দিক থেকে ভূতপূর্ব আত্মার সঙ্গে বর্তমান আত্মার ধারাবাহিকতা থাকবে। এইরূপে মানুষকে দুঃখপূর্ণ অনন্ত জীবন যাপন করতে হতে পারে। প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত ভবচক্রে মানুষ ঘুরতেই থাকবে। এই হল বুদ্ধদেবের 'সংসার' সম্পর্কিত মতবাদ।—আত্মার এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া। ঘুরেফিরে আবার এই সংসারে ফিরে আসা। বুদ্ধ অবশ্য সকলের জন্য আশার বাণী নিয়ে এসেছিলেন। ভবচক্র থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায়

তিনি জানিয়েছেন। কামনা-বাসনার অগ্নি নির্বাপিত হলেই মানুষের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তখন সে নির্বাণ লাভ করতে পারবে। এই বাণী সকলের জন্য। যে কেউ চাইবে সেই এইভাবে মোক্ষ লাভ করতে পারবে।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে মোক্ষলাভের এই পরিকল্পনায় দেবতাদের কোন ভূমিকা নেই। বুদ্ধ নীতিগতভাবে নাস্তিক ছিলেন না। কিন্তু তিনি দেবতাদের অস্বীকার করেছেন। ব্রাহ্মণ্য দর্শনের ব্রহ্ম সম্পর্কে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবতাদেরও তিনি কোন প্রয়োজন বোধ করেন নি। মানুষকে ভবচক্র থেকে মুক্ত করার কোন সাহায্য দেবতারা করতে পারেন না। কারণ তাঁরাও মানুষের মত একই ভাবে ভবচক্রে যুক্ত। বুদ্ধ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, মুক্তির জন্য মানুষকে নিজেই চেষ্টা করতে হবে। কোন দৈব সাহায্য সে পাবে না। প্রার্থনা একটা অন্তঃসারশূন্য ব্যাপার। উপাসনা নিরর্থক। বুদ্ধ যেহেতু মুক্তি বা মোক্ষের কথা বলেছেন তাই তাঁর শিক্ষাকে ধর্মীয় শিক্ষা বলা হয়। বৌদ্ধধর্মকে অনেকে ধর্ম বলেই স্বীকার করতে রাজী নন। কারণ এই ধর্মে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নেই; মোক্ষ-লাভের ক্ষেত্রে দেবতাদের কোন ভূমিকা নেই। কর্ম দেবতার ইচ্ছা নয়। কর্ম নৈর্ব্যক্তিক। এক ধরনের অল্প প্রয়োজন থেকে মানুষ কাজ করে। যেহেতু ঈশ্বর এর স্রষ্টা নন তিনি এর ধ্বংসও করতে পারেন না। অথবা মানুষকে এই চক্র থেকে নিষ্কৃতিও দিতে পারেন না। কিন্তু যদিও বুদ্ধের বাণী ধর্মহীন ও ঈশ্বরহীন, তবুও বৌদ্ধধর্ম এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ধর্ম হিসেবে স্বভাবতঃ ঈশ্বরবাদী কিম্বা বলা যেতে পারে বহুঈশ্বরবাদী। জীবন-সংগ্রামে সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা এবং অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার কাছ থেকে ঐ সাহায্য প্রার্থনার প্রবণতা মানুষের মর্মমূলে এত দৃঢ় আবদ্ধ যে তাকে উৎপাটিত করা অসম্ভব। প্রার্থনার আবেগকে যে মতবাদ রুদ্ধ করতে চাইবে সে মতবাদ কিছুতেই সাফল্য লাভ করতে পারবে না। ঠিক এইজন্যই বুদ্ধদেবের গূঢ় মতবাদ জগতের অন্যতম প্রধান ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিল [অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম প্রার্থনার আবেগকে রুদ্ধ করার চেষ্টা করে নি।] এমন কি স্বয়ং বুদ্ধদেব যিনি তাঁর শিষ্যদের উপাসনা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন তিনি বিশুদ্ধ ভক্তির প্রভাবে অনাদি অনন্তরূপে প্রকাশিত এক দৈবশক্তির আত্মিক সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। সেই অনন্তশক্তি উৎপীড়িত মানবতাকে

রক্ষা করার জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হন; মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং মানুষের মতই মৃত্যু বরণ করেন। বুদ্ধদেব যে মতবাদ অগ্রাহ্য করেছিলেন ধর্ম-হিসেবে বৌদ্ধধর্ম সেই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহ'লেও বুদ্ধদেবের মূল শিক্ষার গুরুত্ব বৌদ্ধধর্মে প্রবল। এখনো বৌদ্ধধর্মের আদর্শ হল আত্মার শান্তি, স্বপ্নহীন নিদ্রার মত শান্তি, মৃত্যুর মত সুগভীর শান্তি।

কালানুক্রমিকভাবে খৃষ্টধর্ম দ্বিতীয় বিশ্বজনীন ধর্ম। এই গ্রন্থে খৃষ্টধর্ম আলোচনার জন্য আমি অল্প একটুখানি জায়গা নিয়েছি। পাঠকরা যেন জায়গার মাপ থেকে খৃষ্টধর্মের গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা না করেন। যেহেতু এই ধর্ম তাদের সকলের খুবই পরিচিত, এই ধর্মের উৎপত্তি, ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্যগুলি সকলের জানা আছে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এখানে আমরা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা করব মাত্র। ধর্ম দুইটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্যও রয়েছে। উভয় ধর্মই প্রচারমূলক ধর্ম। উভয়েই বিশ্বজনীন। সমাজ, সম্প্রদায়, ও জাতীয় গণ্ডীকে উভয় ধর্মই অস্বীকার করেছে। বুদ্ধদেব বলেছেন, 'আমার নীতি সকলের পরিত্রাণের নীতি'। যীশু বলেছেন, "তোমাদের পিতা এক, তোমরা সকলে ভাই"। দুটিই পরিত্রাণের ধর্ম। উভয় ধর্মই সকলের পরিত্রাণের পথ নির্দেশ করেছে। উভয় ধর্মেই পার্থিব অপেক্ষা অপার্থিব আদর্শ উচ্চতর স্থান লাভ করেছে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বাস্তব ও পার্থিব জগতের বন্ধন থেকে মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছে। যীশু বলেছেন, 'একটি মানুষ যদি জগতের সাম্রাজ্য লাভ করেও নিজের আত্মাকে হারিয়ে ফেলে তবে সে কি লাভ করবে?' বুদ্ধ এবং যীশু আদর্শ হিসেবে, সহানুভূতি, ক্ষমা এবং ভ্রাতৃত্বের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দু'টি ধর্মেই প্রচারকের ব্যক্তিত্বের উপর অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বৌদ্ধধর্মের হৃদয় বুদ্ধ এবং খৃষ্টধর্মের আত্মা যীশু। তবুও দু'টি ধর্মের মধ্যে পার্থক্য অনেক এবং মনে হয় সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈশাদৃশ্যই গভীরতর। বুদ্ধদেব প্রথমে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর যতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার থেকে নিউ টেস্টামেণ্টে যীশু তার ভক্তদের জীবনকে অনেক বেশি প্রভাবান্বিত করেছেন। যীশু নিজেই পরিত্রাতা। তিনি ভক্তদের জন্য ঈশ্বরের ক্ষমা, দয়া ও অব্যাহতি লাভের মধ্যস্থতা করেন। অপর পক্ষে, বুদ্ধদেব ভক্তদের তাদের নিজেদের উপর ছেড়ে দেন। নিজেদেরকে নিজেদের

পরিত্রাতা হতে উপদেশ দেন। (কেবলমাত্র কি করে তা হওয়া সম্ভব সেই শিক্ষাটি তিনি দিয়ে দেন)। তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন, 'আনন্দ, তোমার তুমিই আলোকবর্তিকা হও। তুমিই তোমারি আশ্রয় হও। বাইরের কোন সাহায্য বা আশ্রয় তুমি কামনা করো না। আলোর মত সত্যের দিকে তাকিয়ে থাক। সত্যকে আশ্রয় কর। নিজের কাছে ছাড়া অপর কারো কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো না।' বিপরীত পক্ষে যীশু বলেছেন, 'আমার কাছে এসো তোমরা যত শ্রান্ত ক্লান্তের দল, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেবো'। 'আমিই জগতের আলো, আমিই সত্য, আমিই জীবন'। কিন্তু এই দু'টি ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নিহিত আছে অমঙ্গলের ধারণার মধ্যে এবং তার থেকে মুক্তির পথনির্দেশনায়। বৌদ্ধধর্মে প্রধান অমঙ্গল হল দুঃখ-কষ্ট। যতদিন অস্তিত্ব ততদিন দুঃখ। অতএব অস্তিত্ব নিজেই অমঙ্গল। অস্তিত্ব থেকেই মানুষের মুক্তি প্রয়োজন। কিন্তু খৃষ্টধর্মে অমঙ্গল স্বভাবতঃ নৈতিক। এখানে দুঃখ-কষ্ট অমঙ্গল নয়। অমঙ্গল হল পাপ। বৌদ্ধধর্মে মোক্ষ নেতিবাচক। মোক্ষ হল পার্থিব জগৎ থেকে সম্পূর্ণ অনাসক্তি। কারণ পার্থিব জগৎ মায়া মাত্র। অর্থাৎ ব্যক্তিকে তার সকল সংযোগ থেকে মুক্ত ও সম্পূর্ণ শূন্য করে ফেলা। পরিণামে ব্যক্তিসত্তাও শূন্যে পর্যবসিত হয়। (কারণ বিষয় ব্যতীত উদ্দেশ্য থাকে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সম্পর্ক ব্যতীত ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন ব্যক্তি থাকতে পারে না।) খৃষ্টধর্মেও মোক্ষ নেতিবাচক। যেমন 'রক্ত মাংসের সঙ্গে কামনা বাসনাও ধ্বংশকর' (Galv. 24) 'যদি কোন মানুষ আলাকে অনুসরণ করে, সে যেন নিজেকে অন্ধকার করে এবং নিজের ক্রুশ নিজেই গ্রহণ করে' (Math. XVI 24) কিন্তু এই নেতিবাচক পদ্ধতির একটা সদর্থক উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন, এর ফলে আধ্যাত্মিক জীবন বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ হয়। 'যারা আমার জন্য জীবন দেবে তারা তা লাভ করবে' (Math XVI 25) 'তাদের যাতে জীবন থাকতে পারে, অনন্ত জীবন থাকতে পারে তার জন্যই এসেছিলাম' (John X 10) জীবনধারণ করতে অস্বীকার করার এটাই হল আদর্শ। অর্থাৎ আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধি। কখনো কখনো দমন এবং কৃচ্ছ্রতা সাধনের দিকটির প্রতি যে খৃষ্টধর্মে জোর দেওয়া হয়েছে একথা সত্য। এবং তার ফলে খৃষ্টধর্মের ইতিবাচক দিকটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু আমরা খৃষ্টধর্মের মূল আদর্শ ততক্ষণ উপলব্ধি করতে পারবো না যতক্ষণ না আমরা

বুঝতে পারবো যে খৃষ্টধর্মের আদর্শ মানুষের ইচ্ছাকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া নয়, কেবলমাত্র মানুষের ইচ্ছাকে পবিত্র ও নম্র করে তোলা। তার ফলেই মানুষ ঈশ্বরের রাজত্বে সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে। বৌদ্ধধর্মে মোক্ষ হল সংগ্রাম থেকে পরিত্রাণ লাভ করা আর খৃষ্টধর্মে মোক্ষ হল জীবন-সংগ্রামে জয়ী হওয়া। যীশুর শিক্ষার প্রধান আদর্শ হল, 'ঈশ্বরের রাজত্ব'। এ বিষয়ে যত কথাই বলা হোক না কেন এটি মূলতঃ একটি সামাজিক আদর্শ। এর অর্থ হল মানুষ তার জীবনে যেন সে ঈশ্বরের নীতিকে গ্রহণ করে। বুদ্ধের আদর্শ হল সঙ্ঘ। এটি একটি অদ্বৈত আদর্শ। এই আদর্শ ব্যক্তিগত মুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পার্থক্যকে হফডিং (Hoffding) খুব সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করেছেন, 'বুদ্ধ এশিয়াকে শান্ত করে দিয়েছেন আর যীশু ইউরোপকে বিশালতর হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন"।*

ইসলাম হল তরুণতম বিশ্বজনীন ধর্ম। মহাপুরুষ মহম্মদ এই ধর্মমত প্রচার করেন। (প্রায় ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মক্কায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন)। যদিও অনেক পরে এই ধর্ম প্রচলিত তবুও অন্য দু'টি বিশ্বজনীন ধর্ম অপেক্ষা ইসলাম প্রকৃতিতে অনেক কম সর্বজনীন। বছরের পর বছর ধরে এই ধর্ম মূল সীমেটিক (semetic) এবং এমন কি আরবীয় চরিত্রটি পালন করে এসেছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করার মত এই ধর্মের প্রসারতা নেই। এটি একটি স্থিতিশীল ধর্ম। কোন রকম পরিবর্তন এই ধর্মে স্বীকৃত নয়। এমনকি আচার-অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটিগুলিও পরিবর্তনযোগ্য নয়। নতুনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের যে সুযোগ খৃষ্টধর্মে রয়েছে, ইসলামে তার একান্ত অভাব। এইসব গোঁড়ামী সত্ত্বেও (ধর্মপ্রচারের বা ধর্মান্তরকরণের) প্রবণতা এবং প্রচারের ব্যাপক সাফল্য এ ধর্মকে বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে। এই ধর্মে আরবের মুসলমান এবং ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য মহান ধর্মমতগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ইসলাম ধর্মে বিশেষ কোন অভিনবত্ব দেখা যাবে না। এই ধর্ম হল জুডাবাদের বিশেষ কয়েকটি দিক এবং অধঃপতিত খৃষ্টধর্মের কিছু ভ্রান্ত জ্ঞানের সংমিশ্রন†। ইসলাম ধর্ম খৃষ্টধর্ম অপেক্ষা সহজ বলেই সম্ভবত নিম্নসংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষদের বেশি প্রভাবিত করতে

* Hoffding, Philosophy of Religion (E Tr. 1906), P. 311

† ভূমিকা দেখুন।

পেরেছিল। কিন্তু খৃষ্টধর্মের ঈশ্বরের ধারণার থেকে ইসলামের ধারণা যে শ্রেষ্ঠ এবং ইসলাম ধর্মেই বৌদ্ধিক এবং সামাজিক প্রগতি যে অধিকতর হয়েছে এই সত্য প্রতিপন্ন করার জন্য জ্ঞান অপেক্ষা ক্ষমতার প্রয়োগই করতে হয়েছিল বেশি। এই ধর্মের বিশেষত্ব হল এখানে ঈশ্বরের একত্বের ও সার্বভৌমত্বের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যে কোন রকমের বহুঈশ্বরবাদী বা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আপোষহীন শত্রুতা এই ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য। "আল্লা ছাড়া কোন দেবতা নেই, মহম্মদ তাঁর আধার"। কিন্তু এই ধর্মে ঈশ্বর সম্পূর্ণ-রূপে অতিবর্তী। একজন প্রাচ্যদেশীয় এক নায়ককে খুব বড় করে দেখলে যেমন হয় ইসলাম ধর্মের ঈশ্বর তেমনি স্বেচ্ছাচারী, দায়িত্বজ্ঞানহীন। তিনি স্বর্গের সুলতান। তাঁর সর্বশক্তিমত্তার উপর অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের সকল কিছু তাঁর ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত। মানুষেরা আল্লার দান। সম্পূর্ণ রূপে তাঁর সম্পত্তি। ইসলাম শব্দটির অর্থ হল ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আনুগত্য প্রকাশ করা। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অর্থহীন। কারণ তাঁকে দেখাও যায় না, বোঝাও যায় না। ঈশ্বরের গুণের মধ্যে কোন প্রেম বা পবিত্রতার স্থান নেই। এমন অনেক মুসলমান থাকতে পারেন তিনি এই রুক্ষ মতবাদে তৃপ্ত নাও হতে পারেন। ইসলামের মধ্যে যে সব রহস্যবাদী সম্প্রদায় রয়েছে তাদের মধ্যে বরং ঈশ্বরকে অনেক অন্তরঙ্গ ও প্রেমময়রূপে কল্পনা করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

ধর্মের ঐতিহাসিক বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

টাইলে ধর্মকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। (a) প্রাকৃত ধর্ম (b) নৈতিক ধর্ম। গ্যালওয়ে ধর্মকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। (1) উপজাতীয় (2) জাতীয় এবং (3) বিশ্বজনীন।

1. উপজাতীয় ধর্ম

উপজাতীয় সমাজ আকৃতিতে ছোট কিন্তু সামাজিক বন্ধন ছিল দৃঢ়। সমগ্র গোষ্ঠী একসঙ্গে কাজ করত। যেন সমগ্র গোষ্ঠীই একটা ব্যক্তি। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ধারণা তখনো জন্মায় নি। সামাজিক রীতিনীতি পালনের মধ্যেই ব্যক্তিচিন্তা নিমজ্জিত ছিল। সামাজিক প্রথার একটা বাস্তব শক্তি তারা উপলব্ধি করত। প্রচলিত প্রথার প্রতি ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে আনুগত্য প্রকাশ করত। জীবন-সংগ্রামই তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্ধারণ করত। এই অবস্থায় ধর্ম পার্থিব প্রয়োজনের উর্ধ্বে উঠতে পারে নি।

সভ্যতার অতি আদিম স্তরে মানুষ প্রকৃতিতে রহস্যময় শক্তির উপস্থিতি উপলব্ধি করেছিল। সেই শক্তির প্রতি তাদের শ্রদ্ধাযুক্ত ভীতির আবেগ ছিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতাবিশিষ্ট অসংখ্য আত্মায় সমাকীর্ণ এই ধারণা থেকে ধর্মের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের সূচনা হয়েছে। সর্বপ্রাণবাদ প্রথম স্তর। তার পরের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির চিহ্ন দেখা গেল আত্মাবাদে।

ধর্মের ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন প্রগতির ইতিহাস নয়। অনেক পশ্চাৎগতির নিদর্শনও রয়েছে ধর্মের ইতিহাসে। যেমনঃ (1) ফেটিশবাদ—কোন একটি প্রাকৃতিক বস্তুতে আত্মা আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন তার কাছ থেকে মানুষ সাহায্য পেতে পারে। আত্মা আবার সেই বস্তুটি ত্যাগ করে চলে গেলেও যেতে পারে। তখন সেই প্রাকৃতিক বস্তুটি সাধারণ বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। এই বিশ্বাসের নাম ফেটিশবাদ। সাহায্য পাওয়ার জন্য ফেটিশের উপাসনা, তাকে ভয় দেখানো, প্রহার করা প্রভৃতি পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। (2) বহু আত্মা উপাসনাবাদ—চরাচর অসংখ্য আত্মায় পরিপূর্ণ। সেই আত্মাদের তিন ভাগে ভাগ করা যায় (a) সাধারণ প্রাকৃতিক জিনিস, যেমন নদী, হ্রদ, পাহাড় (b) মৃত মানুষের আত্মা (c) বিশাল প্রাকৃতিক বস্তু, যেমন—সূর্য চন্দ্র, আকাশ ইত্যাদি।

অনেকের মতে এই সকল আত্মার পশ্চাৎপটে একটি মাত্র আত্মার অস্তিত্বেও আদিম মানুষ সম্ভবতঃ বিশ্বাস করত। উপজাতীয় ধর্মে একেশ্বরবাদ না থাকলেও তার একটি প্রবণতা দেখা যায়।

উপজাতীয় ধর্মের ত্রুটি—(a) ভয়ের ভূমিকার প্রাধান্য। (b) সংকীর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ (c) আত্মারা দেবতা ছিলেন না, কারণ তাঁদের কোন স্বতন্ত্র চরিত্র ছিল না, এমন কি একটা নামও ছিল না (d) আত্মার সঙ্গে কোন নৈতিক গুণের সম্পর্ক ছিল না।

উপজাতীয় ধর্মের বিশেষত্ব—(a) অসম্পূর্ণ হলেও একটা আত্মার ধারণা তারা লাভ করেছিল। বর্তমান ধর্মমত সেই ধারণার সংস্কৃত রূপ। (b) উন্নত ধর্মেও সংকীর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবণতা নেই তা নয়। (c) উপজাতীয় ধর্মও সমাজে ঐক্য এনেছিল। (d) গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্যের ফলে রক্ষণশীলতা যেমন প্রশ্রয় পেয়েছে, তেমনি আত্মিক উন্নতির একটি পরিবেশও রচনা করেছে।

2. জাতীয় ধর্ম

কতকগুলি গোষ্ঠী এক হয়ে একটি বৃহৎ গোষ্ঠী গঠিত হল। বৃহৎ গোষ্ঠীকে জাতি বলে। সমাজের এই পরিবর্তনের ফলে ধর্মীয় চিন্তারও পরিবর্তন হল। বহুআত্মাবাদ বহুঈশ্বরবাদে রূপান্তরিত হল। অর্থাৎ আত্মাগুলি চরিত্রবিশিষ্ট এবং নৈতিক গুণযুক্ত হয়ে উঠল। তাঁরা ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হলেন। এবং একটি বিভাগের প্রধান হয়ে উঠলেন। যেমন—যুদ্ধের দেবতা, ভালবাসার দেবতা ইত্যাদি।

দেবতাদের ব্যক্তি হিসেবে কল্পনার ফলে দেবতাদের একটি সমাজেরও কল্পনা করা হল। তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের কাহিনী বা উপাখ্যান থেকে সৃষ্টি হল পুরাণ। পৌরাণিক কাহিনীগুলি সম্পূর্ণ যুক্তিনির্ভর না হলেও এখানে বুদ্ধির একটা ভূমিকা স্পষ্ট। ধর্মের এই আধা বৈজ্ঞানিক স্তর প্রায় সকল ধর্মেই দেখা যায়।

জাতীয় ধর্ম বিকাশের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ গতিভঙ্গী রয়েছে (1) দেবতাদের উপর নৈতিক গুণারোপ। (2) একেশ্বরবাদ অভিমুখী গতি। এর সঙ্গে তৃতীয় একটি গতিভঙ্গীও যোগ করা দরকার। তা'হল উৎসর্গ প্রার্থনা প্রভৃতি ধর্মীয় আচরণের উল্লেখযোগ্য ক্রমবিকাশ। এই তিনটি গতি মূলতঃ বিশ্বজনীন ধর্মের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করেছে।

3. বিশ্বজনীন ধর্ম

এতদিন পর্যন্ত মানুষ যে গোষ্ঠীতে অথবা যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করত সেই জাতির ধর্মবিশ্বাসে তারা স্বাভাবিকভাবে বিশ্বাসী হয়ে উঠত। ধর্মান্তরিত হওয়া বা অন্য ধর্মে বিশ্বাস করার কোন সুযোগ তাদের ছিল না। উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ধর্মপ্রচারের কোন উদ্যোগও তখন দেখা যায় নি। ক্রমে এমন কয়েকটি ধর্মমতের আবির্ভাব হল, যেগুলি কোন একটি দেশের সীমানায় আটকে না থেকে সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণের জন্য দূর দূরান্তের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। যেমন বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম। এগুলি প্রচারধর্মী ধর্ম। বিশ্বমানবতার কল্যাণ এদের লক্ষ্য।

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্মের স্বরূপ এবং অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ন্যূনতম দার্শনিক ব্যাখ্যা করে আমরা ধর্মের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাটি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। যতদূর সম্ভব বাস্তব দৃষ্টি-ভঙ্গী থেকে আমরা ঐ আলোচনা করেছি। আমাদের আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও তার থেকে দুটো জিনিস সম্ভবতঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমতঃ, ধর্ম বিভিন্নরূপে, বিভিন্ন-ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছে। কখনো যেমন সে স্থূল, অর্থহীন, নীচ আবার কখনো তেমনি সে নম্র, আদর্শবাদী এবং মানুষের হিতকর। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি আপাত অসুবিধার মধ্যেও আমরা ধর্মীয় প্রগতির একটি ধারা পরিষ্কারভাবে নির্ণয় করতে পেরেছি। অথবা বলা যেতে পারে আমরা সামগ্রিকভাবে ধর্মীয় প্রগতির পরিণতির পদ্ধতিটির অনুসন্ধান করতে পেরেছি। ধর্মের অগ্রগতি সর্বত্র সমানভাবে একমুখী হয় নি, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের ফলাফলও ভিন্ন রকম হয়েছে। কোথাও প্রগতি রুদ্ধ হয়েছে, কোথাও হয়েছে তা পশ্চাৎমুখী। তবুও সামগ্রিকভাবে প্রগতির ধারাটি অক্ষুণ্ণ থেকে সবকিছু ক্ষতি পূরণ করে দিয়েছে। তাই যদিও এখনো পৃথিবীর কোথাও কোথাও সর্বপ্রাণবাদ, ফেটিশবাদ এবং টোটেম-বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে, তবুও উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন অনেক মানুষ আজ ঐ সব স্থূল বিশ্বাসকে পেছনে ফেলে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে এবং তাদের মধ্যে উন্নতর এবং অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য আধ্যাত্মিক ধর্মের বিকাশ ঘটেছে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে ধর্মের অগ্রগতি যে হয়েছে এ কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়। অবশ্য ধর্মের এই প্রগতি জীবনের অন্যান্য দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্ভব হয় নি। বিশেষ করে সামাজিক সংগঠন ও সংস্কৃতির অগ্রগতির সঙ্গে ধর্মীয় অগ্রগতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। ধর্মের প্রগতি কখনো যেমন অন্যান্য প্রগতির ফলে ঘটেছে তেমনি কখনো অন্যান্য প্রগতির কারণও হয়ে উঠেছে। ধর্মের প্রগতির কথা প্রসঙ্গে ধর্মের মান বা মূল্যায়নের ভিত্তি অনুমানের প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ তার সাহায্যে আমরা কোন্‌টি উন্নত ধর্ম এবং কোন্‌টি অনুন্নত ধর্ম তা নির্ণয় করতে পারি। যেমন বহুঈশ্বরবাদকে আমরা সর্বপ্রাণবাদ অপেক্ষা উন্নততর বলে মনে করি আবার একেশ্বরবাদকে মনে করি বহুঈশ্বরবাদ অপেক্ষা উন্নততর। ধর্মের সংজ্ঞার উপর

ধর্মের মান নির্ভর করবে। একটি ধর্মকে অন্য ধর্ম অপেক্ষা তখনই উন্নততর বলা যাবে যখন সেই ধর্মবিশ্বাস ধর্মের প্রকৃত অর্থ এবং আচরণকে সুন্দরতর করে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

এখন তা'হলে আমাদের ধর্মের সংজ্ঞার বিষয়টি আলোচনা করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম কাকে বলে? এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে পর্বতপ্রমাণ তথ্য সংগ্রহ করেছি তাদের মধ্য থেকে একটি মাত্র অর্থ লাভ করা কি সম্ভব? ধর্মের মৌলিক উপাদানগুলি থেকে তার উপসর্গগুলিকে পৃথক করা যাবে কি? যদি সেরকম উপাদান আমরা খুঁজেও পাই, অর্থাৎ যদি আমরা সকল ধর্মের কোন অপরিবর্তনীয় স্থায়ী সাধারণ উপাদানের সন্ধান পাই তাহলেও তার সাহায্যে আমরা ধর্মের বিভিন্ন অবস্থার একটা বর্ণনাত্মক সংজ্ঞা দিতে পারি মাত্র। নাকি আমরা আরও একটু অগ্রসর হবো? বর্ণনাত্মক সংজ্ঞার ভিত্তিতে একটি আদর্শমূলক সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করবো, অর্থাৎ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা থেকেই কোন আদর্শ বা মান নির্ণয় করা কি সম্ভব হবে যার সাহায্যে আমরা বলতে পারবো ধর্মের আদর্শ কি, এবং সেই সঙ্গে সকল ধর্মবিশ্বাসকেও আমরা ঐ আদর্শ বা মান দিয়ে মূল্যায়ন করতে পারবো? এই প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করতে হলে আমাদের বৈষম্যের মধ্যে ঐক্যকে এবং ধারাবাহিকতার মধ্যে প্রগতিকে আবিষ্কার করতে হবে। কিন্তু এই অনুসন্ধান করতে গিয়ে চক্রক যুক্তিকে এড়িয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠবে। কারণ আদর্শের সাহায্যে যদি ধর্মের মৌল উপাদানগুলি নির্ণয় করা হয়, এবং আবার যদি ধর্মের মৌল উপাদানগুলির সাহায্যে ধর্মের আদর্শ অনুসন্ধানের চেষ্টা হয় তা'হলে যুক্তিটি অবশ্যই চক্রক দোষদুষ্ট হবে। আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হবে যদি প্রথমেই আমরা বর্ণনামূলক এবং আদর্শমূলক সংজ্ঞার পার্থক্যটি নির্ণয় করে ফেলতে পারি। অবশ্য একথাও ঠিক যে দু'টিকে সব সময় পৃথক করে রাখা সম্ভব নয়। আমাদের যুক্তি যদি কেবলমাত্র আকৃতিগত, পাণ্ডিত্যাভি-মানী বা নিষ্ফলা না হয় তাহলে আদর্শে আমরা চক্রক দোষকে এড়িয়ে যেতে পারবো কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ধর্মের মৌল প্রকৃতির সমস্যাটিকে দু'ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা প্রশ্ন করতে পারি অন্য কোন বিষয়ের সম্পর্ক ব্যতীত, স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম কি? তারপর মানুষের অন্যান্য আচরণের সঙ্গে ধর্মীয় আচরণের সম্পর্ক নির্ধারণ করে

ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারি। ধর্মযুক্ত এবং ধর্মহীন জীবনের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্যটি কোথায় ? জীবনের অন্যান্য দিক থেকে, বিশেষ করে যাদের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নিবিড় যেমন নৈতিকতা, কলা, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি…এদের থেকে ধর্মকে কি করে পৃথক করা যাবে ?

I

ইতিহাসে ধর্মসম্পর্কে এত বিভিন্ন রকম এবং এমন পরস্পর-বিরোধী মত দেখা যায় যে ধর্মের মৌলিক চরিত্রটি প্রকাশের চেষ্টা হয়ত বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। বিশেষ করে এক জটিল বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধর্মের বিকাশ হয়েছে বলে কাজটি আরও দুরূহ হয়ে পড়েছে। স্থিতিশীল কোন কিছু অপেক্ষা গতিশীল বিষয়ের সংজ্ঞা নিরূপণ করা অপেক্ষাকৃত কষ্টকর। তা সত্ত্বেও ধর্মের একটি স্বতন্ত্র ও সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য অবশ্যই রয়েছে। তা না হ'লে 'ধর্ম' কথাটি দিয়ে বিশেষ কোন অর্থ প্রকাশ করা যেত না। 'ধর্মীয় অভিজ্ঞতা'র বৈচিত্র্যের আলোচনা করতে গেলেও ধর্মীয় অভিজ্ঞতার 'সংজ্ঞা' নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। নিশ্চয়ই এমন কতকগুলো সাধারণ ধর্ম আছে যার মধ্যে বিশেষ ধর্মগুলি অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আরও একটু স্পষ্ট করে ধর্মের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যটি আলোচনার চেষ্টা করলে আমাদের বিভিন্ন রকম মতবাদের সম্মুখীন হতে হবে। অনেকে অনেকভাবে ধর্মের সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। জন মোরলে (Morley) বলেছেন, 'কথিত আছে ধর্মের দশ হাজার রকম সংজ্ঞা আছে'। এই উক্তিটি একটু অতিশয়োক্তি হতে পারে কিন্তু ধর্মের সংজ্ঞা যে অসংখ্য এবং বিচিত্র তাদের যথেষ্ট নিদর্শন এবং সুন্দর শ্রেণীকরণ অধ্যাপক লিউবার (Prof. Leuba)-র Psychological Study of Religion (P. 339—361) গ্রন্থের পরিশিষ্টে পাওয়া যাবে। ধর্মের স্বরূপ বা প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি বিখ্যাত ও প্রতিনিধি স্থানীয় মতবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে প্রয়োজন। দেখা যাবে প্রত্যেকটি মতবাদে কিছু না কিছু সত্য আছে। কিন্তু হয় তারা একদেশদর্শী নয়ত একটা জটিল বিষয়ের অতি সরলীকরণ দোষদুষ্ট।

ধর্মের কিছু কিছু সংজ্ঞা মানুষের মানস প্রকৃতির একটি দিকে ধর্মকে আবদ্ধ করে রাখতে চেষ্টা করে। এই সংজ্ঞাদাতাদের মধ্যে কেউ কেউ ধর্মকে ধীশক্তি থেকে উৎপন্ন বলে মনে করেন। যেমন হেগেলের (Hegel) মতে ধর্ম হল একটি জনপ্রিয় দর্শন। ধর্মীয় সত্যের উপলব্ধি হয় আবেগ ও

রূপকের মধ্য দিয়ে। আর প্রকৃত দর্শনে সত্য তার সংবেদনশীল পোশাকটি ত্যাগ করে। অর্থাৎ শুদ্ধ চিন্তার সহায়তায় দর্শন সত্যকে জানবার চেষ্টা করে। তিনি বলেছেন, 'ধর্মে সসীম মন অসীমের জ্ঞান লাভ করে'। আবার অন্যত্র ঐশ্বরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বলেছেন, 'অসীম জ্ঞান নিজেই সসীম আত্মার মধ্যে সঞ্চারিত হয়'। তাহ'লে ধর্ম হল এক রকমের জ্ঞান, পরম ব্রহ্মের জ্ঞান বা পরম জ্ঞান; অসীম ও সসীমের মধ্যে একটি চরম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এমন একটি জ্ঞান। হেগেল ধর্মের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তিনি যৌক্তিক ঐক্য ও সঙ্গতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তার ফলে ধর্মের মূল্যায়নের দিকটি অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু মূল্যায়নও ধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। হেগেলপন্থী ব্যতীত অন্য অনেক দার্শনিক আবার ধর্মকে এক ধরনের বিশ্বাস বলে অভিহিত করেছেন। যেমন টাইলর (Tylor) তাঁর বিখ্যাত 'ধর্মের ন্যূনতম সংজ্ঞায়' বলেছেন, 'ধর্ম হল অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস'। ম্যাক্স্‌মূলর (Max-Muller) বলেছেন, 'ধর্ম হল অসীমের প্রত্যক্ষণ বা অনুমান'।

অন্য অনেক দার্শনিক আবেগ বা অনুভূতির দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। শ্লায়ারমেকারের (Schleirmacher) বিখ্যাত সূত্রটি এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর মতে 'ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার অনুভূতিতেই ধর্মের মূল নিহিত'। শ্লায়ারমেকার মনে করেন, শুদ্ধ ধর্ম হল স্বচ্ছ অনুভূতি। এই অনুভূতি একদিক থেকে চিন্তার সঙ্গে যোগসূত্রহীন আবার অন্যদিক থেকে নৈতিকতা বা কোন ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীন। "ধর্মের জন্য জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নেই। জ্ঞান ছাড়াই ধর্মের প্রকৃতি জানা যেতে পারে।" 'একজন মানুষ যে কোন ধারণাই পোষণ করুক না কেন ধার্মিক হতে তাতে তার কোন বাধা নেই'। ধারণা, পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়গুলি ধর্মের ক্ষেত্রে বাহুল্য মাত্র। ধারণা ও পদ্ধতির যত কিছু সম্পর্ক তা হ'ল জ্ঞানের সঙ্গে। 'জ্ঞান জীবনের একটি পৃথক বিভাগ। ধর্মের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই'। ধর্ম আবার নৈতিকতা থেকেও স্বতন্ত্র। নৈতিকতা প্রকাশ পায় নিজ কার্যসাধনের দক্ষতার এবং আত্মসংযমের মধ্য দিয়ে। অপর পক্ষে পরমেশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ এবং আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে ধর্মবিশ্বাস প্রকাশিত হয়। নৈতিকতা স্বাধীনতার ধারণার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অর্থাৎ

স্বাধীনতাকে পূর্বশর্ত হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েই নৈতিক আলোচনা সম্ভবপর হয়। বিপরীত পক্ষে ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রয়োজনের কোন সম্পর্ক নেই। অতএব ধর্মবিশ্বাস বিজ্ঞান এবং অনুশীলনের (চিন্তা ও ইচ্ছা) মধ্য পথটি গ্রহণ করে জীবনের 'তৃতীয় অপরিহার্য দিক' রূপে পরিগণিত হয়। মূল্য এবং গৌরবের দিক থেকে জ্ঞান বা অনুশীলন অপেক্ষা ধর্ম কোন মতেই খাটো নয়।"* ধর্ম হল সসীমের মধ্যে অসীমের উপলব্ধি, এক নিবিড়, অন্তরঙ্গ তাৎক্ষণিক উপলব্ধি, সম্পূর্ণতার কাছে নির্ভরতার উপলব্ধি। শ্লায়ারমেকার (Schleirmacher) এক দিকে ঊষর বুদ্ধিবাদ থেকে অন্যদিকে শুষ্ক নৈতিকতার হাত থেকে ধর্মকে উদ্ধার করে এক মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। সরাসরি ঈশ্বরোপলব্ধির রহস্যময় গুহ্য পথটিও তিনি আবিষ্কার করেছেন। ধর্মের বিষয়ে আমরা আগেই অনুভূতির উপর সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেছি। শ্লায়ারমেকার ঠিকই বলেছেন, 'জ্ঞানের পরিমাণই ধর্মের পরিমাণ নয়।'

অন্ততঃ দুটি বিষয়ে শ্লায়ারমেকারের মতবাদ সমালোচনার যোগ্য। প্রথমতঃ, ধর্মে যে অনুভূতির কথা বলা হয়েছে তা কেবলমাত্র অনুভূতি হতে পারে না। অনুভূতির একটা কিছু না কিছু বিষয় থাকবে, ধারণা থাকবে। কিন্তু অনুভূতিকে প্রয়োজনীয় এবং তার বিষয়টিকে অপ্রয়োজনীয় বলা যায় না। জীবনে অনুভূতির সঙ্গে চিন্তা ও ইচ্ছা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধর্মীয় অনুভূতিকে তার বিষয় থেকে পৃথক করা যায় না। কারণ বিষয়টি বুদ্ধিগম্য, আচরণের বাহ্য প্রকাশ থেকে তাকে জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ, নির্ভরতার উপলব্ধিকে শ্লায়ার-মেকার (Schleirmacher) স্বতন্ত্রভাবে ধর্মীয় অনুভূতি বলেছেন। কিন্তু এই অনুভূতি অধার্মিকদেরও থাকতে পারে। এমন কি গৃহপালিত পশুদের মধ্যেও এই অনুভূতি থাকে। সুতরাং কেবলমাত্র নির্ভরতার সাহায্যে ধর্মীয় এবং অধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে পৃথক করা যায় না। তা ছাড়া যখন ঈশ্বর বা অসীমের উপর নির্ভরতার কথা বলা হয় তখনই অনুভূতির সঙ্গে একটি বিষয়ের কিংবা যতই অস্পষ্ট হোক একটি ধারণার সঙ্গে অনুভূতির সংযোগ ঘটে।

* এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ তাৎপর্যটি বুঝতে গেলে যে প্রসঙ্গে এটি আলোচিত হয়েছিল সেটি জানা প্রয়োজন। তার জন্য Caldecott এবং Mackintosh সম্পাদিত Selections from the Literature of Theism (1904) গ্রন্থের 256—304 পৃষ্ঠা দেখুন।

সুতরাং ধর্ম কেবল শুদ্ধ অনুভূতির বিষয় নয় একথা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে। এবং সেই সঙ্গে এও বলা যেতে পারে যে ধারণা ধর্মে অবাঞ্ছিত নয়।

অনেকে আবার নৈতিকতার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ধর্মের সংজ্ঞা দানের চেষ্টা করেছেন। বস্তুতপক্ষে তাঁরা নৈতিক চেতনাকে ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে এক করে ফেলেছেন। কাণ্ট (Kant) এর দেওয়া ধর্মের সংজ্ঞা এই প্রচেষ্টার প্রাচীন নিদর্শন। তাঁর মতে 'দৈব নির্দেশ হিসেবে সকল কর্তব্য সম্পাদন করাই হল ধর্ম'। ম্যাথু আর্ণল্ড (Metthew Arnold) কাণ্টের মতই নৈতিকতাকে গুরুত্ব দিলেও কিছুটা আবেগ তার সঙ্গে যোগ করে দিয়েছেন। তাঁর মতে 'ধর্ম হ'ল আবেগের স্পর্শযুক্ত নৈতিকতা'। আমরা পরে ধর্ম এবং নৈতিকতার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবো। বর্তমানে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে ধর্ম এবং নৈতিকতা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংযুক্ত। তাই তাদের একেবারে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করা যাবে না।

তাছাড়া কাণ্ট (Kant) এর ধর্মীয় ধারণায় ঈশ্বর বিষয়ক কোন রহস্যময় অভিজ্ঞতার স্থান নেই। অর্থাৎ প্রার্থনা, উপাসনা, শ্রদ্ধা প্রভৃতিও সেখানে অনুপস্থিত। কিন্তু এগুলিই হল ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য। এতক্ষণ যে সব সংজ্ঞার আলোচনা করা হল, সেগুলি সকলেই আংশিক সত্য। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে ধর্ম মানুষের স্বভাবের কোন একটি মাত্র অংশ অধিকার করে নেই। শ্রেষ্ঠ সত্তা বলে মানুষ যাকে স্বীকার করে, তাদের গন্তব্যস্থল তাঁরই কাছে বলে মানুষ বিশ্বাস করে। সেই সত্তার প্রতি মানুষের সমগ্র চেতনার একটা প্রতিক্রিয়া হয়। ধর্মের উৎপত্তি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা যখন মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করেছিলাম তখন আমরা এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম।

এখন আমরা ধর্মের সংজ্ঞা নিরূপণের কয়েকটি আধুনিক প্রচেষ্টার উল্লেখ করবো। সেলমন রেইনাখের (Salomon, Reinach) উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞাটি দিয়েই আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, "ধর্ম মানেই নিয়ন্ত্রণ ; ব্যক্তি-ইচ্ছার উপর নিয়ন্ত্রণ, কিংবা বলা যেতে পারে মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ। অবশ্য এই নিয়ন্ত্রণ কোন পার্থিব নিয়ন্ত্রণ নয়। ধর্ম যত উন্নত হয়, তার নিয়ন্ত্রণের পরিধিও তত বিস্তৃত হয়। আমি এইভাবে ধর্মের সংজ্ঞা দিতে চাই—আমাদের কর্মদক্ষতার স্বাধীন প্রকাশকে বাধাদান করে

যে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তার সমষ্টিকেই ধর্ম বলে"। তিনি মনে করেন 'সকল ধর্মের অপরিবর্তনীয় উপাদান হল এই দ্বিধা ও সংশয়। তিনি আরও বলেছেন মনে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয় থাকে তাদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। তাদের তিনি টাবু (Tabu) বলেছেন। অর্থাৎ এই সংশয়গুলি সম্পূর্ণরূপে যথেচ্ছ ও যুক্তিহীন'।* এই সংজ্ঞাটির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এখানে ধর্মের নেতিবাচক দিকটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারিক প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত নয়। কিন্তু আমাদের কর্মদক্ষতার স্বাভাবিক ও স্বাধীন বিকাশের ক্ষেত্রে অহেতুক অন্তরায়। এই নিষেধকেই ধর্মের মূল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু সকল ধর্মকে 'টাবু'র নিয়মে ব্যাখ্যা করলে তাতে অন্তর্দৃষ্টির অভাবই সূচিত হয়। ধর্মের প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান করাও সম্ভব হয় না। যথেচ্ছ ও অযৌক্তিক বিধি-নিষেধ ধর্মীয় জীবনের একটা বড় অংশ যে দখল করে রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে ধর্মের অনুন্নত অবস্থায় অযৌক্তিক বিধিনিষেধের প্রাধান্য বড় বেশি ছিল। কিন্তু আদিম সমাজে ও জীবনের বাস্তব প্রয়োজনে, অথবা বলা যেতে পারে জীবন-সংগ্রামে যতদিন কাজে লাগত তত দিনই 'টাবু' বেঁচে থাকতে পারত। আদিম 'টাবু'কে নিয়েও মানুষ কম ভাবনা-চিন্তা করে নি। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর আদিম মানুষ 'টাবু' নির্বাচন করত। (অবশ্য আদিম মানুষের পক্ষে যতটা চিন্তা করা সম্ভব হত)। অভিজ্ঞতার সাহায্যে যেগুলিকে প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে তারাই কেবল টিকে গেছে। একথা অনস্বীকার্য যে অযৌক্তিক বিধি-নিষেধ প্রগতির পরিপন্থী।

এমন কি অনেক উন্নত ধর্মেও বিধি-নিষেধের উপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু ধর্মের কাজ হল প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধগুলিকে স্বাধীনতার আনন্দে রূপান্তরিত করা। 'যে এই জীবন ত্যাগ করল সেই এ জীবন পাবে'। 'আমি এসেছি, যাতে তোমরা জীবন পেতে পার, একটি পরিপূর্ণ জীবন পেতে পার'। সুতরাং ধর্ম আমাদের কর্মদক্ষতা প্রকাশের উপর যথেচ্ছ বিধিনিষেধ আরোপ ত করবেই না, বরং জীবনকে ক্রমশঃ পূর্ণ থেকে পূর্ণতর করে তুলবে, আত্মোপলব্ধি ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়তা করবে। যাঁরা ধর্মকে জীবনাকাঙ্ক্ষা পূরণের এবং আত্মবিকাশের উপায় বলে মনে করেন তাঁরাই ধর্মের প্রকৃত স্বরূপের অনেকটা যথার্থ ব্যাখ্যা দান করেন। বিপরিত পক্ষে যাঁরা মনে করেন ধর্ম

* Salomon Reinach, Orpheus (E. Tr. 109), P.3

আত্মাকে সংকীর্ণ করে, সঙ্কুচিত করে বা অবসন্ন করে ফেলে তাঁরা সত্য থেকে অনেক দূরে থেকে যান। রেইনাখের (Reinach) সংজ্ঞাটিকে অনুন্নত ধর্মের বর্ণনা হিসেবে যদিও গ্রহণ করা যায় তাহ'লেও তাকে আদর্শগত সংজ্ঞা হিসেবে স্বীকার করা যায় না।

বিষয়টির আরও গভীরে প্রবেশ করতে হলে আমাদের আরও কয়েকটি আধুনিক সংজ্ঞার আলোচনা করা প্রয়োজন। অনেকে মূল্যের ধারণা থেকে ধর্মের সংজ্ঞা নির্ণয় করায় চেষ্টা করেছেন। অনুভূতির সাহায্যে ধর্মের সংজ্ঞাদানের প্রচেষ্টার সঙ্গে আধুনিক প্রচেষ্টার অনেকখানি সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু 'মূল্যের ধারণা' শ্লায়ারমেকারের (Schleirmacher) বিশুদ্ধ অনুভূতি অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ও তাৎপর্যপূর্ণ। অভিজ্ঞতার অন্যতম উপাদান হল উদ্দেশ্য। এই উপাদানটি 'মূল্যের ধারণায়' স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। 'মূল্যের ধারণা'ই বর্তমান চিন্তাধারার মৌলিক নীতি। প্লেটো (Plato) মঙ্গলকে চরম ধারণা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। প্লেটোর এই মতবাদের মধ্যে মূল্যের ধারণা প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। কিন্তু আধুনিক কালে কাণ্ট (Kant) এর থেকেই এই আলোচনার সূত্রপাত হয়। কাণ্টের বিখ্যাত উক্তি হল, 'শুভ ইচ্ছা কোন কিছু ছাড়াই শুভ'। 'রত্নের মত নিজের আলোকে নিজে ভাস্বর'। তিনি চরম মূল্যের মতবাদে বিশ্বাসী। এই মতবাদের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তির নৈতিক শৃংখলা এবং আদর্শ জগতের ধারণা গড়ে ওঠে। বাস্তব জগতে কার্য-কারণ সম্পর্ক ও পরিমাণগত সম্পর্কের উপর নির্ভর করে 'প্রকৃত জগতের ধারণা' পাওয়া যায়। কিন্তু এই 'প্রকৃত জগতের ধারণা' ও আদর্শ জগতের ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ হয়ে ওঠে। অবশ্য মানুষের মূল্যবোধ বা মূল্যোপলব্ধির পর যে সত্তাটির ধারণা জন্মায় তার থেকে আদর্শের ধারণা অনেক বেশী বিমূর্ত। সেইজন্যই সম্ভবত Herbert Lotza, Ritschel প্রমুখ দার্শনিকগণ 'মূল্যের ধারনা'কে দার্শনিক আলোচনার বিষয় করে তুলেছেন এবং সেই সঙ্গে বর্ণনার মনোবৃত্তির সঙ্গে মূল্যায়নের মনোবৃত্তির যে একটা পার্থক্য রয়েছে সেই বিষয়টি আলোচনারও একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। লোট্জা (Lotza) মূল্যায়নের প্রণালীর সঙ্গে অনুভূতিকে যুক্ত করেছেন। (কাণ্ট রূঢ় ভাবে যা বাদ দিয়েছিলেন)। লোটজা (Lotza) লিখেছেন, 'আমরা মঙ্গল বলতে যা বুঝি তা সম্পূর্ণরূপে নিহিত আছে তৃপ্তির অনুভূতির মধ্যে, অথবা

সেই অনুভূতির ফলে আমরা যে আনন্দ পাই তার মধ্যে'* । যখন অনুভূতির গুরুত্বই স্বীকার করা হচ্ছে তখন আমাদের পরামর্শ হল—মূল্যের ধারণাকে নিষ্ক্রিয় সুখ-দুঃখের অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত না করে, মানুষের সংগঠিত কামনা বাসনা এবং সক্রিয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে, যাকে এক কথায় বলা যেতে পারে, ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত করাই ভাল। ডাঃ প্রিঙ্গল প্যাটিশনের (Dr. Pringle Pattison) ভাষায়, 'আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষা এবং গভীরতম চিরস্থায়ী বাসনা নিবৃত্তির তৃপ্তি যাতে প্রতিবিম্বিত হয়, তাকেই 'চরম মূল্য বলা যায়'† ।

পরম সত্তার মতবাদের সঙ্গে 'মূল্যের ধারণার' সম্পর্ক পরে আলোচনা করা যাবে। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় পরম সত্তা সম্পর্কিত মতবাদ নয়, আমাদের আলোচ্য বিষয় হল ধর্মের স্বরূপ। মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের সংজ্ঞার প্রথম নিদর্শনটি পাওয়া যায় হ্যারল্ড হফডিং (Harold Hoffding)-এর লেখা Philosophy of Religion গ্রন্থে। এখানে সম্পূর্ণরূপে মূল্যের দৃষ্টি-কোণ থেকে ধর্মের সংজ্ঞাটি অনুমিত হয়েছে। হফডিং-এর মূল বক্তব্য হল, 'মূল্যের নিত্যতার উপর আস্থাই ধর্মের প্রধান উপাদান। তিনি বলেছেন, "মূল্যের নিত্যতাই হল ধর্মের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বতঃসিদ্ধ" (পৃঃ 10)। মূল্য বলতে কোন বস্তুর গুণকে বোঝায়। তার দ্বারা তাৎক্ষণিক পরিতৃপ্তি লাভ করা যেতে পারে, অথবা পরিতৃপ্তি লাভের সেটি একটা পন্থাও হতে পারে (পৃঃ 12)। "ধর্মের প্রকৃত উপাদান হিসেবে ব্যাপকতার কোন গুরুত্ব নেই। অস্তিত্বের মূল্যায়নই সব কিছু। ধর্মীয় ধারণা সেই সব বাস্তব অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যার থেকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যটি লাভ করা সম্ভব। কারণ ধর্ম এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে জগতে মূল্যের কোন বিনাশ নেই (পৃঃ 6)। আমি 'মূল্যের নিত্যতা' শব্দটি এইজন্য ব্যবহার করেছি, যার ফলে 'শক্তির নিত্যতা' কথাটির সঙ্গে এর সাদৃশ্য বোঝানো যায়। অর্থাৎ সকল পরিবর্তনের মধ্যেও মূল্যের নিত্যতা স্বতঃসিদ্ধ" (পৃঃ 11)। হফডিং (Hoffding)-এর মতে সকল ধর্মের বিপরীত মতবাদ হল প্রকৃতিবাদ। কারণ মূল্য সম্পর্কে জগতের অপরিসীম অনাসক্তিতে প্রকৃতিবাদ আস্থাশীল (পৃঃ 228)।

---

* Hermann Lotza, Outline of Philosophy of Riligion Conybeare's trans. (1892), P. 123

† The Idea of God in the Light of Recent Philosophy (1917), P 335.

হফ্‌ডিং (Hoffding) ধর্মীয় অভিজ্ঞতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করেছেন। মানুষের ধর্মীয় চেতনা একটি বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই বিশ্বাসটি হল, মানুষের মূল্যবোধের পেছনে একটি সহানুভূতিশীল জগৎ আছে। মানুষের মূল্য উপলব্ধির এবং সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় সেই জগৎ সহায়তা করে। মানুষ ভাল করে জানে তার একক প্রচেষ্টায় মঙ্গলের উপলব্ধি করা তার পক্ষে কোন মতে সম্ভব নয়। যে জগতে মানুষ বাস করে সেই জগতের অনন্ত সম্পদের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব করার ক্ষমতা তার নেই। সে নিজে সেই জগতের নগন্য অংশমাত্র। সর্বোত্তম মূল্য সংরক্ষণের জন্য মানুষের সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। ধর্মবিশ্বাস সৎ হওয়ার জন্য মানুষের সামর্থ্যের উপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল নয়। আদর্শলাভের চেষ্টাকে যে শক্তি সুনিয়ন্ত্রিত করে তার উপরেই সে আস্থা স্থাপন করে। মানুষ বিশ্বাস করে যে প্রত্যেকে যে যার সাধ্যমত চেষ্টা করে, কিন্তু সহানুভূতিশীল জগৎ লক্ষ্য রাখে যাতে কোন প্রচেষ্টাই না ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। মূল্যের নিত্যতার ধারণা সম্ভবত ব্রাউনিং-এর (Browning) Abt Vogler-এ অপূর্ব সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

তাই অনির্বচনীয় তুমি, তোমাকে ছেড়ে কার কাছে যাই?
আমাদের বাসস্থান, সেত তোমারই নির্মাণ,
তুমি স্রষ্টা, তুমি শিল্পী।
সদা অপরিবর্তনীয় তুমি, আমার পরিবর্তনে কি ভয়?
সন্দেহ কি, যে হৃদয় তোমার শক্তির দ্বারা প্রসারিত,
সে হৃদয় তোমার শক্তিতে সম্পূর্ণ হবে?
মংগল হারিয়ে যাবে না কোন কালে,
যা ছিল থাকবে ঠিক পূর্বের মতন।
অশুভ ও শূন্য, অসার; মঙ্গলের শর্ত সে যে,
যেমন শব্দের শর্ত ঘোর নীরবতা।
মর্তে যেগুলো ভগ্ন বৃত্তচাপ, স্বর্গে তাই হয়ে
যাবে পরিপূর্ণ বৃত্ত।
আমাদের সুখ স্বপ্ন, শুভ ইচ্ছা, কিংবা
উদ্দীপিত আশা, থাকবে—চিরকাল
সাদৃশ্যে নয়, নিজরূপে……

কণ্ঠ হতে যে সুর নিঃশেষ হয়েছে
সঙ্গীতশিল্পীর জন্য সেই সুর বেঁচে থাকবে,
যখন ক্ষণকাল চিরকাল হয়ে উঠবে।
উচ্চ যার অত্যুচ্চতা প্রমাণিত, বীর্য, পৃথিবীর
কাছে যা খুব কঠিন।
ধরণীতে ফেলে যাওয়া প্রেম, যা ধূলায় লুটায়,
প্রেমিক ও বিহঙ্গের কণ্ঠে তাই গান হয়ে যাবে;
নিবেদিত হবে ঈশ্বরের কাছে।
তিনি একবার শুনলেই হল, আমরা শুনতে
থাকব, ক্রমে ক্রমে বার বার।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের ধর্মবিশ্বাস প্রকৃতির কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। মানুষের হৃদয়ের সহস্র আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এই বিশাল বিশ্ব সুনিশ্চিত করবে এবং তার প্রত্যাশা পূরণ করবে এই প্রত্যয় মানুষের আছে। ধর্ম-চেতনার এই পূর্বকল্পটির যথার্থতার আলোচনা আমরা এখানে করবো না। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করবো। এখানে আমরা কেবল এই পূর্ব-কল্পনাটির উল্লেখ করছি এইজন্য যে এর মধ্যে একটি প্রত্যয় নিহিত আছে। সেই প্রত্যয়টি হল—শুভ বা মঙ্গলের নাশ নেই। যে ঈশ্বর মানুষের হৃদয়কে প্রসন্ত করেছেন তিনিই তা পূর্ণ করতে সমর্থ। যে বিশ্ব-নিয়ম মানুষের মনে অনন্ত বাসনা জাগ্রত করে, সেই নিয়মের মধ্যে বাসনার স্থায়ী চরিতার্থতার পন্থাটিও নিহিত রয়েছে। অন্য ভাষায় বলা যায়—মানুষের 'মূল্যের ধারণা' এবং পরম সত্তা একটি ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ। ধর্মীয় বিশ্বাস যখন এই অনুমানের উপর নির্ভর করে কাজ করে, তখন সে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দূরে সরে যায়। বিজ্ঞান তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যকে অপ্রাসঙ্গিক ভেবে অগ্রাহ্য করে। বিজ্ঞান বিশ্ব নিয়মকে পরিমাণগত সম্পর্কের পদ্ধতি দিয়ে সীমাবদ্ধ করে। এই পদ্ধতির সঙ্গে গুণগত সম্পর্কের কোন যোগ নেই। কিন্তু গুণগত সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই মানুষের সৌন্দর্যচেতনা, নৈতিকতার ধারণা এবং ধর্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছে। অবশ্য ধর্মীয় চিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কারণ তাদের চিন্তার পদ্ধতিই এক নয়। বিজ্ঞান করে বর্ণনামূলক আলোচনা, আর ধর্ম করে আদর্শমূলক আলোচনা। তারা পরস্পরের সম্পূরক। তবুও

অবশ্য ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে অধিকতর ব্যাপক ও মৌলিক বলে মনে করা হয়। বরং কিছু কিছু দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাসের যথেষ্ট বিরোধ রয়েছে। বিশেষ করে যে সব দার্শনিক মতবাদ তত্ত্ববিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে তাদের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ খুবই স্পষ্ট। যেমন জড়বাদ। এই সব মতবাদ অনুসারে মানুষের মূল্য সম্পর্কে বিশ্বনিয়ম শত্রুভাবাপন্ন না হলেও অন্ধের মত নিরপেক্ষ। তথাকথিত মূল্যের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এগুলি ব্যক্তিগত ধারণা বা ভ্রমদর্শন মাত্র। 'বিশ্ব প্রকৃতি নিরাসক্ত' এই মতবাদের সঙ্গে ধর্মীয় মানসিকতার বিরোধ আপোসহীন। কারণ ধর্ম বিশ্বাস করে যে বিশ্বপ্রকৃতি মূল্য সংরক্ষণের জন্য এবং মূল্য উপলব্ধির জন্য মানুষের সহায়তা করে।

আমরা এতক্ষণ সাধারণভাবে হফ্‌ডিং (Hoffding)-এর মতবাদকে সমর্থন করেছি। এখন আমরা, হফ্‌ডিং যে ভাবে তাঁর বক্তব্যটি উপস্থাপিত করেছেন তার কিছু সমালোচনা করবো।

1. হফ্‌ডিং (Hoffding)-এর 'মূল্যের নিত্যতার' মতবাদটি ধর্মীয় চেতনার সক্রিয়তার এবং উদ্দেশ্যপ্রবণতার ব্যাখ্যা করতে পারে না। তিনি ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে অনুভূতির সঙ্গে এক করে ফেলেছেন। ইচ্ছার সঙ্গে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কোন সম্পর্ক তিনি স্বীকার করেন নি। "ধর্মীয় অভিজ্ঞতা মূলতঃ ধর্মীয় অনুভূতি" (পৃঃ 106)। "জীবন-সংগ্রামে মূল্যের দ্বারা যে অনুভূতি নির্ধারিত হয় তাকেই ধর্মীয় অনুভূতি বলে' (পৃঃ 107)। কিন্তু হফ্‌ডিং নিজেই বলেছেন, মানুষ কেবল দ্রষ্টা নয় কর্তাও। এবং ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সক্রিয়তা একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। তাঁর মতবাদ কিন্তু পরে তাঁর এই কথার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে পারে নি। বস্তুতপক্ষে মূল্যের নিত্যতা সম্পর্কে মানুষের নিষ্ক্রিয় বিশ্বাসকে ধর্ম বলে না। ধর্ম হল নতুন মূল্য সম্পর্কে পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান। পুরানো মূল্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কোন নতুন মূল্য নয়। এই অর্থে ইতিহাসে নতুন কিছু নেই। কিন্তু নতুন এই অর্থে যে পুরানো মূল্যগুলি তখন আরো গভীরতা প্রাপ্ত হয়, আরও সমৃদ্ধ-শালী হয়ে ওঠে এবং সেই নতুন ক্ষেত্রে জীবন আরও বিস্তৃতি লাভ করে। ধর্ম-চেতনা 'যেমন আছে' তাতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। হফ্‌ডিং (Hoffding) 'নৈতিক নিত্যতার' ধারণার সঙ্গে 'শক্তির নিত্যতা'র ধারণার উপমা দিতে গিয়ে

এই অসুবিধার সৃষ্টি করেছেন। শক্তির রূপান্তর হতে পারে কিন্তু তার পরিমাণের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু মূল্যের পরিমাণ অপরিবর্তনযোগ্য নয়। তার হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে। অধ্যাপক সোরলের (W. R. Sorley) ভাষায় "ধর্মীয় চেতনার দাবি হল নৈতিকতাকে অন্তর্ভুক্ত করা। তার ফলে মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক বর্দ্ধিত মূল্য এবং পরিশেষে মূল্যের সম্পূর্ণতাই হল নিত্যতার পূর্বকল্প"। বস্তুতপক্ষে নৈতিকতা মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মূল্যকে বিস্তৃত করে ধর্মের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায় যাতে তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ না হয়"।*

ধর্ম যে কিছুটা রক্ষণশীল সে কথা সত্য। হফ্‌ডিং এ কথার উল্লেখও করেছেন। "ধর্ম অত্যন্ত সংকীর্ণ মূল্যের ধারণা পোষণ করে। যে মূল্য একবার আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে চিরকাল সংরক্ষণ করতে চায়। কিন্তু মানুষ যখন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে, নতুন মূল্যের আবির্ভাব ঘটে, যদিও ধর্ম সব সময় তাতে বাধা দেয়, এক সময় তবুও সেই নতুন মূল্যকে সে ঠাঁই করে দেয় এবং তাকে সংরক্ষণ করতে থাকে।"† ধর্মের রক্ষণশীলতা সম্পর্কে সমালোচনা করা যেতে পারে কিন্তু 'সব সময় ধর্ম নতুন মূল্যের আবির্ভাবে বাধাদান করে, এই কথাটিকে একটু অতিশয়োক্তি বলে মনে হয়। নতুন মূল্যকে ধর্ম বাইরের চাপে পড়ে গ্রহণ করে আমরা অবশ্যই একথা স্বীকার করতে পারি না। অন্ততঃ অবতারদের ধর্মকে প্রগতিশীল বলে গণ্য করা যেতে পারে। একথা সত্য যে নৈতিকতা, কলা, বিজ্ঞান এবং দর্শন ধর্মের প্রগতিতে অনেক সহযোগিতা করেছে। কিন্তু এই সব শাস্ত্রে আবিষ্কৃত নতুন মূল্য ধর্মের উপর বাইরের থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় নি। আবার যেহেতু এই নতুন মূল্যগুলিকে গ্রহণ করতে ধর্ম দ্বিধা করেছে তার মানে এই নয় যে ধর্ম প্রগতির বিরোধী। গ্রহণ করতে পারে নি এইজন্য যে ধর্ম সক্রিয়ভাবে অন্য পদ্ধতির সাহায্যে জীবনের মূল্যের নব মূল্যায়ন, পুনর্গঠন এবং নতুন আবিষ্কারের কাজে নিযুক্ত ছিল। এমনকি ধর্ম নতুন স্বর্গ এবং নতুন মর্ত রচনা করতে চায়। ধর্মীয় চেতনা উদ্দেশ্য-পূর্ণ এবং সৃজনশীল; কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় ও চিন্তাধর্মী নয়।

---

* W. R. Sorley—Moral Values and the Idea of God (1918), pp 179, 181. সমগ্র সপ্তম অধ্যায়টি দেখুন।

† The Philosophy of Religion, P. 242

2. অপার্থিব সত্তা বা ঈশ্বরের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্কের মধ্যেই ধর্মীয় চেতনার মূল বৈশিষ্ট্যটি খুঁজে পাওয়া যায়। ঈশ্বরই সকল মূল্যের উৎস এবং আধার। হফ্‌ডিং (Hoffding)-এর সংজ্ঞার এই আন্তরিক সম্পর্কটি অবহেলিত হয়েছে। এই আন্তরিক সম্পর্ককে উপাসনার দ্বারা প্রকাশ করা যায়। আমরা জানি ধর্মের ইতিহাসে উপাসনার এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যে তাকে অবহেলা করা যায় না। ধর্মে সব সময় একটি উপাস্য থাকে। উপাসক উপাস্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। উপাস্যকে ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। উপাস্য নিজেই পরম মূল্য আবার তিনি অন্য সকল মূল্যের উৎসও। প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম ব্যবহারিক প্রয়োজনে নিরীশ্বরবাদী ছিল। কিন্তু যতদিন উপাস্য এবং উপাসকের সম্পর্ক বৌদ্ধধর্ম স্বীকার করে নিতে পারে নি, ততদিন তার বিস্তার সম্ভব হয় নি। স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে 'মূল্যের নিত্যতা'র ধারণা একটি নৈর্ব্যক্তিক এবং সার্বিক দার্শনিক মতবাদ। সেইজন্য এখানে ব্যক্তিগত আন্তরিক সম্পর্কের উত্তাপটি অনুপস্থিত। উপাসকের নিকট উপাস্যের অস্তিত্ব বাস্তব, প্রচলিত বিধি মাত্র নয়। অত্যন্ত শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী কারো সঙ্গে যদি কোন লোকের আন্তরিক বন্ধুতার সম্পর্ক থাকে এবং সেই সম্পর্কে তার যদি আস্থা থাকে তাহ'লে সেই লোকটির যে শক্তি এবং নিরাপত্তার ধারণা জন্মায় সেই নিরাপত্তা-বোধের সঙ্গে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার উপমা দেওয়া যেতে পারে। অথবা যদি কোন লোক জানে যে তার এমন একজন সহায় রয়েছে যে তার সকল শুভেচ্ছা ও শক্তি দিয়ে তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করবে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই লোকটির কামনা তার পক্ষে মংগলজনক বলে তার বন্ধু বিশ্বাস করবে, তাহ'লে সেই লোকটির বিশ্বাসের সঙ্গে ধর্ম-বিশ্বাসের তুলনা দেওয়া যেতে পারে। কিংবা বলা যেতে পারে শিশু যেমন করে তার পিতার ভালবাসাকে এবং শক্তির শ্রেষ্ঠতাকে বিশ্বাস করে উপাসকও উপাস্যের ভালবাসা এবং শক্তিকে তেমনি বিশ্বাস করে। কোন নৈর্ব্যক্তিক শক্তির নিত্যতার বিশ্বাসকে ধর্ম বলে না। ধর্ম হল এই প্রপঞ্চের পশ্চাতে এক বন্ধুর অস্তিত্বের উপর আস্থা স্থাপন। তিনিই আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। আমাদের জয়ী হওয়ার প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা তাঁর দুইই আছে। প্রার্থনা এবং উপাসনার মাধ্যমে আমরা জীবনের মূল্যবোধকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলি। এবং যে শক্তি ঐ মূল্যের আধার ও উৎস তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে মূল্যগুলিকে উপলব্ধি

করতে চায়। বিশ্বে এই বন্ধুসত্তার উপস্থিতির ধারণাকে কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব। আমরা দেখেছি রহস্যবোধ এবং ভয়মিশ্রিত বিস্ময় আদিম ধর্মের বৈশিষ্ট্য। মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবশ্য ঐ ধরনের 'ভয়মিশ্রিত বিস্ময়ের' অনুভূতির প্রসঙ্গ সাধারণত আসে না। কিন্তু যে লোকের সঙ্গে সম্পর্ক তিনি যদি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং মহান হন তাহ'লে ঐ অনুভূতি দু'টি মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দেখা দিতে পারে। ধর্মে সর্বদা রহস্যের উপাদানটি বর্তমান থাকে। প্রপঞ্চের পশ্চাতে যে রহস্যময় ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা মানুষের মূল্যের প্রতি নিরাসক্ত নয় বরং বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল, এবং যে সব কিছুর মধ্য দিয়ে সেই ক্ষমতার প্রতি (ঈশ্বরের প্রতি) ভালবাসা প্রকাশ পায় তার সবই ভাল,—এই বিশ্বাসগুলিই ধর্মবিশ্বাসকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনির্বচনীয় রহস্য, বিশ্বপ্রকৃতির (ঈশ্বরের) সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক এবং উপাসকের বিস্ময় ও বিশ্বাস (অথবা ভালবাসা) দিয়ে ধর্মীয় জীবনের সব কিছু গড়ে উঠেছে। উপজাতীয় ধর্মে জীবন নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির প্রতি বিশ্বাসটা বন্ধুত্বসুলভ ছিল না। অর্থাৎ আদিম মানুষ রহস্যময় ক্ষমতাকে বন্ধুর মত বিশ্বাস করত না। কারণ যে সব শক্তিকে তারা উপাসনা করত তারা ছিল অনিষ্টকারী এবং যথেচ্ছাচারী। অন্ততঃ আদিম মানুষ তাই বিশ্বাস করত। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা এও বিশ্বাস করত যে যদি তাদের ঠিকমত উপাসনা করা যায় তাহলে তাদের প্রসন্ন করে তোলা যেতে পারে। এবং তাদের কাছ থেকে শুভ ফলও লাভ করা যায়। ক্রমে যখন দেবতাদের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক ঘটল তখন তাঁদের অনিয়মিত বন্ধুত্বের মানসিকতা মোটামুটি স্থায়ী হিতৈষণায় পর্যবসিত হল এবং উন্নত ধর্মে এসে সেই বিশ্বাস 'ঈশ্বরই ভালবাসা' এই ধারণায় পরিণত হল। অপার্থিব সহানুভূতিশীল শক্তি মানুষকে সাহায্য করে, সেই শক্তি একজন ব্যক্তি, তাঁর সঙ্গে উৎসর্গ, উপাসনা এবং যথাযথ আচরণের সাহায্যে ঐক্যের সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব প্রভৃতি বিশ্বাসের উপর মনুষের নৈতিক মূল্যের নিত্যতা প্রতিষ্ঠিত।

ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে এখন আমরা আমাদের অভিমত সংক্ষেপে প্রকাশ করবো। ধর্মের একটি উদ্দেশ্য এবং একটি বিধেয় থাকে। অর্থাৎ একজন উপাসক এবং একজন উপাস্য থাকে। উদ্দেশ্যের দিক থেকে মানুষের সমস্ত মানস-ক্রিয়া যেমন—চিন্তা, ইচ্ছা, অনুভূতি, অপরদিকে অর্থাৎ বিধেয়ের দিকে থাকে

এক দৈব সত্তার অস্তিত্ব। এ ছাড়াও থাকে উপাসক ও উপাস্যের মধ্যে বন্ধুত্ব, উপাসনা প্রভৃতি সম্পর্ক। এই সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্য হল সামাজিক ও ব্যক্তিগত নৈতিক মূল্যের পরিবর্দ্ধন এবং সংরক্ষণ। যদিও চরম লক্ষ্য শ্রদ্ধা-ভক্তির সাহায্যে পরম সত্তাকে লাভ করা এবং তাঁকেই পরমমূল্য হিসেবে গ্রহণ করা। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত স্বচেতনতা মাত্র নয়। ধর্মে অতীন্দ্রিয় বিশ্ব বা বিশ্বনিয়মের উল্লেখ থাকে। সে জগতের অস্তিত্ব 'অন্তরে এবং বাহিরে', সেখানে নৈতিক মূল্যের সঙ্গে পরমসত্তা মিলে মিশে একাকার। এর থেকে অনুমান করা যায় যে একটা সম্পূর্ণ নৈতিক জগতের অধিকার আমাদের আছে। "দূরে মূল্যবান কোন কিছুর অস্তিত্বের নিশ্চয়তা এবং বর্তমানে তার উপর অধিকারেব ধারণাকে বিশ্বাস বলে। সকল যুগের সকল ধর্মের বৈশিষ্ট্যই হল বিশ্বাস। ধর্ম হল প্রত্যাশিত প্রাপ্তি"* এই প্রত্যাশা আমাদের সিদ্ধির পথে অন্তরায় হয় না, বরং প্রচেষ্টাকে নিরন্তর উদ্বুদ্ধ করে। 'প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন কিছুকে স্বীকার করাকে ভক্তি বলে' (Heb XII) অবশ্য সকল নৈতিক মূল্যের আধার হিসেবে অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রতি বিশ্বাসকেই ধর্ম বলে না। সেই অতীন্দ্রিয় সত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তাকে মিশিয়ে দেবার জন্য চাই আবেগগত প্রতি-ক্রিয়া এবং ঘনিষ্ঠ প্রচেষ্টা। বোসাঙ্কে (Bosanquet) যেমন বলেছেন, 'মনুষ্য আত্মা অধিকৃত কেন্দ্রীয় দুর্গটি হল ধর্ম'। মনপ্রাণ দিয়ে পরম সত্তার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। "আমরা একাকিত্ব থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি। যে সম্পূর্ণতা আমরা কোন দিন লাভ করতে পারতাম না, সেই সম্পূর্ণের মধ্যে নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে আমরা আত্মরক্ষা করেছি।" "মহাবিশ্ব এখন আমাদের নখদর্পণে। আমাদের মত দুর্বল ও ভীরু প্রাণীদেরও আজ কেউ ভয় দেখাতে পারবে না, এই জগতের বা বহির্জগতেরও কেউ আজ তার শক্তি বা বুদ্ধির সাহায্যে আমাদের ভয় দেখাতে পারবে না। এক কথায় বলতে পারি আমরা শান্তি ও বিশ্রাম পেয়েছি। যুদ্ধ ফুরিয়ে যায় নি এখনো। কিন্তু এখন যুদ্ধ মানেই জয়। আমাদের মনে এখন আর কোন সংশয় নেই। আমরা মঙ্গল সম্পর্কে সুনিশ্চিত। আর সেই মঙ্গল ও পরম সত্তার অভিন্নতাও সংশয়াতীত।"† অতএব আমরা

* W, E. Hocking, The Meaning of God in Human Experience (1912), P 31.

† Bernard Bosanquet, What Religion is, Pp 32, 6. 4f.

রয়েসের (Royce) মত বলতে পারি, প্রত্যেক ধর্মই হল 'আনুগত্যের ধর্ম' অথবা উইলিয়ম জেমসের (William James) মত বলা যেতে পারে (এখানে অবশ্য তিনি ধর্মের কথা বলেন নি, বলেছিলেন নৈতিকতার কথা)—'ধর্ম হল মহাজাগতিক স্বদেশপ্রীতি'। পরমসত্তা যিনি তিনিই চরম মঙ্গল। ধর্ম হল তাঁর প্রতি হৃদয়ের ইচ্ছার এবং চিন্তার আনুগত্য। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি আনুগত্য। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ল্যাটিন PIUS [যার থেকে ধার্মিক (Pious) বা ধর্মপরায়ণতা (Piety) প্রভৃতি কথাগুলি এসেছে] কথাটির মূল অর্থ ছিল—কর্তব্যপরায়ণতা ও আনুগত্য; মাতাপিতার প্রতি, দেশের প্রতি এবং ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য। ধর্মীয় আনুগত্যে স্বার্থ ত্যাগ, নিয়ম শৃংখলা, এমন কি কৃচ্ছ্রতাসাধনও থাকতে পারে। কিন্তু পরিশেষে এই আনুগত্যের ফলে ব্যক্তিত্বের উদারতা ও আত্মার, বিকাশ সম্ভব হয়। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে মানুষ জীবনোপলব্ধি করতে পারে।

II

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা ধর্মের বিশেষ কোন সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা করি নি। (ঈশ্বর রক্ষা করেছেন, আমরা মোরলের (Morley) দশ হাজারের সঙ্গে আর কোন সংযোজন করি নি।) কিন্তু আমরা ধর্মের স্বরূপটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। এখন অন্যান্য আচরণের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক আলোচনার কাজটি অবশিষ্ট আছে। আমরা দুভাবে বিষয়টিকে আলোচনা করবো। প্রথমে দেখানোর চেষ্টা করবো ধর্মের সঙ্গে অধর্মের কিংবা ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে অধর্মীয় বিষয়ের সম্পর্ক কি। তারপর আলোচনা করবো জীবন ও সংস্কৃতির বিশেষ দিকগুলির—যেমন নৈতিকতা, কলা, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কি?

সামাজিক বিবর্তনের ধারাটি অনুসরণ করে আমরা কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে অধর্মীয় বিষয়ের সম্পর্কটি আলোচনা করতে পারি। স্মরণ করা যেতে পারে হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) বিবর্তনের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন 'একটি অনির্দিষ্ট, অসম্বদ্ধ এক জাতীয়তা থেকে নির্দিষ্ট সুসম্বদ্ধ ভিন্নজাতীয়তামুখী গতি' বলে। জৈব্য ও সামাজিক বিবর্তনের ফলে একটি শ্রেণী ক্রমাগত বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। এই পৃথকীকরণের অন্যতম নিদর্শন হল ধর্ম। একেবারে আদিম সমাজে ধর্ম-জীবন অন্যান্য আশা-

আকাঙ্ক্ষা থেকে পৃথক ছিল না। যেমন ইন্দ্রজাল, আদিম শিল্প, কলা, আইন, সামাজিক বিধি, নৈতিকতা প্রভৃতির সঙ্গে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত ছিল। জীবনযাত্রা যখন ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠল, তখন পৃথকীকরণের কাজ (অর্থশাস্ত্রের 'শ্রমবিভাগের' সঙ্গে যার উপমা দেওয়া যেতে পারে) এগিয়ে যেতে লাগল। ধর্মের বিশেষ অনুষ্ঠানগুলি উন্নত হল। তার পদ্ধতি, দেবতাদের সম্পর্কে ধারণা, উৎসর্গ, প্রার্থনা, মন্দির, পুরোহিত, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিশেষ করে পবিত্র বা ধর্মীয় হিসেবে গণ্য হতে লাগল। এইভাবে ধর্ম অনুষ্ঠানমূলক এবং বিভাগীয় হয়ে উঠল। আর সেই সঙ্গে জীবনের অন্যান্য ক্রিয়াকাণ্ডগুলি অধর্মীয় হিসেবে গণ্য হতে আরম্ভ করল। ধর্ম যখন সচেতন হল, তখনই এই বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ হল এবং ধর্মীয় ও অধর্মীয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট রূপে দেখা দিল। কোন কোন লেখক যেমন, দুর্খাঁ (Durkheim) মনে করেন, সকল বিষয়ের মধ্য থেকে বিশেষ কিছু কিছু বিষয়কে পবিত্র হিসেবে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেই ধর্মের মৌলিক চরিত্রটি নিহিত আছে। ধর্মের একান্ত বিভাগীয় ও অনুষ্ঠানমূলক হওয়ার বিপদ হল এই যে সে জীবনের অবশিষ্টাংশ থেকে কিংবা বলা যায় সমগ্র জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। এবং ধর্মীয় গণ্ডী-বহির্ভূত সবকিছুই অধর্মীয় হিসেবে গণ্য হল। এইভাবে জীবনে দ্বৈত-বাদের সূচনা হল (ধর্মীয় ও অধর্মীয়) যেটা নাকি ধর্মের প্রকৃতির পরিপন্থী। কারণ ধর্ম সম্পূর্ণ জীবনকে একভাবে দেখতে, এক করে তুলতে চায়। পবিত্র এবং অপবিত্র. ধর্মীয় এবং অধর্মীয়ের মধ্যে এই পার্থক্য কেবল যে ধর্মের দিক থেকে করা হল তাই নয়, বর্তমান শতাব্দীতে বিজ্ঞান, কলা, নীতিবিদ্যা প্রভৃতিকে ধর্মীয় আওতা থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সরিয়ে আনা হল এবং তাদের স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা করা হল। বাস্তব জীবনেও একই প্রবণতা দেখা গেল। ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, রাজনীতি প্রভৃতিকে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে আসা হল। মানুষ ভাবতে অভ্যস্ত হল যে শিল্প-জীবন ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং কেবলমাত্র অর্থনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ধর্ম জীবনের একটি পৃথক বিভাগ। অর্থনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম তাই অর্থনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে না। এই ধারণার থেকে বাস্তব জ্ঞানের (বলা যেতে পারে বৈষয়িক জ্ঞানের) উদ্ভব হল। 'ব্যবসা হল ব্যবসায়' প্রবচনটির এই মানসিকতা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল এই পৃথকীকরণের কাজ কতদূর পর্যন্ত চলবে? অর্থাৎ কত বিষয়কে অমরা অধর্মীয় বিষয় বলে ধর্ম জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবো। যখন জীবনের অন্যান্য আচরণগুলি একে একে ধর্ম থেকে দূরে সরে আসবে এবং নিজেদের নিয়মে পরিচালিত হবে, তখন ধর্মের জন্য কি অবশিষ্ট থাকবে? সব কিছু কি একদিন অধর্মীয় হিসেবে গণ্য হবে? ধর্ম বলে কিছু থাকবে না? এখন যে অবশিষ্টটুকুকে* ধর্ম বলা হয় তাও কি অবশেষে একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে? যেমন কোঁৎ (Comte) বলেছিলেন, "বিজ্ঞান শেষে ঈশ্বরকে একদিন ঠেলতে ঠেলতে সীমান্তে এনে, এতদিন তিনি সাময়িকভাবে যে কাজ চালিয়ে গেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দেবে।" ধর্মের ভবিষ্যতের জন্য এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। নীচে আমরা আমাদের অভিমত একে একে প্রকাশ করছি।

1. জটিল সমাজ ব্যবস্থায় কর্মের পৃথকীকরণের প্রয়োজন স্বাভাবিক। সমাজ সামগ্রিকভাবে সব কিছু করে উঠতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সংগঠনের প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক সংগঠন অপরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে নিজের পরিসরের মধ্যে ভাল ভাবে কাজ করলেই তার সঠিক কর্তব্য পালন করা হয়। এই কথা স্বীকার করে নিলে জীবনের অধর্মীয় আচরণের আপেক্ষিক স্বাধীনতাও স্বীকার করে নিতে হয়। অবশ্য তার ফলে সাময়িকভাবে বিজ্ঞান এবং পরিশেষে ধর্ম নিজেই লাভবান হয়! বিজ্ঞান অধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। কারণ বিজ্ঞান ধর্মতত্ত্ব এবং দৈব প্রভুত্ব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে চায়। ধর্ম ও বিজ্ঞান এক নয়। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ক্ষেত্র, স্বতন্ত্র পদ্ধতি, স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য এবং স্বতন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ (প্রমাণ)। উভয়েই উভয়ের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান হলে ভাল হয়। আবার ধর্মকেও অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, কলাবিদ্যা প্রভৃতির আলোচ্য বিষয়কে স্বাধীন হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে। শ্রীমতি কার্লাইল (Mrs. Carlyle) বলেছেন, 'সব চেয়ে খারাপ হল অনেক কিছুকে গুলিয়ে ফেলা'। ধর্ম জীবনের অন্যান্য কর্মের মধ্যে একটি। তারও একটি স্বতন্ত্র সংগঠন প্রয়োজন। চার্চ হল সেই সংগঠন। একদিকে সংগঠিত ধর্ম এবং অন্যদিকে অধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের আপেক্ষিক স্বশাসন সম্ভবতঃ জৈবিক প্রয়োজনের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

* Cf. Isa. xliv: 17. 'And the residue thereof he maketh a God'.

2. কিন্তু এই অধর্মীয় দিকটির স্বশাসন কেবল আপেক্ষিক এবং স্বল্পকালীন মাত্র। স্বাতন্ত্রীকরণ মানে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ নয়। সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণে ধর্ম জীবনের চরম ঐক্য কামনা করে। ধর্মের লক্ষ্য হল জীবনের সব কিছুকে নিজ অন্তর্ভুক্ত করা এবং নিজেকে জীবনের সমান বিস্তৃত করা। অর্থাৎ জীবনের এমন কোন দিক থাকবে না যেখানে ধর্মের প্রভাব নেই। কিছু পূর্বেই আমরা বলেছি ধর্ম জীবনের অন্যান্য কর্মের মধ্যে একটি কর্ম মাত্র। এখন সে কথাটি ব্যাখ্যা না করলে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। ধর্মকে যখন জীবনের অন্যান্য কর্মের মধ্যে একটিমাত্র কর্ম হিসেবে স্বীকার করা হয় তখন ঐ সিদ্ধান্তটিকে সাময়িকভাবে সত্য বলে গ্রহণ করলেও, কখনই চরম সত্য হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। ধর্ম জীবনের অন্যান্য সংগঠনের সমান হতে পারে না বা তাদের সমান হয়ে পাশাপাশি থেকে একইভাবে কাজও করতে পারে না। ধর্ম মানুষের সকল কর্ম এবং কর্মক্ষমতাকে শক্তি জোগায় এবং পরিশুদ্ধ করে। মানুষ ধর্মের আলোকে তার অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ ক্রিয়াগুলির পুনর্বিশ্লেষণ ও পুনর্মূল্যায়ন করতে পারে। একজন মানুষের ব্যবসায়-বাণিজ্য অথবা তার অন্য যে কোন বৃত্তির মূল্যায়ন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সম্ভব। শ্লায়ারমেকারের (Schleirmacher) ভাষায় 'মনুষ্য জীবনের ঐকতানে তার বিশেষ একটি সুর ততক্ষণ পর্যন্ত অসহায়ভাবে একলা বাজে, যতক্ষণ না ধর্ম তার অফুরন্ত সুরসম্ভার নিয়ে তার সঙ্গে সহযোগিতা করে। আর এই সহযোগের ফলে সেই বিশেষ সহজ সুরটি জীবনের পরিপূর্ণ ঐকতান হয়ে উঠতে পারে।* ধর্মের আলোকে সাধারণ ঘটনার রূপান্তর ঘটে। পার্থিব বিষয়ও নৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর জীবনের বিবর্ণ দিকটি এই আলোকের নতুন দীপ্তিতে বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে। স্যামুয়েল রাদারফোর্ড (Samuel Rutherford) কারাগারে বলেছেন, 'গতরাত্রে আমার ঘরে যীশু এসেছিলেন। কারাগারের প্রত্যেকটা পাথর মূল্যবান রত্নের মত জ্বলছিল'। একটি উদ্দেশ্যেই কেবল ফ্রান্সিস টমসন (Francis Thompson) ঈশ্বরকে এড়িয়ে চলতেন। সেটি হল, 'স্বর্গের কুকুরের ভয়'। কিন্তু যখন সেই পরম প্রেমিক তাঁকে গ্রহণ করলেন এবং তাঁর হৃদয় জয় করে নিলেন তখন তিনি (টমসন) তাঁকে বলতে শুনলেন,

"তোমার আমি যা কিছু গ্রহণ করেছি তা তোমার ক্ষতি করার জন্য নয়। কেবল তুমি যাতে আমার আশ্রয় প্রার্থনা কর তাই। তুমি যে সব

* Caldecolt and Mackintosh, Selection, P. 293.

ভুল করেছ, সেত শিশুর মত না বুঝেই করেছ। ফ্রানসিস, তোমার জন্য আমি সব কিছু সংগ্রহ করে রেখেছি, ওঠ, আমার হাত ধর, এস"।

ঈশ্বরকে আবিষ্কার করার অর্থই হল সবকিছুকে ঈশ্বরের মধ্যে পুনরাবিষ্কার করা। যা কিছু ঈশ্বরের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাই হবে অশুচি ও অপবিত্র। ঈশ্বরকে লাভ করলে সমস্ত জীবন পবিত্র হয়ে উঠবে। সব কিছু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলতে আমরা এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলাম।

3. তবুও জীবনের এই একীকরণ নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। ধর্মীয় ও অধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে তার জন্য একটা আপোস মীমাংসার পথ খুঁজে বের করলেই এই সাফল্যলাভ করা যায় না। সেই বিরোধকে অতিক্রম করতে হবে, তাকে জয় করতে হবে। প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক ঘটনার বিরোধকে যদি খুব সহজে অস্বীকার করা হয় তার ফলে অধর্মীয় বিষয়গুলি যত না ধর্মীয় হয়ে উঠবে, ধর্মীয় বিষয় তার থেকে অনেক বেশি ধর্মহীন হয়ে পড়বে। স্যার হেনরী জোন্‌স (Sir Henry Jones) তাঁর গীফোর্ড বক্তৃতায় অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন, প্রাকৃতিক ঘটনাই আধ্যাত্মিক, এবং অধর্মীয় বিষয়ও পবিত্র। তারপর তিনি যথার্থই বলেছেন "ধর্ম ও অধর্মের বিরোধ শেষ পর্যন্ত থাকবে না ঠিক, কিন্তু এই বিরোধ না থাকলে ধর্ম কিন্তু তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ করতে পারবে না। পার্থিব লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য মানুষ চেষ্টা করবে ; ব্যর্থ হবে ; এমন কি প্রবঞ্চিত হবে আর তখনই কেবল তাঁর উপর [ঈশ্বরের উপর] মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে।" এই কথা আমাদের সদ্য উদ্ধৃত ফ্রানসিস টমসনের (Francis Thompson) কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—'যে আমাকে (ঈশ্বরকে) প্রবঞ্চনা করে সব কিছু তাকে প্রবঞ্চনা করে…'। "ধর্মের মূল্য এবং তার মর্যাদা নির্ভর করে ধর্মের প্রতিরোধ করার শক্তির উপর। ধর্ম যে কোন প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে চায়।… অধর্মীয় আগ্রহের পরিসর যত বিস্তৃত হয় ধর্মও তার বিস্তৃতি ঘটিয়ে সেই আগ্রহকে রূপান্তরিত করে……বিপরীত পক্ষে বিরোধ যত মুখোমুখী হয়, এবং যত তীব্র হয়, তার সমাধানও তত সুসম্পন্ন হয়"।*

প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক অথবা ধর্মীয় এবং অধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে বিরোধের যে সমস্যা রয়েছে তা যেন হেনরী জোন্‌স অতি সহজে সমাধান

* Sir Henry Jones—A Faith that Enquires (1922), Pp. 40f.

করে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে সমস্যাটির অত সহজ সমাধান সম্ভব নয়। ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, অর্থাৎ ধর্মীয় এবং অধর্মীয় উভয় বিষয়ে ঈশ্বর রয়েছেন, কেবল এই বলে প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃতের মধ্যে পার্থক্য ঘুচিয়ে দেওয়া যায় না। উন্নত ধর্মমতে যদিও এই পার্থক্যের সমন্বয় সম্ভব হয়েছে, তবুও এই পার্থক্য সাধারণভাবে সর্বত্র গৃহীত। বিভিন্ন মাত্রার নৈতিক মূল্য আছে, কমবেশি আছে। এই বিষয়টিকে ঈশ্বরের সর্বব্যাপিতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। বিরোধটা প্রকৃতপক্ষে নৈতিক মূল্যের কমবেশি ধারণার মধ্যে অনুন্নত নৈতিক ধারণার সঙ্গে উন্নত নৈতিক ধারণার বিরোধ। এটা কেবল ভাল-মন্দের দ্বন্দ্বের প্রশ্ন নয়, উত্তমের সঙ্গে উত্তম-তরর দ্বন্দ্ব, প্রাকৃতিক বিষয়ের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়ের দ্বন্দ্ব। সংগ্রামে জয়ের অর্থ হল অনুন্নত অবস্থার বন্ধনদশা থেকে মুক্তি। অথবা অন্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে এটা হল 'উন্নত অবস্থায় জন্মানোর ফল'। কারণ এই সংগ্রাম একই সঙ্গে কর্তব্য এবং তার পুরস্কার, মানুষের সাফল্য এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ। যে কোন দিক থেকে দেখি না কেন আমাদের পেছিয়ে আসার কোন উপায় নেই। যদিও আমরা বৈপরীত্যের উপর জোর দিচ্ছি, আমরা আবার বলছি ধর্ম ধর্মাধর্মের মধ্যে চরম বিরোধ স্বীকার করে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। ধর্মকে জীবনের একীকরণ এবং সমন্বয় সাধন করতে হবেই। প্রথম প্রাকৃতিক ধর্মীয় ও অধর্মীয় বিষয়ের বিরোধ, পরে শুভ দৈবশক্তি ও অশুভ দৈবশক্তির বিরোধ এবং পরিশেষে পার্থিব এবং অপার্থিবের বিরোধ মেটাতে হবেই। তার ফলে পার্থিব সব কিছু এক হয়ে স্বর্গীয় বিষয়ের অংশীদার হতে পারবে। এবং জীবনের পরিক্রমা সুসম্পন্ন হবে। সেই একীভূত জীবনেই কেবল ধর্মীয় এবং অধর্মীয় বিষয়ের বিরোধকে জয় করা সম্ভব হবে।

"আত্মাও দেহকে অধিক সাহায্য করতে পারে না, দেহও পারে না আত্মাকে অধিকতর সাহায্য করতে"।

III

এখন আমাদের আলোচনা করতে হবে মনুষ্য সংস্কৃতির যে সব বিষয় ধর্মের সমগোত্রীয়—যেমন নৈতিকতা, কলা, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি—তাদের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কি? নৈতিকতা, কলা, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি জীবনের ধর্মনিরপেক্ষ অনুসন্ধানের দিক হলেও এদের সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। কারণ জীবনে যেমন

ধর্মীয় অনুসন্ধানের একটি দিক আছে তেমনি জড়বাদী ও উপযোগবাদী, অনুসন্ধানের দিকও রয়েছে। যেমন অজৈবিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক প্রভৃতি দিকগুলি সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ পার্থিব প্রয়োজনের দিক। নৈতিকতা, কলা, বিজ্ঞান ও দর্শন এই দু'টি দিকের মাঝখানে রয়েছে। এগুলি আধ্যাত্মিক এই অর্থে যে এদের কারবার সংস্কৃতির সঙ্গে। উপযোগের প্রশ্ন তখন এদের সঙ্গে জড়িত থাকে না। এদের সাহায্যেই মানুষ মঙ্গল (নৈতিকতা) সৌন্দর্য (কলা) এবং সত্য (বিজ্ঞান, দর্শন) এই তিনটি আধ্যাত্মিক মূল্যের অনুসন্ধান করে। আবার এগুলি ধর্মীয় নয় এই অর্থে যে এদের নিজেদের স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয় আছে। লক্ষ্যও স্বতন্ত্র। ধর্মীয় বিধিনিষেধের দ্বারা এগুলি পরিচালিত নয়। এবং প্রত্যেকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মীয় বিশ্বাস এইগুলিকে প্রভাবিত করতে ত পারেই না বরং কখনো কখনো এদের সঙ্গে ধর্মের তীব্র বিরোধিতা দেখা যায়।

আমরা প্রথমে ধর্মের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক আলোচনা করবো। নৈতিকতাকে সাধারণতঃ ধর্মের সমগোত্রিয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এই দাবি খুবই যথার্থ যে একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে চরিত্রবান হতে হবে; তাঁকে ভাল হতে হবে। আমরা দেখেছি ধর্ম মানুষের সম্পূর্ণতা দিতে চায়। নৈতিকতারও একই উদ্দেশ্য। তাহ'লে ধর্ম এবং নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? দু'টি কি এক? কারণ দু'জনে একই কাজ করে। যদি তারা পৃথক হয় তাহ'লে উভয়ের অস্তিত্ব থাকবে ত? অতি আদিম মানব সমাজে এদের একেবারে পৃথক করা যেত না। আমরা আগেই দেখেছি জীবন তখন ছিল অভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা তখনো জীবনে দেখা দেয় নি। যখন তা দেখা দিল তখনো দুই ভিন্নধর্মী আকাঙ্ক্ষা পাশাপাশি বন্ধুর মত হাঁটতে লাগল, পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে নিজেদের সুবিধা গ্রহণ করতে লাগল, নিজেদের সমৃদ্ধশালী করে তুলল। মানুষের আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার যেন দু'টি শরিক। কিন্তু তবু তাদের মর্যাদা যেন সমান ছিল না। উভয়ের মধ্যে ধর্ম কিছুটা বেশি প্রভুত্বের ও প্রাচীনত্বের দাবি করত। আর এই প্রভুত্বের দাবির মধ্যেই বিচ্ছেদের বীজটি নিহিত ছিল। এক সময় নৈতিকতা নিজেকে স্বনির্ভর বলে মনে করল। নৈতিক চেতনার উপর কোন অপার্থিব বিধিনিষেধকে আর সে স্বীকার করল না। নীতিবিদেরা পুরোহিতদের প্রভাবমুক্ত

হলেন। এবং নীতিবিদ্যা ধর্মতত্ত্বের স্বীকৃত সত্যকে অপ্রয়োজনীয় বোঝা ভেবে ঝেড়ে ফেলে দিল। মানুষ বিশ্বাস করতে আরম্ভ করল যে ধার্মিক না হয়েও সে ভাল হ'তে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোঁৎ (Comte), মিল (J. S. Mill) এবং স্পেনসর (Spencer) প্রমুখ পণ্ডিতেরা ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতিধর্মী নীতিবিদ্যার প্রচলন করেন। তখন দাবি ওঠে যা কিছু বাস্তব, এমনকি ধর্মও নীতিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। নৈতিকতার সঙ্গে যখন কিছুটা আবেগ যুক্ত হয় তখন তাকে ধর্ম বলে। সুতরাং ধর্মের নিজস্ব কোন প্রয়োজনীয় কাজ থাকতে পারে না বলে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করলেন।

কিন্তু ধর্ম এরকম নির্বিশেষে নৈতিকতার সঙ্গে মিশে যেতে পারে না। তারা একই রকম হলেও এক নয়। শ্লায়ারমেকার (Schleirmacher) এই সংকীর্ণ ও একদেশদর্শী নীতিবাদের বিরোধিতা করেছেন। তিনি মনে করেন ঈশ্বরকে সরাসরি জানা যায়। ধর্মের যে রহস্যময় দিকটির প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তার সঠিক আলোচনা এখনো হয় নি। ধর্ম এবং নৈতিকতার মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক জানার জন্য আমাদের প্রয়োজন হল : (1) উভয়ের মধ্যে পার্থক্যটি সুনির্দিষ্ট করা ; যাতে দু'টিকে এক না মনে হয় এবং (2) তাদের পার্থক্য যে বিরোধিতা নয় বরং উভয়ে সম্পূর্ণ ঐকতানে বাঁধা তা দেখানো। এখানে আমরা সংক্ষেপে এই দুইটি বিষয়েরই আলোচনা করবো।

ধর্ম এবং নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্যগুলি এভাবে দেখানো যেতে পারে। অবশ্য উভয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন উভয়েই পরম মঙ্গল নিয়ে আলোচনা করে। কাণ্ট (Kant) এই মঙ্গলকে 'মঙ্গলের জন্য মঙ্গল' বলেছেন। এই মঙ্গলের কোন বিশেষণ নেই। কিন্তু ধর্মের আলোচনার ক্ষেত্র ব্যাপকতর। সুন্দর ও সত্যও মঙ্গলের মত ধর্মের আলোচ্য বিষয়। এমনকি মঙ্গল সম্পর্কেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে বর্তমান মুহূর্তের অভিজ্ঞতার প্রকৃতপক্ষে যার অনুভূতি এবং উপলব্ধি সম্ভব তাই মঙ্গল। কিন্তু নৈতিক চেতনার মঙ্গল কোন প্রাপ্তি বা পুরস্কার নয়। মঙ্গল হল কর্তব্য। তাকে তক্ষুণি লাভ করা যায় না। ক্রমে ক্রমে তার অধিকার লাভ করা যেতে পারে। এমনকি এই অধিকার লাভও অন্তহীন একটি সম্ভাবনা মাত্র। একে লাভ করার জন্য যথেষ্ট শ্রম ও চেষ্টার প্রয়োজন। আমরা হকিং (W. E. Hocking)-এর ভাষা আগেই উদ্ধৃত করেছি। 'ধর্ম

হল সম্ভাব্য প্রাপ্তি' বা 'কামনার বস্তু'। ধর্মে আমরা যা পেতে চাই ধর্মীয় চেতনায় সেটি প্রথম থেকেই উপস্থিত থাকে। [ঈশ্বর প্রাপ্তি ধর্মের লক্ষ্য। ঈশ্বর উপাস্য হিসেবে প্রথম থেকেই উপাসকের চেতনায় উপস্থিত থাকেন এবং তাকে ধর্মে উদ্বুদ্ধ করেন] কিন্তু নৈতিকতা এক অন্তহীন যাত্রা, যার লক্ষ্যকে বলা যেতে পারে এক উড়ন্ত লক্ষ্য, যে লক্ষ্য কখনোই স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় না।

"চিরকালের জন্য এবং চিরকালের জন্য তখন আমরা যাত্রা করি" মানুষের প্রচেষ্টা এবং বিরোধের মধ্যেই নৈতিকতার সার্থকতা। নৈতিকতা যুদ্ধ। ধর্ম জয়। নৈতিকতা বিরোধ। ধর্ম শান্তি। যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ধর্ম এই শান্তি লাভ করতে পারে (যেমন বৌদ্ধ ধর্ম, জয়লাভ করেও ধর্ম এই শান্তি লাভ করতে পারে, আবার যুদ্ধের মধ্যেও এই শান্তি লাভ করা যায় (যেমন খৃষ্ট ধর্ম)। 'স্থৈর্য এবং আস্থাই তোমার শক্তি' (Isa XXX 15)। 'শান্তি আমি তোমাদের জন্য রেখে এসেছি, আমার শান্তি আমি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি' (John XIV 27)। যিনি সকল মূল্যের সংরক্ষক তাঁর প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে তাহ'লেই এই আস্থা বা স্থৈর্য সম্ভব। নিষ্ক্রিয়তা থেকে শান্তি লাভ করা যায় না। শান্তি লাভের জন্য গভীর মনোনিবেশের প্রয়োজন। পলের (Paul) বিশ্লেষণ অনুসারে বিশ্বাসের দ্বারা যার যথার্থতা নির্ণিত হয় তাই ধর্ম, আর কাজের মধ্য দিয়ে যার সমাধান পাওয়া যায় তা হ'ল নৈতিকতা। ধীরে ধীরে নৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় একথা পল (Paul) স্বীকার করেন না। যাই হোক আমরা পলের কথা মানি আর না মানি ধর্মের বৈশিষ্ট্য হল ঈশ্বরবিশ্বাসে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতায় একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে। এই মানসিকতা থেকেই প্রার্থনা, উৎসর্গ প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছে। আর যেখানে এই সব ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডের বাড়াবাড়ি নেই সেখানেও অস্পষ্টভাবে, অন্তত অবচেতন মনে এই মানসিকতা সক্রিয়। এই মানসিকতাকে [অর্থাৎ ঈশ্বরবিশ্বাস এবং তাঁর সঙ্গে একাত্ম হওয়া সম্ভব এই বিশ্বাস] কেবলমাত্র নৈতিকতায় পর্যবসিত করা যায় না। এক কথায় ধর্ম এবং নৈতিকতা এক হতে পারে না। ধর্মের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটা আন্ত-র্জীবন আছে। নৈতিক জীবনের সঙ্গে তাকে এক করে ফেললেও অবশিষ্ট তার কিছু থেকে যাবেই।

তবুও ধর্ম এবং নৈতিকতার মধ্যে প্রকৃত কোন বিরোধ নেই। আছে সুগভীর ঐক্য। উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার উপর আমরা এতক্ষণ অত্যধিক গুরুত্ব অরোপ করেছি। কিন্তু কেবলমাত্র তাত্ত্বিক যুক্তি ছাড়া দুটিকে ওভাবে পৃথক করা যায় না। বাস্তব জীবনে নৈতিকতা এবং ধর্মকে সম্পূর্ণ-রূপে স্বতন্ত্র করে রাখা অসম্ভব। অবশ্য যেখানে মানুষের অভিজ্ঞতা একদেশদর্শী ও অসম্পূর্ণ অথবা যাঁরা মনে করেন (W. E. Gladlone-এর ভাষায়) 'তাদের ধর্ম তাদের নৈতিকতাকে নষ্ট করুক', কিম্বা যাঁরা আন্তরিকভাবে মনে করেন যে নৈতিকতার জন্য ধর্মের প্রয়োজন নেই, তাঁদের কথাকে আমরা ব্যতিক্রম বলে গণ্য করবো। স্বাভাবিক অভিজ্ঞতায় ধর্ম এবং নৈতিকতা পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে এবং তার ফলে নৈতিক ধর্মের উদ্ভব হয়। সাধনা এবং সিদ্ধি আধ্যাত্মিক জীবনের দুইটি দিক মাত্র। তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। [আগে বলা হয়েছিল সাধনা বা সিদ্ধিলাভের ক্রমাগত চেষ্টা হল নৈতিকতা এবং সিদ্ধি হল ধর্ম।] আমাদের আলোচনা করার মত যদি যথেষ্ট জায়গা থাকত তাহ'লে আমরা দেখাতে পারতাম নৈতিকতা ধর্মের জন্য যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি ধর্ম ও নৈতিকতার জন্য প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে নৈতিকতা ধর্মের জন্য অবশ্যই প্রযোজনীয়। ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় যে মঙ্গলের ধারণা রয়েছে, ব্যক্তি তথা সমাজ জীবনে সেই মঙ্গলের আদর্শকে বাস্তব ঘটনারূপে উপলব্ধি করতে গেলে ক্রমাগত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। প্রগতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তি জীবনে ক্রমশঃ সেই আদর্শের উপলব্ধি সম্ভব। খৃষ্ট ধর্মে তাকেই বলা হয় 'santification'। এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন নৈতিক প্রগতি। কোন দৈব অনুগ্রহ লাভের ফলে সকলে সিদ্ধি লাভ করতে পারে—এই বিশ্বাসের সঙ্গে 'নৈতিক আদর্শে'র কোন মিল নেই। বস্তুতপক্ষে সাধনা এবং সিদ্ধি একই জীবনের দু'টি মুহূর্ত মাত্র। সমাজ জীবনে নৈতিক আদর্শের ক্রমাগত উপলব্ধি বলতে বুঝি সামাজিক রীতি-নীতির পুনর্গঠন। এই পুনর্গঠনের ফলে সুন্দরতর হয়ে ওঠে সব ব্যবসায়-বাণিজ্য শিল্প, রাষ্ট্রনীতি এবং আন্তর্জাতিক জীবন। ধর্মও অনুমান করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল সব কিছুকে সুন্দর করে তোলা। তা যখন সম্ভব হয় তখন ব্যক্তি ও সমাজ উভয় জীবনেই আদর্শ বাস্তবে পরিণত হয়। ধর্ম জীবনের উপর নৈতিক চেতনার প্রভাব পড়েছে যুগ যুগ ধরে। প্রত্যেক ধর্মের মহা-পুরুষেরা সাধুতা, ভালবাসা প্রভৃতিকে ঈশ্বরের গুণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং

প্রকৃত ধর্মীয় জীবনে এই গুণগুলির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ধর্মের চরম মূল্যগুলি যাতে বাস্তব জীবনে রূপ পরিগ্রহ করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বর্তমান খৃষ্টান জগতের 'সামাজিক সুসমাচার'গুলি রচিত হয়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে—নৈতিকতার ক্ষেত্রে ধর্মের প্রয়োজন রয়েছে। নৈতিকতা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। নৈতিকতা অধ্যাত্মিক জীবনের একটি দিক মাত্র। নৈতিকতার লক্ষ্য তার পরিধির মধ্যে নেই, আছে পরিধির বাইরে। নৈতিক জীবনে যে সব সমস্যার উদ্ভব হয় তার সমাধান পাওয়া যায় ধর্মে। প্রকৃতি হল নৈতিকতার অবিসম্বাদিত প্রভুত্বের ভিত্তি স্বরূপ। আবার এই প্রকৃতির মূল নিহিত আছে ঈশ্বরে। নৈতিকতাকে সমর্থনের জন্য ধর্মীয় প্রকল্পের প্রয়োজন। মঙ্গল যদি ক্ষমতাসম্পন্ন না হয়, ব্রহ্মাণ্ডের শাসক না হয়, তাহ'লে আমাদের জীবনে আমরা তার প্রভুত্ব স্বীকার করবো কেন? নৈতিকতা ব্রহ্মাণ্ডকেও অস্বীকার করতে পারে না। 'নৈতিক পদ্ধতি হল সমগ্র জাগতিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে এক ভয়ংকর সংগ্রাম। প্রকৃতিতে যে ঘোর অবিচার রয়েছে তার বিরুদ্ধে একটা সরাসরি যুদ্ধ'—হাক্সলে (Huxley)-র এই বিখ্যাত ধারণা সূচনায় আমাদের খুবই উদ্বুদ্ধ করতে পারে, কারণ এতে বিদ্রোহের সুর রয়েছে। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একেবারে অস্বীকার করার পরিকল্পনা মূলতঃ হতাশা থেকে জন্ম নিয়েছে। তাই ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। বিশ্ব-চরাচরে ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যের অস্তিত্বকে সন্দেহ করে যদি কোন নৈতিক ধারণা গড়ে ওঠে, তাহ'লে তা আজ হোক বা দুদিন পরেই হোক, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেই। নৈতিক প্রচেষ্টার সারবত্তার প্রমাণ ধর্মীয় ধারণাতেই কেবল পাওয়া যেতে পারে। ধর্মের সহায়তার ফলেই, যে পরম উৎস থেকে নৈতিক শক্তির পুনরুজ্জীবন এবং সম্পূর্ণীকরণ ঘটেছে, তার সঙ্গে আমাদের মিলন সম্ভব হয়েছে।

সিদ্ধান্তে আমরা এই কথা বলতে পারি যে ধর্মকে যেমন নৈতিকতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখা যায় না, তেমনি ধর্মকে নৈতিকতার সঙ্গে একেবারে মিশিয়েও ফেলা যায় না। জীবনের স্বতন্ত্র ক্রিয়ারূপে ধর্মের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। মনুষ্য সভ্যতার ছাত্রাবস্থাতেই কেবল ধর্ম শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অবশ্য ছাত্র বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কাজ ফুরিয়ে গেছে একথা ঠিক নয়। ধর্ম এবং নৈতিকতা আধ্যাত্মিক জীবনের দুইটি শরিক।

পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা সাহস করে আর একটু যোগ করে দিতে পারি,—উভয়ের মধ্যে ধর্মের শ্রেষ্ঠতা বুঝি স্বীকার করে নিতেই হবে।

জায়গার কথা বিবেচনা করে ধর্মের সঙ্গে কলার সম্পর্ক আমাদের আরও সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করতে হবে। কলার মধ্য দিয়ে আদর্শ অনুসন্ধানের একটি অপরূপ প্রকাশ দেখা যায়। প্রধানতঃ কলার আদর্শ হল 'সুন্দর'। কলার কাজ সুন্দরকে রূপে, শব্দে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলা। অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে কলার জন্ম হয়। হেগেল (Hegel) বলেছেন, "সুন্দর অতীন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা তাকে জানি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা রূপে তার প্রকাশ। কিন্তু সেই অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অতীন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুমোদিত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুন্দরের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই। অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে এবং অতীন্দ্রিয়ের সাহায্যে সুন্দর অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। সুন্দর নিজেকে প্রকাশ করে না, অতীন্দ্রিয় সত্তাকেই প্রকাশ করে।"* এখন সুন্দরকে প্রকাশ করাই যদি কলার কাজ হয় এবং সুন্দরের প্রকৃত অর্থ যদি আধ্যাত্মিক হয়, তাহ'লে আমরা কলা এবং ধর্মের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অনুসন্ধান করতে পারি। কারণ ধর্মও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত সব কিছুর মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এখন তাহলে আমরা আর বিস্মিত হব না যদি দেখি প্রাচীনকাল থেকে ধর্ম ও কলা একই সঙ্গে বিকশিত হয়েছে। ইতিহাসে দেখা যায় সব মহৎ শিল্পই কোন না কোন ভাবে ধর্মের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে। তাছাড়া আর একটি বিষয়ও লক্ষ্যণীয়। কলা প্রথম থেকেই ধর্মের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিল। চিত্রকলায়, স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, ভাস্কর্যে এবং কাব্যে দেবতাদের সম্পর্কে মানুষের ধারণা এবং তার শ্রদ্ধা ও উপাসনার উপলব্ধিটিই প্রকাশ পেয়েছিল।

তবুও সাম্প্রতিক কালে ধর্ম ও কলা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। একদিকে ধর্মের ইন্দ্রিয়জ রূপ ও রঙের বিরুদ্ধে চলেছে একটা নৈতিক বিদ্রোহ। ধর্মকে মনে করা হয় নৈতিক আচরণ মাত্র। নৈতিক পদ্ধতিকে ধর্মের সঠিক পদ্ধতি মনে করা হয়। এই কট্টর নীতিবাদ এবং বৌদ্ধিক রূঢ়তা, আর পৌত্তলিকতা সম্পর্কে ভয়ংকর ভীতি এই বিদ্রোহকে গোঁড়ামির স্তরে নিয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে ধর্মকে স্বয়ম্ভর করার একটা দাবিও উঠেছে। 'শিল্পের

* Hegel—Philosophy of Religion, vol ii p. 8

জন্য শিল্প'—এই হল একদলের শ্লোগান। শিল্পের সৃজনশীল প্রচেষ্টাকে বা এক কথায় বলা যায়—সৃষ্টিকে শিল্পের মানদণ্ডে বিচার করতে হবে। কোন নৈতিক বা ধর্মীয় মানদণ্ড দিয়ে শিল্পের বিচার চলবে না। এখন কেবলমাত্র সৌন্দর্যজাত এবং ইন্দ্রিয়জ ধর্মের বিরুদ্ধে নৈতিক বিদ্রোহ এবং বাহ্যিক মানের বিরুদ্ধে শৈল্পিক বিদ্রোহ—এই উভয় বিদ্রোহই অনেকাংশে যথার্থ। ধর্মীয় শিল্পকলায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা যদি নিজের লক্ষ্য হয়ে ওঠে তাহ'লে অবশ্যই বিপদের কথা। ধর্মীয় শিল্পকলাকে হতে হবে, হেগেল যেমন বলেছেন, আধ্যাত্মিকতায় পৌঁছানোর রথ। আর শিল্পকলা যদি যুক্তির সঙ্গে এবং মানুষের বিবেকের সঙ্গে কোন সংযোগ না রাখে তা হ'লে সেই শিল্পকলার সৌন্দর্য কেবল উপভোগসর্বস্ব হয়ে উঠবে। হিব্রু মূল্যবোধ তাই হয়ত ঈশ্বর ও আধ্যাত্মিকতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। "ঈশ্বরই আত্মা। যাঁরা ঈশ্বরকে উপাসনা করবেন তাঁরা আত্মা ও সত্যকেও উপাসনা করবেন"—এই ধরনের কথার মধ্যে তাঁদের মতের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু সৌন্দর্যভিত্তিক ধর্মের বিরোধিতার প্রতিক্রিয়া অন্যভাবে প্রকাশ পেতে পারে। সৌন্দর্যভিত্তিক ধর্মের বিরোধিতা মানুষের আত্মাকে অহেতুক নির্মম ও কঠোর করে তুলেছে। হিব্রু থেকে যেমন আমাদের কিছু শিখতে হবে, তেমনি কিছু শিখতে হবে গ্রীক্ থেকেও। সৌন্দর্যের ধর্মের কথা সেখানে বলা হয়েছে। (Hegel ও এইভাবে বলেছেন)। 'শিল্পের জন্য শিল্প' এবং শিল্প সয়ম্ভর —শিল্পীদের এই দাবি আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে সমর্থন করবো। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে শিল্পের এই স্বাধীনতাকে আপেক্ষিক হতে হবে, তবে চরম স্বাধীনতা নয়। সত্য শিব ও সুন্দর এই তিনটি মূল্যের মধ্যে কোন চরম অনৈক্য নেই। বেশির ভাগ শিল্পীর কাজ না-নৈতিক (Non-moral) হতে পারে কিন্তু সেগুলি প্রকৃত নীতিবিরুদ্ধ বা অনৈতিক (Immoral) নয়। যতক্ষণ শিল্প প্রকৃত শিল্প থাকছে ততক্ষণ তার নীতিবিরোধী হওয়ার অবকাশ নেই। প্রকৃত শিল্প অবশ্যই ধর্মগুণ-বিশিষ্ট। হয়ত তাকে প্রকৃত ধর্ম বলা নাও যেতে পারে। কারণ প্রকৃত ধর্ম না হ'লেই ধর্মবিরোধী হতে হবে এমন কোন কথা নেই। একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে পরম সত্তাকে বিশ্লেষণ করাই হল শিল্প। কারণ পরম সত্তা যেমন মঙ্গল তেমনি সুন্দর। সৌন্দর্য একটি পরম মূল্য। সুন্দর ঈশ্বরের অন্যতম মৌলিক গুণ। কলাবিদ্যা সৌন্দর্যের

দৃষ্টিকোণ থেকে পরম সত্তাকে বিশ্লেষণ করে ; বিজ্ঞান ও নৈতিকতার মধ্যে ঈশ্বরের যে প্রকাশ হয়েছে তাকে স্পষ্টতর করে তোলা এবং পরম সত্তার সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনের প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলে। অতএব ধর্মেরও শিল্পকে প্রয়োজন। একই ভাবে প্রমাণ করা যায়, যে শিল্প মানুষকে সকল রকম সৃজনশীল প্রেরণার পর উৎসটির সন্ধান দেবে তারও ধর্মকে প্রয়োজন।

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক প্রায়ই আলোচিত হয়। বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের আগ্রহ কেবল একটি প্রশ্নকে ঘিরে। ধর্মের এমন কি কোন প্রয়োজনীয় কাজ আছে যা বিজ্ঞান করতে পারে না ? বর্তমান যুগ প্রধানতঃ বিজ্ঞানের যুগ। এখন কি আর ধর্মের কোন স্থান রয়েছে অথবা ধর্মের কি আর কোন প্রয়োজন আছে ? ধর্ম মানুষকে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান দিতে চায় বিজ্ঞান কি সেই কাজটি অধিকতর যোগ্যতার সঙ্গে করতে পারে না ? ধর্মের করার মত কি কাজ এখন অবশিষ্ট আছে ? বিজ্ঞান যা পারে না, ধর্ম কি তা পারে ? এখন শিক্ষিত মানুষের কাছে এই প্রশ্নগুলি তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই এই বিষয়ে একটি দীর্ঘস্থায়ী সন্দেহ বা অবিশ্বাস রয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সঙ্গতি নেই, একটি অন্যটির পথের অন্তরায় —এমন একটি ধারণা এখন সুপ্রচলিত। কিন্তু উভয়ের সম্পর্ক এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক জ্ঞান থেকে এ রকম ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃত সত্য হল, বিজ্ঞান এবং ধর্ম পরম সত্তাকে জানবার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে। দৃষ্টিভঙ্গীর ও পদ্ধতির ভিন্নতাকে পারস্পরিক শত্রুতা বা অসঙ্গতি রূপে দেখা যুক্তিযুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি এক রকমের 'শ্রমবিভাগ মাত্র'। একের কাজে অন্যে সহায়তা করে, বিরোধিতা করে না।

দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টতঃ ব্যক্তিগত এবং মূল্যায়নধর্মী। বিশ্বপ্রকৃতির উপর কতকগুলি সুনির্দিষ্ট দাবি তার আছে। ধর্ম কতকগুলি ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির পথ অন্বেষণ করে। ধর্ম পরম সত্তাকে ব্যক্তিগত বা সামাজিক মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করতে চায়। বিপরীত পক্ষে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নৈর্ব্যক্তিক। "জীবনের কোন ঘটনার উপর সে আবেগমত্ত মূল্য আরোপ করে না। কারণ প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী যেমন 'গরম কে গরম' হিসেবে ব্যাখ্যা করে তেমনি

সেক্সপিয়রকে সেক্সপিয়র হিসেবে বর্ণনা করে। সে আকাশের নক্ষত্র সম্বন্ধে যেমন চিন্তা করে, তেমনি আন্তরিকতার সঙ্গে অপরাধীদের কাজকর্মের কারণও অনুসন্ধান করে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা পিন (Push-Pin) এবং কবিতার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতে পারে না"* বিজ্ঞানী তাঁর অনুসন্ধানের সময় সমস্ত রকম ব্যক্তিগত সম্পর্ক, তাঁর আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি প্রভৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে চেষ্টা করেন। কারণ তার ফলে তাঁর বিচার সংস্কারমুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অথবা আরও সঠিকভাবে বললে বলা যায়, বিজ্ঞানীর লক্ষ্য সত্যের আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অন্য সকল রকম আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা। তিনি তথাকথিত মূল্যবোধগুলি, যেমন সুন্দর ও মঙ্গলকে তাঁর কাজের জন্য অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে তাদের অগ্রাহ্য করেন এবং সত্যকেই একমাত্র মূল্য হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর সকল কাজকে তিনি এই সত্যানুসন্ধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখেন। সবশেষে তিনি গুণগত পরিমাপের কোন প্রয়োজন উপলব্ধি করেন না। কেবলমাত্র পরিমাণগত পরিমাপে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। সকল বৈজ্ঞানিক বিচারের যথার্থ পদ্ধতি হল গাণিতিক পদ্ধতি। এক নিদারুণ, কল্পনামুক্ত আবেগহীন ভ্রমশূন্যতাকে গাণিতিক পদ্ধতি বলে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীই হল সর্বোত্তম। কারণ যথার্থ পরিমাপের জন্য (পরিমাণগত পরিমাপ) এই দৃষ্টিভঙ্গী সবচেয়ে সহজসাধ্য।

এই স্বেচ্ছারোপিত সীমাবদ্ধতার ফলে যদি ব্যক্তিগত ভাললাগা-মন্দলাগা (পছন্দ, অপছন্দ) এবং নৈতিক মূল্যগুলি অবহেলিত হয়, তবুও বিজ্ঞানী তাঁর নির্দিষ্ট পরিসরে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারেন। প্রকৃত বিজ্ঞানী কিন্তু এই নিষেধকে নিতান্ত কৃত্রিম বলে স্বীকার করেন। এই নিষেধের বা সীমাবদ্ধতার একটিমাত্র যৌক্তিকতা এই যে বিশেষ কোন একটি উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য এটি খুবই কার্যকরী। বিজ্ঞানী জানেন যে তাঁর সিদ্ধান্ত আংশিক এবং নিতান্ত সাময়িক। এটিকে কোনমতে ব্যাপক বা সম্পূর্ণ বলা যায় না। আমরা মিল্টনের (Milton) Paradise Lost-এর অর্থ ভাব এবং কল্পনার ঐশ্বর্যকে অগ্রাহ্য করে যদি কেবল অলংকার শাস্ত্রের নিয়ম মত পঙ্‌ক্তিগুলির গঠনের আলোচনার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখি, তাহ'লে যেমন হয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-কোণ থেকে জগৎ সম্পর্কে আলোচনাও অনেকটা তেমনি। বিজ্ঞান থেকে

* Stanley A. Mellor, Religion, Modern Science and Philosophy.

আমরা ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাকরণ বা তার কাঠামোর খবর জানতে পারি। কিন্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত অর্থটি আমরা বিজ্ঞান থেকে জানতে পারি না। অবশ্য ঐ অন্তর্নিহিত অর্থটি ব্যাখ্যা করা বিজ্ঞানের লক্ষ্যও নয়। কিন্তু বিশ্বচরাচরের সকল কিছুকে নির্বিশেষে আঙ্কিক সূত্রে সম্ভবতঃ পরিণত করা যায় না। যেমন অপূর্ব সূর্যাস্তের সৌন্দর্যের অনুভূতি, কিংবা আত্মোৎসর্গের মত বীরত্বপূর্ণ কাজের নৈতিক স্বীকৃতি অথবা সামগ্রিকভাবে সুন্দর ও মঙ্গলের ধর্মীয় ধারণাকে আঙ্কিক সূত্রে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এই সব জিনিসের গুণ বা মূল্যকে পরিমাণ দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না। কিট্‌স (Keats) অভিযোগ করেছেন, রামধনুর সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায় যখন বিজ্ঞান তার সম্পর্কে পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করে। রামধনু তখন কতকগুলো সাধারণ জিনিসের তালিকায় পরিণত হয়। কিন্তু যার দেখার চোখ আছে, উপলব্ধির মন আছে তার কাছে রামধনু সুষমাময় অনন্ত সৌন্দর্যের আধার। তাহ'লে দেখা গেল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে শৈল্পিক এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীরও সমন্বয় করতে হবে। ধর্মের আলোচনার ক্ষেত্র কিন্তু কৃত্রিমভাবে নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সামগ্রিকভাবে অর্থ এবং মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত অভিজ্ঞতায় ধর্মের ক্ষেত্র প্রসারিত। ধর্ম এবং বিজ্ঞানের পারস্পরিক আলোচনার ক্ষেত্র যখন এইভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায় তখন উভয়ের মধ্যে একটা ঐক্যের সম্বন্ধ স্থাপন করার বিষয়টি বিবেচনার যোগ্য হয়ে ওঠে। এবং ঐ ঐক্যের সম্বন্ধ স্থাপন করা তখন আর খুব কঠিন বলেও মনে হয় না। কারণ দেখা যাচ্ছে তারা এক পদ্ধতি অনুসরণ করে না, এবং আলোচনার ক্ষেত্রও এক নয়। তাহ'লে একজন কি করে অন্যের বিরোধিতা করবে? অথবা একজন কি করে অন্যের কর্মভার গ্রহণ করতে পারবে? 'গুণণ পদ্ধতির' সঙ্গে প্রেমে পড়ার যতটা বিরোধ আছে অথবা ইউক্লিডের (Euclid) স্বতঃসিদ্ধের সঙ্গে সেক্সপিয়রের (Shakespeare) চতুর্দশপদী কবিতার যতটা বিরোধ রয়েছে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের তার থেকে বেশি বিরোধ নেই। [বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধিতা ভিক্টোরীয় যুগে খুব চালু ছিল]। ধর্ম যদি তার পরিসর ত্যাগ করে জগতের বৈজ্ঞানিক বা বর্ণনামূলক ব্যাখ্যা দিতে চায়, অথবা বিজ্ঞান যদি তার বিশেষ আলোচনার ক্ষেত্রটি অতিক্রম করে পরম সত্তার তাত্ত্বিক বা দার্শনিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করে তখনই কেবল বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে।

বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না—এমন কথা কিন্তু আমরা একবারের জন্যও বলি নি। মনুষ্যসভ্যতায় বিজ্ঞানের অবদান অতুলনীয়। ধর্ম চেষ্টা করলেও সেই অবদানকে অস্বীকার করতে পারে না। বরং ধর্ম নতুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে আত্মস্থ করতে পারে, এবং তার সেটা করা উচিতও। তার ফলে প্রয়োজন হলে ধর্মতত্ত্বকে পরিবর্তিত করা যেতে পারে। বস্তুতপক্ষে অভিজ্ঞতা এক এবং অভিভাজ্য। (অভিজ্ঞতাকে যে বহু বলা হয়, বা এক অভিজ্ঞতাকে যে অন্য অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক করা হয়, যেমন—সামাজিক অভিজ্ঞতা, বাস্তব অভিজ্ঞতা কিংবা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা—এই বিভাজন চূড়ান্ত নয়, নিতান্তই আপেক্ষিক।) জ্ঞানও এক। জীবদেহের বিভিন্ন অংগ যেমন পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ, স্বতন্ত্রভাবে যেমন তারা মূল্যহীন, সব অংগগুলি নিয়ে যেমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবদেহ গঠিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানও পূর্ণাঙ্গ। ধর্ম এবং বিজ্ঞানের সম্পর্ক তাই আন্তরিক হতে বাধ্য। তাদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে রাখা অসম্ভব। ধর্মকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে বিজ্ঞান অপরিসীম কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতিকে সঠিকভাবে জানতে আমাদের সাহায্য করেছে। এবং তার ফলে ঈশ্বরকে জানার এবং তাঁর উদ্দেশ্য বোঝার সঠিক পথটি হয়ত আমরা খুঁজে পেতে পারবো। কারণ বিশ্বনিয়মের মধ্যেই ত অনন্তের প্রকাশ। কিন্তু এর পরও আমরা বলবো যখন বিজ্ঞান এবং ধর্মের পদ্ধতিগত পার্থক্য এবং এমনকি উভয়ের মধ্যে পদ্ধতিগত বিরোধিতাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে তখনই কেবল উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্যবিধান সম্ভব হবে। কেউ কারো সঙ্গে মিলে মিশে যেতে পারে না। ধর্মকে অবশ্যই তার স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশিষ্ট অন্তর্দৃষ্টিটি বজায় রাখতে হবে।

ধর্ম ও দর্শনের সম্পর্ক এখানে, অল্প কয়েকটি লাইনে উল্লেখ করা যেতে পারে। দর্শন একদিক থেকে বিজ্ঞানের সঙ্গে অভিন্ন। কারণ দর্শনের আগ্রহ প্রধানতঃ বৌদ্ধিক। বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের পার্থক্য এই যে বিজ্ঞান অভিজ্ঞতার এক একটি দিককে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলোচনা করে। অপর পক্ষে দর্শন সমগ্র অভিজ্ঞতাকে অবিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করে। দর্শন ধর্মের মত চরম ধারণার আলোকে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাকে আলোচনা করে। তাহ'লে ধর্মের সঙ্গে দর্শনের পার্থক্য কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে—দর্শন অনেক বেশি বুদ্ধিভিত্তিক এবং তার অনুসন্ধান পদ্ধতিও পূর্বপরিকল্পিত।

কিন্তু ধর্ম সংজ্ঞাধর্মী। উপলব্ধির ভূমিকাই ধর্মে প্রধান। সুস্পষ্ট আবেগগত প্রতিক্রিয়া, আন্তরিক ঐচ্ছিক ক্রিয়া, পরম সত্তার প্রকৃতি এবং মানুষের পরিণতি সম্পর্কে বৌদ্ধিক বিশ্বাস প্রভৃতি থেকে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার জন্ম হয়। আমরা এ বিষয়ে এখানে এর বেশি আর কোন আলোচনা করবো না।

যে সাধারণ সিদ্ধান্তগুলিতে আমরা পৌঁছেছি সংক্ষেপে সেগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। (1) ধর্ম কোন বিভাগীয় আলোচনা নয়। মানুষের সকল রকম অভিজ্ঞতায় এবং সমগ্র জীবনেই ধর্ম বিস্তৃত। (2) তবু ধর্ম সর্ব-ব্যাপক হলেও সে তার স্বাতন্ত্র্য এবং প্রাধান্যকে বিসর্জন দিতে পারে না। কারণ মনুষ্য সভ্যতায় তার একটি বিশেষ অবদান আছে। তার প্রভাব সর্বত্র বিস্তৃত (হওয়াও উচিত) কারণ জীবনের কেন্দ্রভূমিটি সে দখল করে রয়েছে। এমনটি আর কেউ পারে নি। এই অধ্যায়ে সর্বত্র আমরা ধর্ম বলতে প্রধানতঃ উন্নত ধর্মকেই বুঝিয়েছি। বিভিন্ন দেশে ও কালে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কি, তার উল্লেখ এখানে করা হয় নি। আমরা এ্যারিস্টটলের (Aristotle) কথাটাই মনে রেখেছি—সমগ্র বিবর্তনের ধারায় যে স্বভাব উপস্থিত থাকে, পরিণতিতে সেই স্বভাবেরই পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে।

ধর্ম কাকে বলে? অর্থাৎ ধর্মের স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে পারলে, অন্যান্য আচরণের সঙ্গে ধর্মীয় আচরণের পার্থক্যটি বুঝতে সহজ হবে।

I

এত বিচিত্র এবং পরস্পরবিরোধী মত ধর্ম সম্পর্কে রয়েছে যে ধর্মের প্রকৃত চরিত্রটি অনুধাবন করা বেশ কষ্টকর। মর্লে (Morley) সাহেব বলেছেন ধর্মের দশহাজার সংজ্ঞা আছে। ঠিক দশহাজার না হ'লেও ধর্মের সংজ্ঞার সংখ্যা যে অনেক তার প্রমাণ পাওয়া যায় লিউবার Psychological Study of Religion গ্রন্থের পরিশিষ্টে।

বৌদ্ধিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের সংজ্ঞা

হেগেলের মতে ধর্ম একটি জনপ্রিয় দর্শন। ধর্মীয় সত্যের উপলব্ধি হয় আবেগ ও রূপকের মধ্য দিয়ে। আর প্রকৃত দর্শন বিশুদ্ধ চিন্তার সাহায্যে সত্যকে জানতে চায়। যাই হোক, হেগেলের মতে ধর্ম এক রকমের জ্ঞান, পরমব্রহ্মের জ্ঞান, বা পরম জ্ঞান। এই জ্ঞানের সাহায্যে অসীম ও সসীমের মধ্যে একটি চরম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। হেগেলের সংজ্ঞায় ধর্মের মূল্যায়নের দিকটি অবহেলিত হয়েছে। হেগেলপন্থীদের মধ্যে অনেকে ধর্মকে বিশ্বাস বলে অভিহিত করেছেন। যেমন, টাইলর বলেছেন---ধর্ম হল অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস, আবার ম্যাক্সমূলর বলেছেন, 'ধর্ম হল অসীমের প্রত্যক্ষণ বা অনুমান'।

অনুভূতির দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের সংজ্ঞা

শ্লায়ারমেকার বলেছেন, ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার অনুভূতিতেই ধর্মের মূল নিহিত। শুদ্ধ ধর্ম হল শুদ্ধ অনুভূতি। ধর্মের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। সরাসরি ঈশ্বরোপলব্ধি সম্ভব।

কিন্তু প্রত্যেক অনুভূতির একটা বিষয় থাকে। বিষয়টি বুদ্ধিগ্রাহ্য হতে পারে। কোন অনুভূতিকে তার বিষয় থেকে পৃথক করা যায় না। তাছাড়া নির্ভরতার উপলব্ধি কেবলমাত্র ধর্মীয় উপলব্ধি হবে কেন? অনেক অধর্মীয় আচরণে নির্ভরতার উপলব্ধি রয়েছে।

নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের সংজ্ঞা

অনেকে নৈতিক চেতনাকে ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে এক করে ফেলেছেন। কাণ্ট, ম্যাথু আর্ণল্ড প্রভৃতি দার্শনিকগণ মনে করেন, 'কর্তব্য পালন করাই ধর্ম''। কিন্তু তাহ'লে ঈশ্বর সম্পর্কে কোন রহস্যময় ধারণা, কিংবা প্রার্থনা, উপাসনা প্রভৃতি বিষয়গুলি অর্থহীন হয়ে যায়। আবার এগুলিকেই অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য বলে।

দেখা গেল প্রত্যেকটি সংজ্ঞায় ধর্মের প্রকৃতির আংশিক সত্য প্রকাশ পেয়েছে।

II

ধর্মের সংজ্ঞা নিরূপণের কয়েকটি আধুনিক সংজ্ঞা

সোলেমন রেইনাখ বলেছেন, ধর্ম মানেই নিয়ন্ত্রণ। "আমাদের কর্মদক্ষতার স্বাধীন প্রকাশকে বাধাদান করে যে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তার সমষ্টিকেই ধর্ম বলে"। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে তিনি টাবু বলেছেন। অর্থাৎ এই সংশয়গুলি যুক্তিহীন।

কিন্তু সকল ধর্মকে টাবু বলা যায় না। ধর্মের কাজ হল প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধকে স্বাধীনতার আনন্দে রূপান্তরিত করা। রেইনাখের সংজ্ঞাটি অনুন্নত ধর্মের বর্ণনা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু তাকে আদর্শ সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

মূল্যের ধারণা থেকে ধর্মের সংজ্ঞা

মূল্যের ধারণাই বর্তমান চিন্তাধারার মৌলিক নীতি। কাণ্ট বলেছেন, 'শুভ ইচ্ছা কোন কিছু ছাড়াই শুভ,—রত্নের মত নিজের আলোকে নিজে ভাস্বর'। কাণ্ট চরম মূল্যের মতবাদে বিশ্বাসী। তাঁর সংজ্ঞায় অনুভূতির স্থান নেই। লোটজা লিখেছেন, 'আমরা মঙ্গল বলতে যা বুঝি তা সম্পূর্ণরূপে নিহিত আছে তৃপ্তির অনুভূতির মধ্যে! অথবা সেই অনুভূতির ফলে আমরা যে আনন্দ পাই তার মধ্যে'।

অনুভূতির ভূমিকা এখানে স্বীকার করা হচ্ছে। প্রিঙ্গল প্যাটিশন এর সঙ্গে ইচ্ছাকেও যুক্ত করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষা এবং গভীরতম চিরস্থায়ী বাসনা নিবৃত্তির তৃপ্তি যাতে প্রতিবিম্বিত হয়, তাকেই চরম মূল্য বলা যায়'।

সম্পূর্ণ মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের সংজ্ঞা দান করেছেন হফ্ডিং। তিনি বলেছেন, 'মূল্যের নিত্যতার' উপর আস্থাই ধর্মের প্রধান উপাদান।

"মূল্যের নিত্যতাই হল ধর্মের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বতঃসিদ্ধ"। সকল ধর্মের বিপরীত মতবাদ হল প্রকৃতিবাদ, অর্থাৎ যে মতবাদ মূল্য সম্পর্কে উদাসীন।

হফ্‌ডিং বিশ্বপ্রকৃতিতে এমন একটি সহানুভূতিশীল জগতে বিশ্বাস করেছেন, যে জগত মানুষের মূল্যবোধগুলি সফল করার জন্য মানুষের সহায়তা করে। সর্বোত্তম মূল্য সংরক্ষণের জন্য মানুষের সাহায্য প্রয়োজন। আদর্শলাভের চেষ্টাকে যে শক্তি নিয়ন্ত্রিত করে মানুষ সেই শক্তির উপরই আস্থা স্থাপন করে।

প্রকৃতপক্ষে মানুষ বিশ্বাস করে যে তার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য প্রকৃতি তাকে অনেক সাহায্য করবে। মানুষ দৃঢ়ভাবে তাই বিশ্বাস করে শুভ বা মঙ্গলের নাশ নেই। বিজ্ঞান মনে করে বিশ্বপ্রকৃতি নিরাসক্ত। কিন্তু ধর্ম বিশ্বাস করে মূল্য সংরক্ষণের জন্য এবং মূল্য উপলব্ধির জন্য প্রকৃতি মানুষের সহায়তা করে।

হফ্‌ডিং-এর মতবাদের সমালোচনা

1. 'মূল্যের নিত্যতা' মতবাদ ধর্মীয় চেতনার সক্রিয়তার এবং উদ্দেশ্য-প্রবণতার ব্যাখ্যা করতে পারে না। হফ্‌ডিং ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে অনুভূতির সঙ্গে এক করে ফেলেছেন। ইচ্ছার সঙ্গে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কোন সম্পর্ক তিনি স্বীকার করেন নি।

2. ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্যে রয়েছে ধর্ম-চেতনার মূল বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বরই সকল মূল্যের উৎস এবং আধার। হফ্‌ডিং-এর সংজ্ঞায় এই আন্তরিক সম্পর্কটি অবহেলিত হয়েছে।

এই বিষয়ে আমাদের অভিমত হল ধর্মে একজন উপাসক ও একজন উপাস্য থাকবেই। উপাসকের চিন্তা, ইচ্ছা, অনুভূতি এবং উপাস্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস হল ধর্মের উপাদান। তাছাড়া থাকে উপাসনা। কারণ উপাসনার দ্বারা উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুতার সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

III

এখন আমরা প্রথমে ধর্মীয় বিষয় ও অধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যটি নির্ণয় করার চেষ্টা করবো। তারপর ধর্মের সঙ্গে অন্যান্য আচরণের সম্পর্ক কি তা আলোচনা করবো।

ধর্মীয় বিষয় ও অধর্মীয় বিষয়

আদিম ধর্মে মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু বিবর্তনের

ফলে ধর্ম একসময় বিভাগীয় হয়ে পড়ল। বিশেষ কিছু কিছু বিষয়কে পবিত্র বলে স্বীকার করা হল। অন্যদের বলা হয় অপবিত্র।

বর্তমান যুগে, বিজ্ঞান, কলা, নীতিবিদ্যা, ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, রাজনীতি প্রভৃতি ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। প্রত্যেকে নিজস্ব নীতিতে পরিচালিত হতে লাগল। 'ব্যবসার জন্য ব্যবসা'। এতে ধর্মের কোন ভূমিকা নেই।

এইভাবে একে একে ধর্ম থেকে সব বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে ধর্মের জন্য কি অবশিষ্ট থাকবে ? অথবা ধর্মের কাজ একদিন ফুরিয়ে যাবে ?

1. জটিল সমাজ ব্যবস্থায় পৃথকীকরণ স্বাভাবিক। কিন্তু প্রত্যেকে নিজ পরিধির মধ্যে যদি স্বাধীনভাবে নিজের কর্তব্য করে তা'হলে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না।

2. বিজ্ঞান, নৈতিকতা, কলা প্রভৃতি অধর্মীয় বিষয়গুলি যে স্বাধীনভাবে কাজ করে, এদের স্বাধীনতা কিন্তু একরকম নয়, আপেক্ষিক। এরা প্রত্যেকে খণ্ড জীবনের প্রকাশ। ধর্মই কেবল জীবনের চরম ঐক্য কামনা করে। ঈশ্বরকে আবিষ্কারের অর্থই হল সব কিছু ঈশ্বরের মধ্যে পুনরাবিষ্কার করা। জীবনের আংশিক ব্যাখ্যায় আমরা তৃপ্ত থাকতে পারি না। তাই সমস্ত বিভাগীয় আলোচনাকে একদিন ধর্মে প্রত্যাবর্তন করতে হবেই।

3. ধর্ম ও অধর্মের বিরোধের প্রয়োজন আছে। অধর্মই মূলতঃ ধর্মকে গৌরবান্বিত করে। অধর্মকে জয় করাই ধর্মের উদ্দেশ্য। ধর্ম অধর্মে বিরোধ, কেবল ভাল-মন্দের বিরোধ নয়, উত্তমের সঙ্গে সর্বোত্তমের বিরোধ। ধর্মকে জীবনের সমন্বয় সাধন করতে হবে। প্রথম ধর্মীয় ও অধর্মীয় বিষয়ের বিরোধ, পরে শুভ দৈবশক্তি ও অশুভ দৈবশক্তির বিরোধ এবং পরিশেষে পার্থিব ও অপার্থিবের বিরোধ মেটাতে হবে। তখনই জীবনের পরিক্রমা সুসম্পন্ন হবে।

নৈতিকতা, কলা, বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক

ধর্ম ও নৈতিকতা ঃ—আদিম মানব সমাজে এদের পৃথক করা যেত না। এক সময় নৈতিকতা স্বনির্ভর হয়ে উঠল। নৈতিকতা কোন অপার্থিব বিধি-নিষেধ স্বীকার করল না। নীতিবিদ্যা আর ধর্মতত্ত্বের স্বীকৃত সত্যকে প্রয়োজনীয় মনে করল না। মানুষ বিশ্বাস করল ধার্মিক না হয়েও ভাল হওয়া যায়। কোঁৎ, মিল এবং স্পেনসার ঊনবিংশ শতকে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বিদ্যার প্রচলন করেন। তাঁদের মতে নৈতিকতার সঙ্গে কিছুটা আবেগ যুক্ত করলে ধর্ম হয়ে যায়।

শ্লায়ারমেকার এই সংকীর্ণ নীতিবাদের বিরোধিতা করেছেন। ধর্ম এবং নৈতিকতার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ে এক নয়। ধর্ম ও নৈতিকতা আধ্যাত্মিক জীবনের দু'টি শরিক।

ধর্ম ও কলা ঃ—কলার আদর্শ সুন্দর। এখন কলাকে ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবা হয়। 'শিল্পের জন্য শিল্প'। কিন্তু এই পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে পরম সত্তাকে বিশ্লেষণ করাই কলার কাজ। তিনি যেমন সুন্দর তেমনি মঙ্গলময়। সৌন্দর্য পরম সত্তার একটি মৌলিক গুণ। সুতরাং ধর্ম ও কলার একটিই আলোচ্য বিষয়।

বিজ্ঞান ও ধর্ম ঃ—বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধিতার প্রসঙ্গটি বহু আলোচিত। কিন্তু ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সত্যই কি কোন বিরোধিতা আছে? আদপে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত জ্ঞানের ফলে এই বিরোধিতার কথা বলা হয়ে থাকে। ধর্ম ও বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় পরিশেষে এক। কেবল দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন, অনুসন্ধানের পদ্ধতি পৃথক। এই ভিন্নতাকে বিরোধিতা না ভেবে 'শ্রম বিভাগ' মনে করা যেতে পারে।

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তিগত ও মূল্যায়নধর্মী। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নৈর্ব্যক্তিক ও নিরাসক্ত। বিজ্ঞান পরিমাণগত পরিমাপে সন্তুষ্ট। গুণাগুণ পরিমাপে তার আগ্রহ নেই। মনুষ্য সভ্যতায় বিজ্ঞানের দান অপরিসীম। ধর্মের কাজ হল নতুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে আত্মস্থ করা। জ্ঞান এক ও অবিভাজ্য। সাময়িক-ভাবে তাকে খণ্ডিত করে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু পরিণামে এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছাতে হয়। সুতরাং বিজ্ঞান ও ধর্ম ভিন্ন পথ দিয়ে একটি লক্ষ্যের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

ধর্ম ও দর্শন ঃ--দর্শন বুদ্ধিভিত্তিক। তার অনুসন্ধান পদ্ধতি সুপরিকল্পিত। ধর্ম সংজ্ঞাধর্মী। উপলব্ধির ভূমিকা ধর্মে প্রধান।

সাধারণ সিদ্ধান্ত ঃ (1) ধর্ম কোন বিভাগীয় আলোচনা নয়। (2) ধর্ম সর্বব্যাপক হলেও সে তার স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্যকে বিসর্জন দিতে পারে না।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা 'ধর্ম কি' ? এই আলোচনাতে নিযুক্ত ছিলাম। ধর্মের উৎপত্তি, মানসিক ক্রিয়া, ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ এবং ধর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা এক এক করে আলোচনা করেছি। কিন্তু 'ধর্ম কি' ? এই প্রশ্নের আলোচনার পরই ধর্মদর্শনকে আর একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। প্রশ্নটি হল 'ধর্ম কি সত্য' ? এর মানে এই নয় যে সকল ধর্মবিশ্বাস বা সকল রকম ধর্মীয় পদ্ধতিগুলি সত্য কিনা, ধর্মদর্শন তা বিচার করবে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলে দেওয়া যায় যে সব ধর্মবিশ্বাস সত্য নয়। কারণ অনেক বিষয়ে তারা পরস্পরবিরোধী এবং প্রায়শঃ এমন সব শিক্ষা দেয় যা বুদ্ধিমান মানুষের কাছে অযৌক্তিক এবং অবাস্তব বলে মনে হতে পারে। কোন একটি বিশেষ ধর্মমত বা বিশেষ ধর্মাচরণ সত্য কিনা সেটি ধর্মদর্শনের আলোচ্য বিষয় নয়। এইসব আলোচনা করে ধর্মতত্ত্ব। আমাদের প্রশ্ন হল, ধর্ম কি সত্য ? ধর্ম বলতে এখানে আমরা সেই ধর্মকে বোঝাচ্ছি যার পূর্ব ধারণাগুলি নিয়ে আমরা আগের অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করেছি। ধার্মিকের কাছে ধর্ম যে সত্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধার্মিক ব্যক্তি সমস্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই ধর্মকে গ্রহণ করেন। ধর্মের মধ্য দিয়েই ইন্দ্রিয়াতীত পরম সত্তার প্রকাশ উপলব্ধি করা যায়। কোন ভক্ত মিথ্যা কোন কিছুকে বিশ্বাস করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, কিংবা কেবলমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত ভক্তিতেও তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। ধর্ম ভক্তের কাছে ঘুম পাড়াবার ওষুধ নয়। ধর্ম তাঁর কাছে পরম সত্তার প্রকাশ। এই পরম সত্তার সঙ্গেই মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধ সংযুক্ত। কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাস হিসেবে ধর্মকে গ্রহণ করলে তার বাস্তব সত্য প্রমাণিত হয় না। ধর্ম কোন অসুখও নয়, কিংবা ডাক্তারী শাস্ত্রের বিষয়ও নয়। মানুষের জীবনের সঙ্গে যেসব বিষয়ের সংযোগ রয়েছে তাদের অন্তর্নিহিত অর্থের মধ্যেই ধর্মের স্বীকৃতি রয়েছে। দর্শনকে এখন আলোচনা করতে হবে—ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে যুক্ত ধারণাগুলি কি যৌক্তিক ? বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের নৈতিক মূল্যগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যুগ যুগ ধরে মানুষ নিজের ব্যক্তিগত কল্পনাগুলিকেই কি বিশ্বনিয়ম বলে প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে ? অথবা ধর্মীয় ধারণা যেমন করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গ্রহণ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতপক্ষে সেইরূপ ?

এই প্রসঙ্গ আলোচনার প্রাক্কালে আমাদের একটি প্রাথমিক প্রশ্নের উল্লেখ করা প্রয়োজন। মানুষের মন কি পরম সত্তার জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ? অতীন্দ্রিয়ের স্বরূপ জানতে সে কি সক্ষম? এই প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করে তত্ত্বশাস্ত্রের একটি শাখা। এই শাখাটির নাম জ্ঞানশাস্ত্র (Epistemology)। এই শাস্ত্র মানুষের জ্ঞানের প্রকৃতি, উৎপত্তি, সম্ভাব্যতা এবং পরিধির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। পরম সত্তার প্রকৃতির সমস্যা থেকে জ্ঞানের সমস্যাকে পৃথক করা অসম্ভব। সমস্যা দু'টি ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। পরম সত্তার প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা জন্মায় তারই উপর নির্ভর করে জ্ঞানের প্রকৃতি। অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকৃতি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আমরা যে ধারণা পোষণ করি তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের পরম সত্তার জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কথাটি বিপরীত পক্ষেও সত্য। অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকৃতির উপর পরম সত্তার প্রকৃতি নির্ভর করে। পরম সত্তার আলোচনাটি শেষ অধ্যায়ের জন্য তোলা থাক। এখন আমাদের আলোচনাকে আমরা জ্ঞানের সমস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবো। প্রথম জ্ঞানের সমস্যাটি আলোচনা করব সাধারণভাবে, অর্থাৎ সকল রকম জ্ঞানের আলোচনা সেই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে, তারপর বিশেষ করে ধর্মীয় জ্ঞানের সমস্যাটি আলোচনা করবো। জ্ঞানের সম্ভাবনার প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক নয়। যদি সকল জ্ঞানই ব্যক্তিগত হয় এবং তার সাহায্যে কোন বিষয়ের বাস্তব প্রকৃতি যদি জানতে না পারা যায় তাহ'লে ধর্মীয় জ্ঞানের প্রকৃতিও যে আমরা জানতে পারবো না তাতে কোন সন্দেহ নেই। নাস্তিকেরা যখন বলে যে পরম সত্তার জ্ঞানলাভ করতে মানুষ অসমর্থ তখনই কিন্তু ধর্মের বনিয়াদ নড়বড়ে হয়ে যায়। জ্ঞানকে আমরা কতটা বিশ্বাস করতে পারবো সেই অনুসন্ধান এখন আমাদের প্রয়োজন।

I

পৃথিবীর মহান চিন্তাবিদদের মধ্যে অনেকে (সম্ভবতঃ বেশির ভাগ) সত্য আবিষ্কারের হাতিয়ার হিসেবে যুক্তির উপর অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ প্রাচীনকালের চিন্তাবিদদের মধ্যে প্লেটো (Plato), এ্যারিস্টটল্ (Aristotle) এবং বর্তমান যুগের ডেকার্টস (Descartes), স্পিনোজা (Spinoza), লাইবনিজ (Leibnitz), হেগেল, (Hegel) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সব মনীষীদের মতে সত্যের সঙ্গে চিন্তা

অথবা যুক্তির খুব একটা পার্থক্য নেই। স্পিনোজা (Spinoza) বলেছেন, 'চিন্তার সাধারণ স্বভাব হল সত্য অথবা যথাযথ যুক্তি গঠন করা'।* বেশির ভাগ চিন্তাবিদই এই ধারণা পোষণ করেন। সত্যজ্ঞান লাভ করার ক্ষমতা মানুষের আছে—এই ধারণার উপর মানুষের আস্থা আছে বলে সে বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিতে এত উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে পেরেছে। আবার, এই সাফল্য মানুষের সত্যজ্ঞান লাভের ক্ষমতার উপর আস্থাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্য ব্যক্তিগত অভিমতকেই চূড়ান্ত জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। তার সমালোচনা প্রয়োজন। যাঁরা জ্ঞানলাভের ক্ষমতায় পূর্ণ আস্থাবান তাঁরাও এ বিষয়ে সচেতন। সাধারণ অভিমত কষ্টসাধ্য চিন্তার অগ্নিতে পরিশুদ্ধ হলে তবেই তা জ্ঞানের মর্যাদা লাভ করতে পারে।

আমরা সত্যকে জানতে পারি—এই কথাটা কিন্তু সকলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে পারেন নি। যেমন প্রাচীন গ্রীসের কুতর্কী পণ্ডিতেরা (sophists) এবং নাস্তিকেরা (sceptics) মানুষের চিন্তার এই সামর্থ্যের প্রতি যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান যুগে জাগতিক জ্ঞানের যখন অভূতপূর্ব অগ্রগতি হচ্ছে, অর্থাৎ চিন্তার সাহায্যে সত্যকে জানা সম্ভব হচ্ছে, তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ঊর্দ্ধের যে অতীন্দ্রিয় সত্তা রয়েছে তার জ্ঞান লাভ করতে মানুষ সক্ষম কিনা, এরকম চিন্তাকে আজকাল অসুস্থতার লক্ষণ মনে হতে পারে। জ্ঞানশাস্ত্রীয় (epistemological) সমস্যা—অর্থাৎ মানুষ কি করে জগৎকে জানবে, অথবা আদৌ জানতে পারবে কিনা প্রভৃতি বর্তমান যুগের দর্শনের অন্যতম সমস্যা। সমস্যাটির সূচনা ডেকার্টের (Descartes) দর্শন থেকে। তিনি মন আর জগৎকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি দ্রব্য বলে মনে করেছেন। মনের চেতনা আছে; আর জগতের আছে বিস্তৃতি। যদিও কোন এক রহস্যময় শক্তির প্রভাবে তারা একসঙ্গে কাজ করে যেতে পারে, তবুও তাদের মধ্যে কোন কিছুতেই মিল নেই। ডেকার্টের (Descartes) তৈরী এই দ্বৈতবাদ, জ্ঞাতা-মন এবং জ্ঞেয়-জগতের মধ্যে এমন একটা ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে, যাকে জোড়া লাগানোর চেষ্টা আজো চলছে দর্শনে। ডেকার্ট (Descartes) নিজে নাস্তিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন বুদ্ধিবাদী। জ্ঞানের সম্ভাবনায় তাঁর

* Cited by Bosanquet, The Meeting of Extremes in Contemporary Philosophy (1921), P. 82

দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। কিন্তু লক (Locke) থেকে আরম্ভ করে ইংরেজ অভিজ্ঞতা-বাদিগণ পরম সত্তার যথার্থ জ্ঞানলাভে সন্দিহান হয়ে উঠলেন। লকের (Locke) মত যাঁরা অভিজ্ঞতাবাদী তাঁদের মতে অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। যেহেতু বিশেষ ঘটনা ছাড়া কোন সামান্য বা সার্বিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায় না তখন আজ হোক কাল হোক আমাদের সিদ্ধান্ত করতেই হবে যে সঠিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। [হিউমের (Hume) সিদ্ধান্ত] যা আমরা জানি তা সবই হল আমাদের নিজেদের ধারণা (idea)। লক (Locke) দ্রব্যে কতকগুলি প্রাথমিক বা মুখ্য গুণ আছে বলে স্বীকার করেছেন। যেমন বিস্তৃতি, গতি, স্থিতি, আকৃতি। এগুলি দ্রব্যের সঙ্গে যুক্ত। এতএব দ্রব্যের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাতার উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু প্রাথমিক গুণ ছাড়া তিনি কতকগুলি গৌণ বা অপ্রাথমিক গুণের কথা স্বীকার করেছেন। যেমন রং, শব্দ, উত্তাপ, শীতলতা ইত্যাদি। এই গুণগুলি বস্তুর সঙ্গে যুক্ত নয়। এগুলি অবাস্তব। এগুলি প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত সংবেদন মাত্র। আমরাই ভুল করে এই গুণগুলিকে বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করে থাকি। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদের পক্ষে এই মাঝপথে [অর্থাৎ কিছু গুণ বস্তুগত এবং অন্যগুলি ব্যক্তিগত] বেশি দিন থাকা সম্ভবপর ছিল না। বার্কলি (Berkeley) কিছুটা অগ্রসর হয়ে বস্তুর প্রাথমিক গুণগুলির বাস্তবতা অস্বীকার করলেন। তাঁর মতে প্রাথমিক গুণগুলিও গৌন বা অপ্রাথমিক গুণগুলির মত মনের ধারণা মাত্র। এখন জগতে মন আর তার ধারণা ছাড়া কিছু অবশিষ্ট রইল না। এইভাবে ব্যক্তিগত ভাববাদের চূড়ান্ত রূপটি প্রকাশ পেল। হিউম (Hume) অভিজ্ঞতাবাদকে আর একটু টেনে নিয়ে গিয়ে একেবারে সংশয়বাদে পরিণত করলেন। তাঁর মতে জ্ঞাতা-মন এবং জ্ঞেয়-জগৎ কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অভিমুদ্রণ ও ধারণার (Impressions and ideas) পারম্পর্য মাত্র। অভ্যাস ও অনুসঙ্গের দ্বারা তারা আবদ্ধ। কোন সর্বজনীন ও শাশ্বত সত্যের সঙ্গে ঐ ধারণাগুলি সংযুক্ত নয়। অজ্ঞাত কোন কিছু আমাদের মনে ধারণার সৃষ্টি করে। কিন্তু তা থেকে মন বা জগতের প্রকৃত স্বভাব সম্পর্কে কোন সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যায় না। এইরূপে বাস্তবতা থেকে জ্ঞান সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

হিউমের (Hume) জ্ঞানের সমস্যা-সম্পর্কিত মতবাদ একটি অচল অবস্থার সৃষ্টি করল। তার প্রভাব যে দার্শনিক কাণ্টের (Kant) উপর পড়বে

সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়। [কাণ্ট নিজেই বলেছেন হিউমের মতবাদ তাঁকে তাঁর সংস্কারের নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুলেছিল] কাণ্ট নতুন করে সমস্ত সমস্যাটি নিয়ে চিন্তা করলেন। তাঁর লক্ষ্য হল জ্ঞানকে সর্বজনীন ও অবশ্য সিদ্ধ (Universal and necessary) করে তোলা এবং সেই সঙ্গে অভিজ্ঞতাবাদের যতটুকু সত্য আছে তার প্রতি সুবিচার করা। তাঁর প্রগাঢ় গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ হল তাঁর যুগান্তকারী সৃষ্টি Critique of Pure Reason নামক গ্রন্থে। সেখানে তিনি অভিজ্ঞতাকে সম্যকরূপে বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন—কি করে জ্ঞান সম্ভব হয়? জ্ঞানের শর্ত কি? এবং জ্ঞানের পরিধি কি? যুক্তি এবং অভিজ্ঞতা এই উভয়বিধ উপাদানের উপর ভিত্তি করে যথার্থ জ্ঞান সম্ভব। এই জ্ঞানের যথার্থতা অবশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যে অথবা বৈজ্ঞানিক পরিধিতে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যে অতীন্দ্রিয় সত্তাকে প্রকাশ করছে, সেই সত্তাকে জানা এই জ্ঞানের দ্বারা সম্ভব নয়। সেই সত্তাকে জানতে গেলে আর এক রকমের জ্ঞানের প্রয়োজন। সেই জ্ঞান পূর্বতঃ সিদ্ধ (a-priori) দেশ, কাল, কার্যকারণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানের শর্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ জ্ঞানের উৎপত্তি হয় মানুষের মনে। এবং যতদূর আমরা জানি পরম সত্তাকে সে জানতে পারে না। পরম সত্তা অভিজ্ঞতার বাইরে চিরকাল থেকে যায়। এবং প্রকৃতপক্ষে তার জ্ঞান লাভ করা সম্ভবই হয়ে ওঠে না। সত্তার প্রকৃত রূপ আমরা কখনো জানতে পারি না। কেবল সংজ্ঞা যে ভাবে প্রতিভাত হয় আমরা তাকে সেই ভাবে জানতে পারি। দর্শনের ছাত্রের কাছে এসব আলোচনা অত্যন্ত পরিচিত। জ্ঞানশাস্ত্রের (Epistemology) ইতিহাসে এটি একটি সাধারণ রূপরেখা মাত্র। প্রাচীন যুগ থেকে এই আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। কাণ্টের দর্শনে তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অজ্ঞেয়বাদের (agnosticism) প্রধান উৎস হল কাণ্টের জ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা। হাক্সলে (Huxley) এবং হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) এই অজ্ঞেয়বাদের প্রধান সমর্থক। তাঁদের মতে পরম সত্তা 'অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়'। কোঁৎ (Comte) এবং প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকেরাও পুরোপুরি অজ্ঞেয়বাদী। বিগত শতক জুড়ে অজ্ঞেয়বাদের যে দুর্দান্ত প্রভাব ছিল তা এখন অবলুপ্ত হতে বসেছে। (যদিও তার জনপ্রিয়তার প্রভাব এখনো কিছুটা আছে) তাই এই মতবাদকে খণ্ডন করার জন্য আমাদের বেশি আলোচনা

করার প্রয়োজন নেই। অজ্ঞেয়বাদের মূল ত্রুটি হল, এই মতবাদ অনুসারে মানুষ এই জগতে বিদেশী, যে ধরিত্রীতে মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে, যাঁর কোলে সে আশ্রয় পেয়েছে, যেখানে সে বসবাস করছে সেই ধরিত্রীতে মানুষ বিদেশী। মূলতঃ অবচেতন মনের এই রকম একটা ধারণার উপর অজ্ঞেয়বাদ প্রতিষ্ঠিত। যুক্তি দিয়ে যদি সেই ধরিত্রীকে জানবার চেষ্টা হয় তাহ'লে জ্ঞাতার ভাগ্যে বিড়ম্বনা অনিবার্য। কারণ অজ্ঞেয়বাদীদের মতে চিন্তার রূপ বা জাতি বিদেশে নির্মিত মানসিক চশমা মাত্র।

ডারউইনের পরবর্তীকালের সকল চিন্তাভাবনার সঙ্গে এই মত বিরোধী। কারণ আমরা মানুষকে প্রকৃতির একটি অংশ বলেই মনে করি। মানুষ যদিও প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র তবুও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ধারাবাহিকতার সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃতি মানুষের কাছে বিদেশ নয়। শূন্য থেকে নিশ্চয় মানুষ জন্মায় নি। প্রকৃতি-মাতার গর্ভে সে জন্মগ্রহণ করেছে। প্রকৃতিকে স্বীকার করে নেওয়ার উপর এবং প্রাকৃতিক জ্ঞানলাভের সম্ভাবনার উপর মানুষের অস্তিত্ব নির্ভর করে। মানুষ কি ভাবে চিন্তা করবে তা বিদেশ থেকে তাকে শিখে আসতে হয় নি। জীবন সংগ্রামে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে নিরন্তর মানিয়ে নিতে নিতে এখানেই চিন্তার আকারগুলির সৃষ্টি হয়েছে। যখন আমরা জীববিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে মানুষের স্বাভাবিক ইতিহাসের কথা চিন্তা করি, জ্ঞানশাস্ত্র মানুষ এবং জগতের মধ্যে যে স্থায়ী ব্যবধান সৃষ্টি করে থাকে, তা অন্তর্হিত হয়। কাণ্টের (Kant) সমালোচনা প্রসঙ্গে হেগেল (Hegel) বলেছেন, "চিন্তা আমাদের এবং জগতের মধ্যে কোন অন্তরায় নয়, জগৎ থেকে আমাদের সে দূরেও সরিয়ে দেয় না। বরং চিন্তার ফলে জগতের সঙ্গে আমরা একাত্ম হই"। আমরাও মনে করি তাই হয়। এর সঙ্গে আমরা আর একটু যোগ করে দিতে পারি,—চিন্তা ও জগৎ, দেহ ও মন জন্মসূত্রে আবদ্ধ। তারা একে অন্যের পরিপূরক। যেহেতু জগতের সঙ্গে মানুষের আন্তরিকতার সম্পর্ক তাই সে তার সকল গোপন তথ্য জানতে পারবে। অবশ্য আমরা বলতে পারি মানুষ শেলীর (Shelley) Appollo-র মত নিজের চোখ দিয়ে নিজেকেই দেখে, 'যে চোখ দিয়ে বিশ্ব নিজেকে দেখে'। "চিন্তাশীল প্রাণীর দিকে লক্ষ্য রেখেই যেন প্রকৃতি কাজ করে চলেছে। অর্থাৎ প্রকৃতি তার একটি যন্ত্রকে ক্রমশঃ উন্নত করছে যার সাহায্যে সে নিজের সম্পর্কে নিজেই সচেতন হয়ে উঠতে পারবে এবং নিজের

অস্তিত্বের অনন্দ সে ভোগ করতে পারবে"*। জগতের কণ্ঠস্বর হিসেবে মনকে ব্যাখ্যা করার দৃষ্টিভঙ্গী, আত্মজ্ঞান ও আত্মপ্রকাশকে প্রমাণসিদ্ধ বলে গ্রহণ করা প্রভৃতিকে কিছুটা রহস্যময় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ডেকার্ট (Descartes) এর চিন্তন ও বিস্তৃতিমূলক দ্বৈতবাদ এবং কান্টের (Kant) চিন্তার সম্পর্কহীন বিশুদ্ধ পদার্থ (জগৎ) এবং পদার্থের সম্পর্কহীন বিশুদ্ধ চিন্তা (চিন্তা)-র দ্বৈতবাদ অপেক্ষা এই তথাকথিত রহস্যবাদ অনেক বেশি যুক্তিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই দ্বৈতবাদই অজ্ঞেয়বাদের মূল উৎস। যদি এরকম চিন্তা করা হয় যে সামগ্রিক অভিজ্ঞতা থেকে বাস্তব জগৎকে বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে 'মন' আবার সামগ্রিক অভিজ্ঞতা থেকে মনকে বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে 'জগৎ' তাহ'লে এই দু'টিকে অর্থাৎ জগৎ ও মনকে একত্রিত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ এদের এভাবে পৃথক করার পেছনে যথার্থ কোন যুক্তি নেই। জৈব অথবা বিবর্তনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মানুষকে জগতের অংগ হিসেবে গ্রহণ করে যখন আমরা যথোপযুক্ত আলোচনা করবো তখন আমাদের প্রমাণ করা সহজ হবে যে চিন্তার সর্বজনীনতা মনুষ্য সৃষ্ট নয়, কিংবা বাইরের থেকে আরোপিতও নয়। চিন্তার সর্বজনীনতা রয়েছে এই জগতের মধ্যেই। মনুষের মনে কেবল তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এখন দেখা যাচ্ছে অভিজ্ঞতাবাদ এবং কান্টের বিশুদ্ধ বিচারবাদ উভয়ে মিলে জ্ঞানশাস্ত্রে (Epistemology) একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্যে পরম সত্তা বা বাস্তব তত্ত্বকে যেমন জানা সম্ভব নয়, তেমনি বিশুদ্ধ চিন্তার সাহায্যেও তাকে জানা যায় না। তাহ'লে পরম সত্তাকে জানবার জন্য দর্শনকে অন্য কোন পদ্ধতির যদি অন্বেষণ করতে হয় তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ দেখা গেল উভয় পদ্ধতিই দ্রব্যের প্রকৃত স্বরূপটি আবিষ্কার করতে সমর্থ নয়। অন্য আর একটি পদ্ধতির অন্বেষণ করতে হলে আবার আমাদের কান্টের (Kant)ই শরণাপন্ন হতে হয়। তিনি তাঁর দ্বিতীয় Critique এ 'ব্যবহারিক যুক্তির' অথবা নৈতিক ইচ্ছার প্রাধান্যের উপর জোর দিয়েছেন। নৈতিক ইচ্ছা কয়েকটি চরম সত্যকে, (যেমন ঈশ্বর, স্বাধীনতা, অমরতা) পূর্বশর্ত হিসেবে স্বীকার করে নেয়। যুক্তি-তর্কের হাত থেকে দূরে সরিয়ে রেখে এদের সত্যতা এবং অস্তিত্বকে

* A. S. Pringle Pattison. The Idea of God in the Light of Recent Philosophy. (1917), P. 114. See the whole of Leat vi.

প্রথম থেকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়। যখন বিশুদ্ধ চিন্তার সাহায্যে আমরা পরম সত্তার প্রকৃতি জানতে চাই তখন আমরা অনেকটা নিরাসক্ত থাকি। তাই পরম সত্তার প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের মনে কিছুটা সন্দেহ থেকে যায়। কিন্তু আমাদের নৈতিক চেতনা নিজের অস্তিত্ব এবং যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য পরম সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণে আগ্রহী। পদ্ধতি হিসেবে 'বিশুদ্ধ চিন্তা' যে আদর্শ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই পদ্ধতি দিয়ে পরম সত্তাকে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা সম্ভব নয়। অপরপক্ষে নৈতিক ইচ্ছা নিজেই পরম সত্তার সক্রিয় উপাদান। এর সাহায্যে সত্যে পৌঁছানোর একটা পথ পাওয়া যায়। অবশ্য প্রকৃত অর্থে একে জ্ঞান নাও বলা যেতে পারে। কিন্তু নৈতিক নিয়মের শর্ত-নিরপেক্ষ আদেশকে যথার্থ হতে হলে তার পূর্ব-শর্তগুলিকেও অবশ্যই যথার্থ হতে হবে।

কাণ্টের শিক্ষা থেকেই অনেক রকমের স্বজ্ঞাবাদ (Intuitionism) এবং স্বেচ্ছা-বাদের (voluntarism) উৎপত্তি হয়েছে। এই মতবাদগুলি পরম সত্তাকে জানবার জন্য বিশুদ্ধ চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতির অনুসন্ধান করে। বর্তমান যুগে তাই যুক্তিবিরোধী প্রবণতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। অনেকে মনে করেন স্বজ্ঞার সাহায্যে সরাসরি পরম সত্তার উপলব্ধি সম্ভব। এই মতবাদের পথিকৃৎ হলেন সোপেনহাওয়ার (Schopenhouer)। তাঁর মতবাদের সঙ্গে কাণ্টের নৈতিক মতবাদ সংযুক্ত। তিনি মনে করেন স্বজ্ঞার সাহায্যে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে একটা তাৎক্ষণিক ধারণা লাভ করা সম্ভব। এখানে চিন্তার কোন ভূমিকা নেই। বস্তুতপক্ষে ইচ্ছাই এখানে চরম সত্য। আত্মার স্বরূপের সরাসরি জ্ঞান আমরা ইচ্ছার সাহায্যেই লাভ করতে পারি। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত অর্থের স্বজ্ঞা-মূলক বিশ্লেষণের মূল চাবিকাঠিটি রয়েছে ইচ্ছার মধ্যে। এখন আমরা কাণ্টের স্বলক্ষণ বস্তু বা শুদ্ধ বস্তুর (thing-in itself) সঙ্গে এই ইচ্ছাকে এক করে দিতে পারি। অর্থাৎ পরম সত্তাকে আমরা আত্মসংরক্ষণকারী এবং জীবন পরিবর্ধন-কারী বাসনা হিসেবে বুঝতে চেষ্টা করবো। এই বাসনা মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছার রূপ ধরে নিজেকে প্রকাশ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে বের্গস (Bergson) তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে সোপেনহাওয়ারের (Schopenhouer) স্বজ্ঞাবাদের উন্নতি সাধন করেন। তিনিও মনে করেন পরম সত্তাকে যৌক্তিক চিন্তা-ভাবনা দিয়ে জানা যাবে না।

আমাদের চেতনাকে যেমন আমরা সরাসরি জানতে পারি পরম সত্তার জ্ঞানও আমাদের পক্ষে সেইভাবে লাভ করা সম্ভব। "আমাদের নিজেদের আত্মার যে স্বচেতনতা রয়েছে, সেই স্বচেতনতা ধারাবাহিক প্রবাহের মাধ্যমে পরম সত্তার অন্তর্নিহিত দিকটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে আমরা অন্য সত্তাকেও প্রকাশ করতে পারি। যদি আমরা প্রবণতাকে একটা প্রারম্ভিক দিক পরিবর্তন হিসেবে স্বীকার করে নি তাহ'লে সকল সত্তাকেই প্রবণতা বলা যায়"*। পরম সত্তা যখন মূলতঃ পরিবর্তন, বা প্রবাহ বা গতিশীলতা, তার প্রকৃতির জ্ঞান কেবল স্বজ্ঞা দ্বারাই লাভ করা সম্ভব। মনে যে ক্রমাগত প্রবাহ চলেছে তার সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হওয়ার পদ্ধতিকে স্বজ্ঞা বলে। বুদ্ধি পরম সত্তার স্বরূপকে বিকৃত করে; তার মিথ্যা বর্ণনা দেয়। কারণ বুদ্ধির প্রবণতাই হল অবিভাজ্য প্রবাহকে ভেঙ্গে ফেলে কতকগুলি গতিহীন খণ্ডের সমষ্টি করে তোলা এবং কতকগুলি স্থির ধারণা লাভ করা। বুদ্ধি পরম সত্তার কতকগুলো টুকরো টুকরো ছবি দিতে পারে। সেগুলো প্রকৃতপক্ষে গতিশীলের নিশ্চল ছবি। বুদ্ধি জ্ঞানলাভের জন্য সময়ের প্রবাহকে রুদ্ধ করে বিশ্লেষণ করে। তার ফলে পরম সত্তার স্বরূপ উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। বুদ্ধি কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয়, জড় ও গতিহীনদের নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এবং সেই আলোচনায় জ্যামিতি ও তর্কশাস্ত্র তাদের পূর্ণতা লাভ করতে পারে। বুদ্ধি অবশ্য গতির ধারণার অনুকরণ করতে পারে। সিনেমায় যেমন কতকগুলো স্থির ছবিকে পর পর সাজিয়ে একটা গতির ভ্রম সৃষ্টি করা হয়, বুদ্ধিও তেমনি মনের বিমূর্ত গতির ধারণার উপর কতকগুলো গতিহীন টুকরো সাজিয়ে দিতে পারে। সিনেমার ছবিগুলিও যেমন স্থির, বুদ্ধির আলোচ্য বিষয়গুলিও অনুরূপভাবে স্থির এবং গতিহীন অবস্থায় থাকে। বুদ্ধি কালকে একটা দেশের মধ্যে আবদ্ধ করে এবং জীবনকে যন্ত্র করে তোলে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের (Wordsworth) এই কথাগুলিতে বের্গসঁ (Bergson) এর সমর্থন পাওয়া যাবে।

"আমাদের অনধিকারচর্চী বুদ্ধি
সুন্দর জিনিসের আকৃতিগুলোকে বিকৃত করে দিয়েছে;
আমরা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে (সুন্দরকে) খুন করেছি"

তাহ'লে পরম সত্তাকে জানার পথ আমরা তর্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান বা কোন বিশ্লেষণমূলক

---

* Henri Bergson, An Introduction to Metaphysics (E. Tran. 1913), PP. 55f.

চিন্তায় খুঁজে পাবো না। এই পথের সন্ধান পাওয়া যাবে স্বজ্ঞায়। "কিন্তু স্বজ্ঞা এক ধরনের বৌদ্ধিক সহানুভূতি। এর সাহায্যে একজন নিজেকে নিজের মধ্যে স্থাপন করে একসঙ্গে অবস্থান করতে পারে। সে এক আশ্চর্য অবস্থা। তার প্রকাশ সম্ভব নয়। বিপরীতপক্ষে বিশ্লেষণ একটি বিষয়কে জ্ঞাত উপাদানে পর্যবসিত করে। সেই উপাদান একটি বিষয়ে যেমন থাকে অন্যান্য বিষয়েও তেমনি থাকে।"* যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা অপেক্ষা সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে স্বজ্ঞার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর। সহজাত প্রবৃত্তি আমাদের কর্মে নিয়োজিত না করে, আসক্তিহীন আত্মসচেতন জ্ঞানে পরিণত হতে পারে এবং জীবনের গোপনতম রহস্যের সন্ধান দিতে পারে। শিল্পীর সৌন্দর্য উপলব্ধির ক্ষমতা এবং মহৎ কবির উন্নততর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে এই সহজাত প্রবৃত্তির সাদৃশ্য আছে। কবির অন্তর্দৃষ্টিও কোন জিনিসকে বাইরে থেকে টুকরো টুকরো করে দেখে না। বরং সহানুভূতির সঙ্গে সত্তার সামগ্রিক গতিশীলতার মধ্যে বিষয়টিকে এক করে দেখে। বুদ্ধি বাস্তব এবং কর্মমুখী। কিন্তু স্বজ্ঞার কোন উপযোগিতা-মূলক লক্ষ্য নেই। তাই তার দ্বারা নিরাসক্ত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। স্বজ্ঞায় জ্ঞাতা সত্তার প্রবাহের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করে, সত্তার মধ্যে থেকে সত্তাকে জানে এবং অবশেষে তার সঙ্গে এক হয়ে যায়।

বের্গস (Bergson)র পরম সত্তার স্বরূপ সম্পর্কিত মতবাদ আলোচনা করার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। পরম সত্তাকে জানার যে সম্ভাবনা তাঁর মতবাদে রয়েছে সেইটুকুই কেবল আমাদের আলোচ্য বিষয়। যদিও বের্গস (Bergson) ধর্মীয় জ্ঞানের সমস্যা নিয়ে কোন আলোচনা করেন নি তাহ'লেও তিনি, যুক্তি-সিদ্ধ চিন্তা অপেক্ষা সরাসরি পরিচিতির মধ্য দিয়ে পরম সত্তাকে জানা যায় বলে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার সঙ্গে ধর্মীয় রহস্যবাদের অনেক সাদৃশ্য আছে। শুধু তাই নয়, এই মতবাদকে রহস্যবাদের দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্মীয় ধারণা হল যে 'আধ্যাত্মিক বিষয়কে আধ্যাত্মিকভাবে বিচার করতে হবে'। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতাকে বুঝতে হলে তার মধ্যে বসবাস করে তবে সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে, বাইরে থেকে কেবল প্রত্যক্ষ করে বুঝতে চাইলে তাকে বোঝা সম্ভব হবে না। তার অর্থ ব্যক্তিসত্তাকে

* Bergson, opcit. P. 6. For the Cinematographical machanism of Thought, see his creative Evolution. (E. T. 1910) Chap. IV.

পরম সত্তার সঙ্গে একেবারে এক করে দিতে পারলে তবেই কেবল পরম সত্তাকে বোঝা যায়। পরম সত্তার জ্ঞানলাভ সম্ভব কিনা,—এই প্রসঙ্গে বেগস (Bergson) বলেছেন, জ্ঞান বলতে যদি বৌদ্ধিক জ্ঞান (অর্থাৎ যে জ্ঞানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় স্বতন্ত্র) বোঝায় তাহ'লে তা সম্ভব নয়। কারণ স্থিতিশীল সত্তাকেই কেবল বুদ্ধি দিয়ে জানা যেতে পারে। কিন্তু সত্তা যেখানে অনন্ত প্রবাহ তার জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে লাভ করা অসম্ভব। তাহ'লেও পরম সত্তার একটা যৌক্তিক ধারণা লাভ করা যায়। জ্ঞানের সাহায্যে যদিও আমরা সেই ধারণা লাভ করতে পারি না, কিন্তু স্বজ্ঞার সাহায্যে তা লাভ করা অসম্ভব নয়। তাহ'লে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরম সত্তার জ্ঞান লাভ সভব বলে ধর্ম যে দাবি করে বেগস (Bergson) র দর্শনের সঙ্গে তার কোন অসঙ্গতি নেই। কারণ সত্যকে কোন্ পদ্ধতিতে জানা যাবে, এ সমস্যা ধর্মের কাছে গৌণ। যে কোন প্রকারে সত্যকে জানা, বা সত্যোপলব্ধিই তার মূল লক্ষ্য। যে সব মতবাদে মানুষের অভিজ্ঞতা এবং দ্রব্যের প্রকৃত সত্তাব মধ্যে একটা ব্যবধান রচনা করা হয়, এবং মন্তব্য করা হয় যে পরম সত্তা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় মানুষের জ্ঞানের সাধ্যাতীত, সেই সব মতবাদই ধর্মকে অসম্ভব বা মায়া বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। বেগস'র মতবাদে এই ব্যবধান স্বীকৃত নয়। কারণ স্বজ্ঞার দ্বারা দ্রব্যের গভীরে তার অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব—এই বিশ্বাস ধর্মীয় চিন্তাকে অনেকখানি নিরাপত্তা প্রদান করেছে। তাছাড়া বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে বেগস'র (Bergson) প্রতিবাদও যথার্থ। কারণ বুদ্ধিবাদীরা ভুলে যান যে সত্যের উপলব্ধির জন্য সমগ্র চেতনার সক্রিয়তা প্রয়োজন। কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন চিন্তার দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। সমগ্র ব্যক্তিত্ব দিয়ে 'সত্য'কে জানা যায়। স্বজ্ঞাকে বুদ্ধি অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক বলে মনে করা হয়। স্বজ্ঞাকে বলা যেতে পারে—'আবেগে পরিপ্লুত বুদ্ধি' অথবা 'বিষয়ের সঙ্গে গভীর সহানুভূতিতে দ্রব চিন্তা' কিংবা হৃদয় ও মস্তিষ্কের যুগ্ম ক্রিয়া। ব্যক্তি তার সমগ্র সত্তা দিয়ে যখন সত্যকে জানতে চায়, তখন সে তার জ্ঞান লাভ করতে পারে। অনেকগাল ভারি যুক্তি শোনার পরও তার সেই জ্ঞান হত না। এই সব যুক্তিই ওমর খৈয়ামকে সত্যের মন্দির থেকে এখনো দূরে সরিয়ে রেখেছে।

পরম সত্তার উপলব্ধি প্রসঙ্গে চিন্তার যান্ত্রিক বন্ধন থেকে মনকে মুক্ত করে বেগস (Bergson) একটি বিরাট কাজ করেছেন। কিন্তু এই কাজ করতে

গিয়ে তাঁকে চিন্তা ও স্বজ্ঞার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করতে হয়েছে এবং তার ফলে জ্ঞানের অর্থ এবং পরিধি অকারণে অত্যধিক সংকীর্ণ হয়ে গেছে। তিনি যথেচ্ছভাবে যুক্তিকে কেবল গতিহীনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং তারপর চরম সত্যের অন্বেষণে যুক্তির ভূমিকার ব্যর্থতার দিকটিকে প্রকট করে তুলেছেন। কিন্তু জ্ঞানলাভের অন্যান্য পদ্ধতি ও চিন্তার মধ্যে এই ধরনের কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। কেবলমাত্র গণিত এবং পদার্থবিদ্যাতে চিন্তা চরম সাফল্য লাভ করেছে এ কথাও ঠিক নয়। জীবনের প্রায় সকল সমস্যাতেই বুদ্ধির সফল ভূমিকা রয়েছে। যা কিছু স্থিতিশীল, কেবল তার মধ্যেই চিন্তা সীমাবদ্ধ নয়, চিন্তা গতিশীলও। সে জীবনের গতির সঙ্গে এবং নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য নিজেকে খাপ খাইয়েও নিতে পারে। চিন্তার ক্ষেত্রে দেশ, পরিমাণ প্রভৃতি যেমন সত্য, তেমনি সত্য গতি, উদ্দেশ্য, মঙ্গল, সৌন্দর্য ও জীবন। চিন্তা ছাড়া প্রকৃতি বিজ্ঞান যেমন অচল, তেমনি নীতিশাস্ত্র, কলাবিদ্যা; ধর্ম এবং দর্শনেও চিন্তা অপরিহার্য। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে প্রকৃতি বিজ্ঞানে চিন্তা যতটা সুনিশ্চিত এবং সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে পারে, কলা, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতিতে চিন্তা ততটা সফল নয়। কিন্তু তার একমাত্র কারণ হল, কলা, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতির আলোচ্য বিষয় প্রকৃতি বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় অপেক্ষা অনেক বেশি জটিল ও অস্পষ্ট। সেইজন্য সাফল্যও কিছুটা অনিশ্চিত এবং কষ্টকর। প্রকৃতি বিজ্ঞানে চিন্তার সাফল্যের অন্যতম কারণ হল সেখানে চিন্তা যথেচ্ছ বিমূর্তনের সাহায্যে সমস্যাগুলিকে সহজতর করে তুলতে পারে। কিন্তু সে ধরনের বিমূর্তন (অর্থাৎ সংখ্যা, চিহ্ন প্রভৃতির প্রয়োগ) কলা, ধর্ম দর্শন প্রভৃতিতে সম্ভব নয়। প্রকৃতি বিজ্ঞানে বুদ্ধি যেমন যথেচ্ছ বিমূর্তনের সাহায্যে সমস্যাকে সহজতর করে জানতে চায় কিংবা বিভিন্ন অংশে ভাগ করে বুঝতে চায়, সেই রকম জ্ঞানলাভের স্বাভাবিক তীব্র আকাঙ্ক্ষায় বুদ্ধি নিজের বিমূর্তনকে সংশোধন করে সম্পূর্ণ মূর্ত সত্তাকে জানবার চেষ্টা করে। বিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণ ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য চিন্তার উদ্ভব হয়েছে বলে যাঁরা মনে করেন তাঁরা চিন্তার প্রকৃতিকে যথেচ্ছভাবে প্রকাশ করেন। স্বজ্ঞাকেও চিন্তার থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ভাবা যুক্তিযুক্ত নয়। চিন্তা এবং স্বজ্ঞার মধ্যে কোন ছেদ নেই। আর যদি সেই রকম বিচ্ছিন্নতার উপর জোর দেওয়া হয় তাহ'লে স্বজ্ঞাকে কেবলমাত্র নির্জ্ঞান মনের প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত বলে মেনে নিতে হবে। চিন্তার সংস্পর্শ ব্যতীত স্বজ্ঞা অস্পষ্ট অনুভূতি এবং

মূক ও অস্ফুট প্রবৃত্তি মাত্র। বুদ্ধিকে ত্যাগ করার অর্থই হল আবার সেই অস্পষ্ট নীহারিকার রাজত্বে পৌঁছানো এবং আদিম আবেগ ও ভাবপ্রবণতার বন্যাকে মুক্ত করে দেওয়া। বুদ্ধি ব্যতীত স্বজ্ঞা নিতান্তই নিজস্ব, ব্যক্তিগত এবং অবর্ণনীয়। বেগসঁ (Bergson) নিজেই স্বীকার করেছেন স্বজ্ঞা তখন প্রকাশ-যোগ্য নয়। কিন্তু সত্য হল সামাজিক, সার্বিক, বাস্তব এবং বর্ণনীয়। সত্যে সকলের অধিকার। চিন্তন পদ্ধতির সাহায্যেই কেবল স্বজ্ঞালব্ধ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দান করা সম্ভব। তখনই কেবল রহস্যবাদের ফ্রেমে মোড়া ব্যক্তিগত কালো টাকাগুলি সচল মুদ্রায় পরিণত হয়ে মহত্তর সামাজিক কর্তব্য পালন করতে পারে।

এই আলোচনার প্রভাব ধর্মীয় সমস্যার উপর কিভাবে পড়ে তা এখন আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করবো। বেগসঁ (Bergson) স্বীকার করেছেন আমরা পরম সত্তার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি এবং ধর্মীয় চেতনাও দাবি করে যে সেও পরম সত্তার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। যদি আমরা পরম সত্তার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি তাহ'লে সেই অভিজ্ঞতাকে মোটামুটি স্পষ্ট 'ধারণায়' রূপান্তরিত করা থেকে আমাদের কেউ নিবৃত্ত করতে পারবে না। আজ হোক কাল হোক সেটা অমরা করবোই। তাহ'লে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এবং ধর্মীয় ধারণার মধ্যে কোন মৌলিক অথবা অপরিহার্য ভিন্নতা রয়েছে একথা আমরা স্বীকার করতে পারি না। অথবা ধর্মীয় জ্ঞান থেকে প্রকৃত জ্ঞান সম্ভব নয় একথাও অমরা স্বীকার করতে পারি না। কারণ এই ধারণা জ্ঞানবিরোধী মতবাদ বা এক ধরনের সংশয়বাদের নামান্তর। আমরা অবশ্যই বেগসঁ'র (Bergson) উপদেশ স্মরণ রাখবো। আমাদের ধারণা যেন অপরিবর্তন-শীল, স্থায়ী বা ছাঁচে ঢালা না হয়ে পড়ে, আমাদের যেন জীবনের পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার মত নমনীয়তার অভাব না ঘটে,—এই সব দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। কিন্তু বৌদ্ধিক ধারণার স্থান একটা অবশ্যই থাকবে। তা নাহ'লে ধর্ম, অন্ধ, স্থূল এবং অস্পষ্ট ধারণার কুক্ষিগত হয়ে পড়বে। পরম সত্তাকে ধর্মীয় ধারণা কতটা প্রকাশ করতে পারবে সেটাই হল ধর্মদর্শনের প্রধান সমস্যা। বর্তমান অধ্যায়ে অবশ্য বিষয়টি আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়।

আর এক ধরনের বুদ্ধিবিরোধী আন্দোলনের নাম প্রয়োগবাদ (Pragmatism)। বেগসঁ'র মতের সঙ্গে এই মতবাদের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে। কাণ্টের (Kant)

ব্যবহারিক যুক্তি থেকে প্রয়োগবাদেরও উৎপত্তি হয়েছে। উইলিয়ম জেম্‌স (William James) বলেছেন, 'বিশ্বাস করার ইচ্ছা'। কাণ্ট প্রতিভাস ও নিত্যতার মধ্যে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে যে পার্থক্য নির্ণয় করেছিলেন, প্রয়োগবাদে কিন্তু তা নেই। প্রয়োগবাদের মূল বক্তব্যগুলি সর্বজন-পরিচিত। এই মতবাদে ইচ্ছার স্থান বুদ্ধির আগে। সকল চিন্তা ব্যক্তিগত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ধারণাগুলি পূর্ব-অবস্থিত কোন সত্তার কল্পরূপ নয়; এগুলি জীবনযাত্রার হাতিয়ার বিশেষ। এমন কি গণিতশাস্ত্র যে সত্য প্রকাশ করে অথবা প্রাকৃতিক নিয়মে যে সত্য প্রকাশিত হয়, তারা কোন পরম সত্তার প্রতিরূপ নয়। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে ঐ সত্য সৃষ্টি করেছে। ওগুলি মনুষ্য নির্মিত যন্ত্র মাত্র। যন্ত্রের যেভাবে মূল্যায়ন করা হয় এই সব সত্যেরও সেইভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। [কোন যন্ত্র যে উদ্দেশ্যে নির্মিত, সেই উদ্দেশ্যটি যদি সুন্দর ও সহজভাবে সাধন করতে পারে, তখন আমরা যন্ত্রটিকে ভাল বলি আর তাতে যদি সে ব্যর্থ হয় অর্থাৎ যন্ত্রটি দিয়ে যদি কাজ না পাওয়া যায়, আমরা বলি মন্দ। গাণিতিক এবং প্রাকৃতিক নিয়ম আমাদের জীবনে যেভাবে কাজে লাগবে সেইভাবে হবে তাদের মূল্যায়ন।] যে ধারণায় কাজ হয়, সে ধারণা সত্য। ধারণার উপযোগিতা দেখে তার প্রকৃতি নির্ধারণ করতে হবে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে সত্য মনুষ্যনির্মিত যন্ত্র মাত্র। তার সাহায্যে ঘটনাবলীকে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা যায়। পরম সত্তার কাছে আমরা এই দাবিই করে থাকি। পরম সত্তা একটা সার্থক পূর্ব-ধারণা। "সত্য কোন বিশেষ অবস্থায় কতখানি প্রয়োজনীয় অথবা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির ক্ষেত্রে তার মূল্য কতখানি তার উপর সত্যের সার্থকতা নির্ভর করে। আমরা সত্য থেকে আর কিছু চাই না"* অতএব প্রয়োগবাদীরা উপযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গীতে বেগস'র (Bergson) সঙ্গে একমত। এই মত সম্পূর্ণভাবে ব্যবহারিক এবং এর একমাত্র লক্ষ্য হল কর্মের কুশলতা লাভ করা। বেগস'র সঙ্গে এই মতবাদের পার্থক্য হল এই যে স্বজ্ঞার সাহায্যে সত্যোপলব্ধি করা যায় এরকম কোন সম্ভাবনার স্থান প্রয়োগবাদে নেই। যে সত্যের কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই তাকে নিয়ে এই মতবাদ কোন আলোচনা করে না। প্রয়োগবাদীদের মতে উদ্দেশ্যহীন (অথবা প্রয়োজনহীন) সত্যজ্ঞান লাভ একটা অবাস্তব কথা। কোন ধারণা বা

* F. C. S. Schiller, Riddles of the Sphinx, P. 133.

কোন সিদ্ধান্তের পেছনে যদি কোন উদ্দেশ্য না থাকে অথবা কোন আগ্রহ না দেখা যায় তাহ'লে বাস্তব জগতে তার কোন অস্তিত্ব বা অর্থ থাকতে পারে না। ওগুলি নিতান্তই গল্প কথা। কোন সত্য আগে থেকে আছে, আমাদের সেই সত্যকে জানতে হবে, এমন কোন সমস্যা আমাদের নেই। কারণ সত্যকেও আমরা তৈরী করছি। জ্ঞান লাভ করতে গিয়ে সত্যকে সৃষ্টি করতে হয়েছে। সত্য কোন আবিষ্কার নয়। সত্য বলে কিছু ছিল না, সুতরাং তাকে আবিষ্কারের কথাও ওঠে না। যথার্থতা প্রতিপাদন করা বা সত্য কিনা প্রমাণ করা সত্যানুসন্ধান নয়, সত্য সৃষ্টি করা। সত্য সৃষ্টি করা এক অর্থে সত্তাও সৃষ্টি করা। জ্ঞান মানে তাহ'লে পরম সত্তার অনুকরণের পদ্ধতি নয় অথবা পরম সত্তা-সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনাও নয়। জ্ঞান হল পরম সত্তাকে আমাদের উদ্দেশ্যানুযায়ী সৃষ্টি করা। এই মত স্বীকার করলে জ্ঞান ও সত্যের মধ্যে অথবা সত্তা ও প্রতিভাসের মধ্যে যে পার্থক্যের প্রশ্নটি সাধারণতঃ আলোচিত হয় তার আর কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

প্রয়োগবাদ সত্যের যান্ত্রিক চরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করে একটি মূল্যবান কাজ করেছে সন্দেহ নেই। ব্যক্তিগত সংস্কার ও রুচিমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত-ভাবে সত্যের জন্য সত্যানুসন্ধান একটি মহৎ আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবে উদ্দেশ্যহীন হয়ে সত্যানুসন্ধান করা সম্ভব নয়। যার সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই এবং যা আমাদের কোন প্রয়োজনে লাগবে না, আমাদের কাছে মূলতঃ তার কোন অস্তিত্বই নেই। প্রকৃতপক্ষে সত্য নিজেই একটি মূল্য। মানুষ তার প্রতি আগ্রহী। সত্যের সাহায্যে মানুষের উদ্দেশ্যও সাধিত হয়। এছাড়া আমরা প্রয়োগবাদের সত্য নির্ণয়ের মানকেও গ্রহণ করতে পারি। কোন বিষয়ের সত্যতা ব্যবহারিক ফলাফলের উপর নির্ভর করে। যথার্থতা সংকীর্ণ উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নির্ধারিত হয় না। আমাদের প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং সামগ্রিক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সত্যাসত্য নির্ণীত হয়।

কিন্তু চরম প্রয়োগবাদে কতকগুলি কূটাভাস আছে। তাছাড়া সত্য অনুসন্ধানের বিষয় নয়, সত্যকে সৃষ্টি করা হয়—এই ধরনের উক্তি সমস্ত জ্ঞানকে ব্যক্তিগত করে তোলে এবং নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে। এই দৃষ্টিভঙ্গী চরম সত্যকে এমনকি বস্তুগত সত্যকেও অস্বীকার করে। কোন একটা বিশেষ অবস্থায় যদি প্রাসঙ্গিক না হয় তাহ'লে কোন বিষয়কে সত্য বলা যাবে না,—এর অর্থ হল যখন

অবস্থার পরিবর্তন হবে, যা একদা সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছিল এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাকে আর সত্য বলা যাবে না, অথবা আগে যাকে সত্য বলে গণ্য করা হত না এখন তাই সত্য হয়ে উঠবে। এর আরও একটা অর্থ হল এক সময়ে যা একজনের কাছে সত্য তাই অন্য জনের কাছে মিথ্যা হয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ খৃষ্টীয় সমাজের একটি বিশ্বাসের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। যীশুখৃষ্টের দেহের রক্ত ও মাংস তাঁর আত্মোৎসর্গের পর যথাক্রমে মদ্য ও খাদ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল। ক্যাথলিকগণ এই ঘটনা বিশ্বাস করেন। তাঁদের কাছে ঘটনাটি সত্য। কিন্তু প্রোটেস্টান্টগণ ঘটনাটি বিশ্বাস করেন না। এই ঘটনাকে সত্য বলে স্বীকার করলে ক্যাথলিকদের একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু প্রোটেস্টান্টগণ এই ঘটনার কোন তাৎপর্য অনুভব করেন না।

আমরা পরম সত্তাকে সৃষ্টি করি—এই কথাটির মধ্যে প্রয়োগবাদের আর একটি কূটাভাস রয়েছে। এর একটি অর্থ হল সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদেরও একটা ভূমিকা আছে। সেই সঙ্গে আর একটি বিষয় স্বীকার করে নিতে হবে—পরম সত্তা অসম্পূর্ণ। পরম সত্তার সৃষ্টি এখনো হচ্ছে, এই সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদেরও করণীয় আছে। আমরা একটা সৃষ্টিকর্মে নিযুক্ত—এ বিষয়টা যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি তাহ'লে অবশ্যই আমাদের স্বীকার করতে হবে যে একটা মর্যাদাবোধ ও দায়িত্ববোধের অতিরিক্ত স্বাদ আমরা গ্রহণ করতে পারবো।

কিন্তু যে সত্তা আগে থেকে রয়েছে এবং যার নিয়ম আমরা মানতে বাধ্য তার দ্বারা আমাদের সৃষ্টিও নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য। ঐ নিয়মগুলি অনুসরণ না করলে কোন বিষয় সম্পর্কে আমরা কোন ধারণাই লাভ করতে পারি না। জগতের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে তবেই আমাদের ধারণা সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে পারে। বেকন (Becon) যেমন বলেছিলেন,—প্রকৃতিকে অতিক্রম করতে হলে প্রকৃতির আনুগত্য স্বীকার করতে হবে ; জয় করতে হলে আগে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। পরম সত্তা অনির্দিষ্ট, পরিবর্তনশীল, এবং আমাদের ইচ্ছার দ্বারা সৃষ্ট—এই মতের মধ্যে কিছুটা সত্য থাকতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এই মত মেনে নেওয়া যায় না। ওমর খৈয়াম ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন, 'বিশ্বচরাচরের সমস্ত কিছুকে খণ্ড বা টুকরো হিসেবে স্বীকার করা নিরর্থক'। তাই তিনি ঈশ্বরের মনের মত করে তার পুনর্গঠন করেছিলেন। "…আমাদের জগৎ সৃজনের পেছনে ঈশ্বরের পরিপূর্ণ সহ-

যোগিতা রয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের কোন ভূমিকা নেই। চরম অভিজ্ঞতাবাদ বিশ্বপ্রকৃতিতে যে ভাবে আছে তাকে সেই ভাবে গ্রহণ করে। সেইরকম অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগতের সব কিছুকে অপরিবর্তনীয় বা সৃষ্টির অযোগ্য বলে স্বীকার করার মনোভাব মানুষের মর্যাদা এবং প্রকৃত ধর্মের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়"।* মার্গারেট ফুলার (Margaret Fuller) বলেছেন, 'আমি ব্রহ্মাণ্ডকে স্বীকার করি। কার্লাইল (Carlyle) মন্তব্য করেছেন, 'ঈশ্বর ভালই করেছেন'। জ্ঞানেব সমস্যা (অর্থাৎ যে বিষয়ে বর্তমানে আমরা আলোচনা করছি) মানেই বিশ্বনিয়মের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করা। অর্থাৎ বিশ্বনিয়মের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করলে তবে জ্ঞানের সমস্যা বিষয়ে আলোচনা সম্ভবপর হয়। অথবা জ্ঞানের সমস্যা কথাটি অর্থবহ হয়ে ওঠে। আমাদের কাজ হল সেই বিশ্বনিয়মকে বোঝার চেষ্টা করা। কিন্তু জানতে গিয়ে আমরা তাকে সৃষ্টি করতে পারি না। প্রয়োগবাদের আলোচনা থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে বরং পৌঁছাতে পারি—সিদ্ধান্তটি হল যে জ্ঞানলাভের পদ্ধতির সঙ্গে সত্তাকে এক করে দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা যদি জ্ঞানের একটি উপাদানকে অর্থাৎ পরম সত্তাকে সরাসরি অস্বীকার করি তাহ'লে এই একীকরণ সম্ভব হতে পারে।... কিন্তু পরম সত্তাই জ্ঞানলাভের বিষয়। পরম সত্তাই আমাদের পরম জ্ঞেয়।

আধুনিক কালের দার্শনিক চিন্তার নব্য বস্তুবাদের প্রতি একটা বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ইংলণ্ডের আলেকজাণ্ডার (S. Alexander) এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russell) এবং আমেরিকার ছয়জন দার্শনিক এই নব্য বস্তুবাদের সমর্থক। আমেরিকার দার্শনিকেরা একত্রে The New Realism (1912) নামে একটি বই লেখেন। এই নব্য বস্তুবাদিগণ এক দিকে প্রয়োগবাদে জ্ঞানের সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করার ফলে প্রয়োগবাদীরা যে কলঙ্ক সৃষ্টি করেছেন তা মোচন করতে চান, আবার অন্যদিকে বার্কলি (Berkeley) এবং কাণ্টের (Kant) ভাববাদ অথবা এই ভাববাদের সমর্থকেরা জ্ঞানের যে দূষিত অবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন তার সংস্কার সাধন করতে চান। অবশ্য তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অধৈর্য হয়ে জ্ঞানবিষয়ক সমস্ত সমস্যাটাকেই উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। তাঁদের ধারণা এই জ্ঞানশাস্ত্রই (Epistemology)

* W. E. Hocking. The Meaning of God in Human Experience (1912), p. xviii

দর্শনকে ব্যক্তিগত জ্ঞানের নোংরা পরিবেশে টেনে নিয়ে এসেছে। আমেরিকার নব্য বস্তুবাদীদের অন্যতম সাবধানবাণী হল 'অধিবিদ্যাকে জ্ঞানশাস্ত্রের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে'। নব্য বস্তুবাদিগণ সত্তার রূপ পরিবর্তন না করে এবং সত্তাকে মিথ্যা প্রমাণ না করে, বিশ্লেষণ এবং ধারণার সাহায্যে সত্তাকে জানতে চান। তাঁরা জ্ঞেয় হিসেবে সত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন। মানসিকতায় এবং পদ্ধতি প্রয়োগে নব্য বস্তুবাদ অনেকটা প্রকৃতি বিজ্ঞানের স্বগোত্রীয়। হোয়াইটহেডের (A. N. Whitehead) মত বিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকও প্রতিভাসবাদকে অগ্রাহ্য করে নব্য বস্তুবাদ গ্রহণ করেন। কারণ প্রতিভাসবাদ ভিক্টোরীয় যুগে, এবং পরবর্তীকালে অজ্ঞেয়বাদ বিজ্ঞানীদের খুব বিব্রত করেছিল। প্রধান গুণ এবং গৌণ গুণের (Primary and Secondary qualities) মধ্যে যে পার্থক্য করা হত ডাঃ হোয়াইটহেড (Dr. Whitehead) তা বর্জন করেন এবং 'যা কিছু প্রত্যক্ষ করা যায় সে সবই প্রকৃতিতে আছে'—এই মত পোষণ করেন। "আমরা তাদের সংগ্রহ করে বা সৃষ্টি করে পছন্দ করতে পারি না। অণু-পরমাণু এবং বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যেমন প্রাকৃতিক বিষয়, সূর্যের রক্তাভাও তেমনি প্রাকৃতিক বিষয়। একটাই প্রকৃতি আছে এবং সেই প্রকৃতিকে আমরা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যেই জানতে পারি।"* ধারণাও একই রকমের সত্য। ধারণাগুলির অস্তিত্ব মনের উপর নির্ভর করে না। দেশে অবস্থিত দ্রব্যের মত ধারণা চেতনা-নিরপেক্ষ এবং বাস্তব। বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russell) মনে করেন, "ইন্দ্রিয় উপাত্তের জ্ঞান যেমন সরাসরি লাভ করা সম্ভব, তেমনি সার্বিক ধারণার জ্ঞানও তৎক্ষণাৎ লাভ করা সম্ভব"†। সার্বিক ধারণা কিংবা সম্বন্ধের ধারণাও বস্তুগত, মনোগত নয়।

জ্ঞানশাস্ত্রীয় অজ্ঞেয়বাদের বিরুদ্ধে নব্য বস্তুবাদীদের অভিযোগ বেশ জোরালো এবং অনেক ক্ষেত্রে তা স্বীকার করে নিতেও কোন বাধা নেই। 'সত্য ব্যক্তিগত' —এই অস্বস্তিকর অবস্থার হাত থেকে রক্ষা করে (বলা যেতে পারে জুজুর হাত থেকে বাঁচিয়ে), স্বভাববিরুদ্ধ অন্তর্দর্শন এবং অন্ধ আত্মবিশ্বাসের রোগ থেকে মুক্ত করে এবং চিন্তার নিজস্ব ক্ষমতার দ্বারাই সত্যকে জানা সম্ভব—এই আত্মবিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে, নব্য বস্তুবাদ উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে সন্দেহ

* Dr. Whitehead

† B. Russell, Problem of Philosophy.

নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটি কথা অবশ্যই যোগ করতে হয়। নব্য বস্তুবাদীদের চিন্তার প্রতি এই যে প্রত্যয়, তা প্রকৃতি বিজ্ঞান যে জগতের অনুসন্ধান করে, সেই জগতকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। চরম মূল্য বা পরমার্থকে অথবা সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকে চিন্তার সাহায্যে জানা যাবে কিনা সে সম্পর্কে এই সব মহান চিন্তাবিদদের মধ্যে চিন্তার প্রতি আস্থার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই চরম সমস্যাগুলিতে নব্য বস্তুবাদিগণ খুবই সাবধানী এবং বেশ দ্বিধা-গ্রস্ত। অন্ধভাবে বিশ্বাস করে নেবার যখন কোন যুক্তি নেই তখন সতর্কতা অবশ্যই বর্জনীয় কিন্তু 'চিন্তা' সম্পর্কে নব্য বস্তুবাদীরা যে দু' ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন সেটা একটু লক্ষ্য করলে সকলের নজরে পড়বে। জাগতিক জ্ঞান সম্পর্কে চিন্তার যোগ্যতা নিয়ে তাঁদের কোন সংশয় নেই এবং তাঁরা সেটা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন। কিন্তু 'মূল্যে'র আলোচনার ক্ষেত্রে চিন্তার যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁদের দ্বিধাগ্রস্ত হতে দেখা যায়। একটিমাত্র মৌলিক সাধারণ যুক্তি রয়েছে যার সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—দর্শনের এই অনুমানের বিরোধিতা করেছেন নব্য বস্তুবাদী চিন্তাবিদগণ। তাঁরা মনে করেন দর্শন যে একটিমাত্র মৌলিক চিন্তার উপর গুরুত্ব দিয়েছে--অথবা বলা যেতে পারে চিন্তাকেই একমাত্র মৌলিক বিষয় বলে গ্রহণ করেছে তার একমাত্র কারণ হল ধর্মের মত দর্শনও একটিমাত্র উপাস্যের প্রয়োজন বোধ করেছে। তাঁরা আবার বলেছেন, "এমন অনেক দার্শনিক সমস্যা রয়েছে যেগুলি সম্পর্কে কোন বস্তুবাদী সমাধান পাওয়া সম্ভব নয়। সমস্যাগুলি হল—যেমন দেহ ও মন, উদ্দেশ্য, মঙ্গল, স্বাধীনতা ইত্যাদি। তাছাড়া কোন বস্তুবাদী সাধারণ জীবনদর্শন নেই ; ধর্মীয় সিদ্ধান্তের উপর উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনাও নেই"।* [বুদ্ধিকে একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে নব্য বস্তুবাদিগণ তাঁদের আলোচনা আরম্ভ করলেও দেখা যাচ্ছে সব কিছু বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে কিনা এ বিষয়ে তাঁরা এক সময় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।] হয়ত প্রশংসনীয় বৈজ্ঞানিক বিবেক থেকে এই ধরনের দ্বিধার উদ্ভব হয়েছে। যেখানে যথেষ্ট প্রমাণাদি পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে হয়ত তাঁরা আলোচনা করতে সঙ্কোচ বোধ করেছেন। অথবা এমনও হতে পারে নব্য বস্তুবাদ কাজের সূচনা মাত্র। আলোচিত প্রশ্নগুলির আলোচনা হয়ত সে পরে

The New Realism. PP. 16,19,36, Cf. Bertrand Russell Opcit. PP, 220f. and Mysticism and Logic (1917), P. 97f

করবে। কিন্তু হেলডেনের (Viscount Haldane) সমালোচনার একটা যুক্তি আছে। প্রাণীদিগের প্রাণ হল একটি বাস্তব সত্তা—জীববিজ্ঞানিগণ এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন, "নব্য বস্তুবাদীরা যদি এতটাই করতে পারলেন কেন তাঁরা আরও একটু এগিয়ে গেলেন না এবং আরও কিছু বেশি করলেন না। মনে হয় এক সময় তাঁরা তাঁদের ধারণার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। জীবনকে যদি জড় জগতের অংশ হিসেবে এবং যান্ত্রিক নিয়মে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় তবে নৈতিকতা, সৌন্দর্য এবং ধর্মও কেন জড় জগতের অংশ হতে পারবে না" ?* আমেরিকার নব্য বস্তুবাদীদের অপেক্ষা রাসেল (Bertrand Russell) এ বিষয়ে অনেক স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, বৈজ্ঞানিক দর্শন (এই নামটি কেবলমাত্র এই দর্শনটিই গ্রহণ করতে পারে) মূল্যের জগতে ক্ষমতাহীন। [অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দর্শন মূল্যের আলোচনা করতে সমর্থ নয়।] কিন্তু মূল্যের প্রশ্নটি সর্বজনীন এবং সর্বদা বর্তমান। মানুষ অন্তরঙ্গভাবে যে সব সমস্যার সঙ্গে যুক্ত তাদের যুক্তির আওতা থেকে বাদ রেখে দিয়ে কেবলমাত্র ঘটনার জগতে যুক্তিকে সীমাবদ্ধ রাখাটাকে এক ধরনের খামখেয়ালী সিদ্ধান্ত মনে হতে পারে। যেসব বিষয়ের ইন্দ্রিয়জ্ঞান সম্ভব তাদেরই কেবল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা সম্ভব আর যার তা সম্ভব নয় (যেমন মূল্যের) সেখানে যুক্তি অচল, এইভাবে যুক্তির পরিধিকে যথেষ্ট সীমাবদ্ধ করা যায় না।

আমরা দেখলাম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অজ্ঞেয়-বাদের যে ভূত লক (Locke), হিউম (Hume) এবং কান্টের (Kant) সময় থেকে আমাদের বিব্রত করে আসছিল, নব্য বস্তুবাদ আমাদের তাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের মৌলিক সত্যগুলি এবং মূল্যের আলোচনার ক্ষেত্রে চিন্তার ক্ষমতা নিয়ে এখনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে যাচ্ছে। পার্থিব এবং অধ্যাত্মিক সকল বিষয়ের পর্যালোচনা করতে চিন্তা সক্ষম—এই রকম একটি চিন্তার দক্ষতায় বিশ্বাসী এবং অধিকতর সাহসী আলোচনার জন্য হেনরী জোন্স (Henry Jones), বোসাঙ্কে (Bosanquet) এবং হেলডেন (Haldane) প্রমুখ চিন্তাবিদেরা, ভাববাদী ধারার যে পুনঃপ্রবর্তন করেছেন আমরা সেখানে একবার অন্বেষণ করে দেখবো। উদাহরণ স্বরূপ বোসাঙ্কে (Bosanquet) তাঁর শেষের দিকের বইগুলিতে এই রকম অভিমত ব্যক্ত

* Haldane—The Religions Relativity (1921), P 287.

করেছেন—মনের পক্ষে সত্য জ্ঞান লাভ করাই স্বাভাবিক, ভ্রান্তি ব্যতিক্রম মাত্র। "যদি তোমার মনের চিন্তাকে শুদ্ধ রাখতে পার—অর্থাৎ তা যদি স্বাভাবিক থাকে ও বিশেষ ত্রুটিগুলি মুক্ত থাকে, তাহ'লে সত্তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্যগুলি তুমি অবশ্যই জানতে পারবে। কারণ চিন্তার স্বভাবই হল পরম সত্তার বৈশিষ্ট্যগুলি জানা। এটি চিন্তার উল্লেখযোগ্য কোন কাজ নয়। এটাই স্বাভাবিক। আমরা চিন্তা করা বলতে এই বুঝি"।* বুদ্ধিজীবীরা এখন চিন্তার সাহায্যে পরম সত্তার স্বরূপ এবং চরম অর্থের জ্ঞান লাভ করার লক্ষ্যে আস্থার সঙ্গে অগ্রসর হতে পারেন। অবশ্য এই সঙ্গে দেখতে হবে তাঁদের এই আত্মবিশ্বাস যেন অন্ধ এবং যুক্তিহীন না হয়। শ্রমসাধ্য আত্মসমালোচনার দ্বারা এই আত্মবিশ্বাসের পরিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। আমরা যে ভাববাদকে মনে রেখে এই আলোচনা করছি সেটি কিন্তু ব্রাড্‌লির (Bradley) ব্যক্তিগত ভাববাদের বিরোধী। স্যার হেন্‌রী জোনস্ (Sir Henry Jones) তার নাম দিয়েছেন বাস্তব ভাববাদ (Realistic Idealism) বস্তুবাদের মত এই ভাববাদও স্বীকার করে, যে 'বাস্তব জগতে'র অভিজ্ঞতা আমরা স্বাভাবিকভাবে লাভ করি অথবা বিজ্ঞান যে জগতের বর্ণনা দেয় সেই জগৎ পরম সত্তার একটি অংশ বা একটা দিক মাত্র। অন্তর্দৃষ্টিতে মানুষ যত বিস্তৃতি এবং গভীরতা লাভ করবে ততই সে সত্তার সমগ্রতা এবং তার অন্তর্নিহিত অর্থের উপলব্ধি করতে পারবে। এদিকে ধর্মও বিশ্বাস করে যে সমগ্র বিশ্বের বৈচিত্র্যের একটা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব। অবশ্য যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি একদিনে লাভ করা যায় না। অন্তর্দৃষ্টির সম্পূর্ণতা লাভ করা আমাদের লক্ষ্য। অন্তর্দৃষ্টির বিশালতা এবং গভীরতা যতই বৃদ্ধি পাবে ততই সে সঠিক ও সত্য হয়ে উঠবে।

II

এখন ধর্মদর্শনে জ্ঞানের সমস্যা নিয়ে আমাদের মতামতের একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা দরকার।

1. কোন মানুষ জগৎ সম্পর্কে অভ্রান্ত বা চূড়ান্ত জ্ঞান লাভ করেছে বলে দাবি করতে পারে না। মানুষের অভিজ্ঞতা সব সময় অসম্পূর্ণ। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও বৃদ্ধি পায়। জ্ঞান যে কেবল অসম্পূর্ণ তাই নয়, তাতে ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ আছে। এমন কি আমাদের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি

B. Bosanquet, The Meeting of Extremes in Contemporary Philosophy (1921), P. 82.

ইন্দ্রিয়গুলি, যাদের প্রতি আমাদের অপরিসীম বিশ্বাস, তারাও প্রায়শঃ আমাদের প্রতারিত করছে। বিজ্ঞানের ইতিহাস কতকগুলো ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তের দলিল মাত্র। একদা যা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তীকালে সেই সত্য ধীরে ধীরে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। তাই যদি হয়, তাহ'লে আমাদের বর্তমান সিদ্ধান্তগুলি ভ্রমমুক্ত এমন নিশ্চয়তা কি করে লাভ করা যাবে? কি করে বলবো এখনকার জ্ঞান অভ্রান্ত? তাছাড়া আমাদের এমন অনেক সুনিশ্চিত বিশ্বাস আছে—যাদের যুক্তিসম্মতভাবে প্রমাণ করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, নিজের অস্তিত্ব ছাড়া, অন্য কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব, তার অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব, কিংবা বহির্বিশ্বের অস্তিত্ব যুক্তিসম্মতভাবে প্রমাণ করা অসম্ভব না হলেও প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। তত্ত্বগতভাবে আত্মগত ভাববাদ সম্ভব, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবাস্তব। একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আলোচ্য বিষয় যতই বিমূর্ত এবং আকৃতিগত হবে, সে বিষয়টি ততই সহজবোধ্য হবে এবং তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ততই সহজ হবে। জ্ঞান সর্বদা আপেক্ষিক। ঘটনা যত বাস্তবানুগ ও জটিল হবে, তার সঠিক জ্ঞান লাভ করাও ততই কঠিন হয়ে উঠবে। সকল বিজ্ঞানের মধ্যে গণিতশাস্ত্র সর্বাধিক বিমূর্ত এবং সম্পূর্ণ আকৃতিগত। কারণ গণিতশাস্ত্র কেবলমাত্র পরিমাণের আকৃতি নিয়ে আলোচনা করে। এবং সেইজন্য গণিতশাস্ত্র চূড়ান্ত এবং সুনিশ্চয় সিদ্ধান্ত লাভ করতে পারে। দুই এর সঙ্গে দুই যোগ করলে চার হয় এটি একটি নিশ্চিত জ্ঞান। কিন্তু দু'টো চতুর্দশপদী কবিতার সঙ্গে দু'টো কাঁচা ফল যোগ করলে ফলাফল কি হবে? ব্রাউনিং (Browning)-এর মতে একজন প্রতিভাবান সংগীতজ্ঞের চিহ্ন হল 'তিনি তিনটি সুর দিয়ে চতুর্থ একটি সুর বানাবেন না, বানাবেন একটি নক্ষত্র'। এই সব সমস্যার ক্ষেত্রে বিমূর্ত গণিতশাস্ত্রের সরলতা ও পরিচ্ছন্নতার দ্বারা কোন সমাধান পাওয়া যাবে না। কাল নিরূপণ যন্ত্রের সাহায্যে শূন্য কাল নিরূপণ করা বা জ্যামিতির সাহায্যে দেশ পরিমাপ করা অনেক সহজ কাজ। (অবশ্য যদি আইনস্টাইনের (Einstein) আপেক্ষিকবাদ আমাদের মনে অযথা সন্দেহের সৃষ্টি না করে)। কিন্তু ঠিক যে কালটিতে বেঁচে আছি, অথবা যে দেশটি আমরা অধিকার করে রয়েছি সেই দেশ ও কালের মূর্ত অভিজ্ঞতার জ্ঞান লাভ করা সহস্রগুণে জটিল ব্যাপার। তাহ'লে যে পরম সত্তা বলতে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বোঝায় তার সুনিশ্চিত এবং চূড়ান্ত জ্ঞান লাভ করা বিস্ময়করভাবে জটিল হবে তাতে সন্দেহ নেই।

2. তাহ'লে তুরীয় (Transcendent) রহস্য সম্পর্কে আমাদের যা দৃষ্টিভঙ্গী তাতে প্রাসঙ্গিক অজ্ঞেয়বাদের একটা প্রয়োজন থেকে যাচ্ছে। এই রহস্য আমাদের সুনিশ্চিত এবং সহজ জ্ঞানগুলিতেও পরিব্যাপ্ত। ঐ নিশ্চয়তা এবং সরলতার উপরেও রহস্যে একটা প্রভাব রয়েছে। মিথ্যা অজ্ঞেয়বাদের মত সত্য অজ্ঞেয়বাদেরও একটা অস্তিত্ব রয়েছে। প্রকৃত অজ্ঞেয়বাদকেই ধর্মের মূল কারণ হিসেবে স্বীকার করা হয়। অনির্বচনীয় শক্তির অর্থ ও সত্য প্রকাশ করার মত মানুষের চিন্তা ও ভাষা নেই—এই সাধনায় স্বীকৃতিকেই প্রকৃত অজ্ঞেয়বাদ বলে। সেই অনির্বচনীয় শক্তি সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রিত করে। সেই শক্তির প্রতি যে বিস্ময় ও বিহ্বলতার অনুভূতি রয়েছে তার মধ্যেই আছে রহস্যের উৎস। কেবল চিন্তার সাহায্যে এই অতল রহস্যের অর্থোপলব্ধি করা যায় না—এই অক্ষমতার চেতনা থেকে আমরা অনুমান করি যে সুগভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভের পূর্বধারণা এবং পশ্চাৎপট হল রহস্য। পলের (Paul) কথায় এই ধারণাটি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। "হায়রে প্রজ্ঞার গভীরতা আর ঈশ্বরের জ্ঞান। তাঁর বিচার কি অনুধাবন করা যায়, না তাঁর চিন্তাকে বুঝে ওঠা যায়।" (Rom xi 33)। যদি জগৎকে সহজ গুণণছকে পরিণত করা হয়, আর জগতের সর্বকিছুকে যদি দিবালোকের মত স্পষ্ট মনে হয় অথবা যদি জগতে অস্পষ্টতার লেশমাত্র না থাকে তাহ'লে ধর্ম কিংবা কবিতা জগতে বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না। সেরকম সম্ভাবনা অবশ্য নেই। কারণ বিজ্ঞানের পশ্চাৎপটেও রয়েছে রহস্য। বিখ্যাত পদার্থবিদ টেট (Tait) বলেছেন, "পদার্থ কি, আমরা জানি না, এবং সম্ভবতঃ আমাদের আবিষ্কার করার ক্ষমতাও নেই।" হুগেল (Hügel) যথার্থ বলেছেন, "পরিচ্ছন্ন ধর্মীয় উপলব্ধিতে পরম সত্তার যে ধারণা জন্মায়, অন্য কোন রকম অভিজ্ঞতায় তার থেকে গভীরতর ও সমৃদ্ধতর কোন ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। সেই পরম সত্তা সম্পর্কে বিস্ময়ের ধারণা এবং পরম সত্তার অপার্থিব প্রকৃতির অস্তিত্বের অনিশ্চয়তার প্রতি ধারণা নিশ্চয়ই এক নয়। প্রয়োজনীয় রহস্যবাদ এবং প্রকৃত সংশয়বাদ স্বাভাবিক ভাবে সম্পূর্ণ বীপরীত।"*

3. এর অর্থ হল যদিও আমরা সর্বকিছু জানি না কিন্তু যতদূর আমরা

* **Baron F. Von Hügel, Essays and Addresses on the Philosophy of Religion (1921), PP. 33f.**

জানি সেই জ্ঞান যথার্থ হতে পারে। সম্পূর্ণ সংশয়বাদ অযৌক্তিক। সে নিজেই নিজের যুক্তি খণ্ডন করে। কে যেন একজন বলেছিলেন, "এটা হল সেই ওষুধের মত যে রোগের সঙ্গে নিজেকেও অপসারিত করে"। কারণ সংশয়বাদীরা জানেন যে আমরা কিছুই জানতে পারি না। কিন্তু আমরা যে কিছুই জানতে পারি না এই জ্ঞানটি সংশয়বাদীরা কি করে লাভ করলেন? মূলতঃ সন্দেহ এক ধরনের বিশ্বাস। সব কিছুকে সন্দেহ করার অর্থ হল বর্তমানে জ্ঞান বলে যাকে গ্রহণ করা হচ্ছে তাতে সন্দেহ প্রকাশ করা, কিন্তু সেই সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের ভিন্ন কোন মানদণ্ডের প্রতি বিশ্বাস জ্ঞাপন করা। তা নাহ'লে বর্তমানকে সন্দেহ করার কি যুক্তি থাকতে পারে?

তাত্ত্বিক অনিশ্চয়তার সঙ্গে বাস্তব নিশ্চয়তার কোন অসঙ্গতি নেই। আমার বাহ্য জগতের বাস্তবতার জ্ঞান যেমন সত্য তেমনি অন্য জনের জ্ঞানও সত্য হতে পারে। কিন্তু সংশয়বাদীরা এই জ্ঞানলাভকে অসম্ভব বলে মনে করেন। জীবন দুর্বিসহ এবং বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম অসম্ভব হয়ে উঠত যদি আমরা না বিশ্বাস করতাম যে আমাদের নিজেদের বাস্তব অস্তিত্ব আছে এবং ব্যক্তি ছাড়া একটা বাস্তব জগৎ আছে। সেই বাস্তব জগতের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ঘটছে, সেখানে আমরা বসবাস করছি, ঘোরাফেরা করছি এবং জীবন যাপন করছি। আর যদি সেই জাগতিক সত্তা সম্পর্কে আমাদের প্রকৃত কোন অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে তাহ'লে সেই অভিজ্ঞতাকে (অন্তত তার কিছু অংশকে) আজ হোক কাল হোক আমরা ধারণায় রূপান্তরিত করবোই। এমন কোন ক্ষমতা নেই যে আমাদের সত্তার অভিজ্ঞতাকে ধারণায় রূপান্তরিত করার কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে। পরম সত্তা সম্পর্কে আমাদের চিন্তা কখনো যথেষ্ট না হ'তে পারে, এমন কি সত্তা সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতাও সম্পূর্ণ না হ'তে পারে, কিন্তু যতই অভিজ্ঞতা ও চিন্তা পূর্ণ হতে থাকবে ততই তা সত্তাকে জানার পক্ষে যথার্থ ও যথেষ্ট হয়ে উঠবে। অবশ্য আমাদের সংস্কৃত চিন্তার সঙ্গে বর্জিত চিন্তার একটা ধারাবাহিকতা থাকা দরকার। তা নাহ'লে সংশোধিত বা সংস্কৃত চিন্তাগুলি আমাদের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠতে পারে। বর্তমানে অচল ধারণাগুলিরও একটা নির্দিষ্ট পরিসরে কিছুটা সত্য রয়েছে। সম্পূর্ণ ভুল বা মিথ্যা বলে কোন কথা নেই। যা আছে তাহ'ল অপর্যাপ্ততা; অংশকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করার ত্রুটি। আপেক্ষিক মতবাদ বা ক্রমিক জ্ঞানের মতবাদ

সম্পর্কে ব্রার্ডলি (Bradley) এবং হেলডেন (Haldane) যা বলেছেন তার অন্তর্নিহিত অর্থ হল, সত্তা সম্পর্কে অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীগুলিও তাদের নিজেদের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সত্য। যে দৃষ্টিভঙ্গীতে চরম সত্যের অভাব থাকে তাকেই মিথ্যা বলা হয়ে থাকে। চরম সত্য এবং চরম মিথ্যার দুস্তর ব্যবধানের উপর কোন সেতুবন্ধের সম্ভাবনা নেই। ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে জ্ঞানের প্রকৃত অগ্রগতি হলে তবেই কেবল তা সম্ভব হতে পারে।

4. তাহ'লে স্বীকার করতে হয় যে একটি বাস্তব সত্তা আছে এবং সেই সত্তা নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে। সত্য মানুষের গড়া কতকগুলো সামাজিক রীতিনীতি মাত্রই নয়। সত্য হল সত্তার উপলব্ধি। সত্তার অতীন্দ্রিয় বাস্তবতা আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু পরম বাস্তব সত্তার অস্তিত্বের পরেও আমাদের ব্যক্তি-সত্তার অস্তিত্ব থাকে। বস্তুসত্তা আমাদের উপর ক্রিয়া করে এবং তার উপযুক্ত প্রতিক্রিয়াও সে আশা করে। প্রকৃতিতে যা আছে তাকে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু ব্যবহারের মধ্যেই সত্য নিহিত থাকে না। কোন ধারণা কার্যকরী হলে বুঝতে হবে ধারণাটি সত্য। কিন্তু সত্য হলেই কার্যকরী হবে এমন কোন কথা নেই। বস্তুসত্তা নিজেই নিজেকে প্রকাশ করছে যখন আমরা বলি তখন আমরা প্রায়ই ধর্মীয় স্বপ্রকাশবাদের কথাই বলি। স্বপ্রকাশ সম্পর্কে ধর্মীয় বিশ্বাস কুসংস্কারাচ্ছন্ন হতে পারে কিন্তু তার মধ্যে একটা মূল সত্য রয়েছে। সত্তার স্বভাবই হল নিজেকে তাদের কাছে প্রকাশ করা যাদের কান আছে শুনুক; এবং প্রতিক্রিয়ার ইচ্ছা করুক। এই অর্থে স্বপ্রকাশকে ধর্মের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ রাখার কোন মানে হয় না। মানুষের জ্ঞানের প্রগতির এটি একটি শর্ত। মানুষ যে সব ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছে, তা বিজ্ঞান হোক বা কলা, নীতিশাস্ত্র, ধর্ম, দর্শন অথবা জীবনের অন্যান্য সধারণ বিষয়েই হোক, স্বপ্রকাশের ধারণা এই সাফল্যের অন্যতম শর্ত। বিশ্বপ্রকৃতি যদি সম্পূর্ণ মূক ও বধির হত তা'হলে কোন কৃত্রিম উপায়ের সাহায্যেই বিজ্ঞান ঐ মূক প্রকৃতির কোন গোপন রহস্য জানতে পারত না। অবশ্য সকল স্বপ্রকাশ সমান স্পষ্ট বা সমান উল্লেখযোগ্য নয়। ধর্মীয় অভিজ্ঞতাতেই সম্ভবতঃ সেই অস্পষ্ট আলো সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ধর্মে পরম সত্তা (=ঈশ্বর) মানুষের কাছে সুগভীর ব্যঞ্জনাময় এবং অনন্ত ঐশ্বর্যশালী করে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

5. তাহ'লে অন্যান্য বিষয় এবং ধর্ম উভয় ক্ষেত্রে সত্য আবিষ্কারের শর্তগুলি কি এক? বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞানলাভের পদ্ধতি এবং ধর্মীয় জ্ঞানলাভের পদ্ধতি কি অভিন্ন? অথবা বাহ্য জগতের ঘটনাবলী এবং প্রাকৃতিক নিয়মকে আমরা যেভাবে জানি, ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞানলাভের পদ্ধতি কি তার থেকে স্বতন্ত্র? ধর্মবিশ্বাস কি অবাস্তবতা থেকে বাস্তবতায় সরাসরি পাখা মেলে উড়ে যাওয়া আর অ-ধর্মীয় জ্ঞানলাভের পদ্ধতি হল ধীরে ধীরে পায়ে হেঁটে মন্থরগতিতে শ্রমসাধ্য সত্যানুসন্ধান? এখানে আবার আমরা বিশ্বাস ও যুক্তির (অথবা জ্ঞানের) মধ্যে পরিচিত দ্বন্দ্বটির মধ্যে এসে পড়েছি। কান্ট (Kant) যে ব্যবহারিক যুক্তি এবং তাত্ত্বিক যুক্তির মধ্যে পার্থক্য করেছেন, কিংবা Ritschl মূল্য ও তথ্যের মধ্যে যে তফাৎ দেখিয়েছেন তার সঙ্গে এই আলোচনার সম্পর্ক রয়েছে। তাহ'লে কি দুরকম জ্ঞানলাভের পদ্ধতি আছে—এক রকম হল বিশ্বাসের সাহায্যে জ্ঞানলাভ এবং অন্যরকম হল যুক্তির সাহায্যে জ্ঞানলাভ? যদি তাই থাকে তাহ'লে উভয় পদ্ধতি কি সমান সার্থক? প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসকে কি জ্ঞানলাভের পদ্ধতি বলা যাবে? না বিশ্বাস কোন বিষয়কে সত্য বলে কেবল ধরে নেয়?

(a) দুরকম জ্ঞানের পর্যালোচনার সাহায্যে উল্লিখিত প্রশ্নগুলির মীমাংসা করা যেতে পারে। এক ধরনের জ্ঞান আছে যাকে বলা যেতে পারে তথ্যজ্ঞান বা জগৎসম্পর্কিত জ্ঞান। প্রকৃতি বিজ্ঞান জগৎসম্পর্কে আমাদের এই ধরনের পুংখানুপুংখ এবং যথার্থ জ্ঞান দিয়ে থাকে। দ্বিতীয় রকমের জ্ঞানকে বলা যেতে পারে বাস্তব জ্ঞান বা ব্যবহারিক পরিচিতিমূলক জ্ঞান। সহানুভূতিশীল স্বজ্ঞা এবং সম্পূর্ণ গুণ উপলব্ধির ফলে আমরা এই ধরনের পরিচিতি লাভ করে থাকি। এই ধরনের পরিচিতিমূলক জ্ঞানের সাহায্যেই একজন মানুষ আর একজনের বন্ধু হয়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হল বিশুদ্ধ, বৌদ্ধিক, নৈর্ব্যক্তিক ও আবেগহীন। কিন্তু একজন বন্ধু সম্পর্কে আর একজন বন্ধু যে অন্তরঙ্গ জ্ঞান লাভ করে, সেই অন্তরঙ্গতা যৌক্তিক নিয়মে বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সাহায্যে পাওয়া সম্ভব নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্তর্দৃষ্টি, পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালবাসার সাহায্যে এই অন্তরঙ্গ পরিচিতি লাভ করা সম্ভব। কোন কিছু সম্পর্কে জানা এবং কোন কিছুর সঙ্গে পরিচিতির মধ্যে যা তফাৎ এতে তাই বোঝায়। কিছু কিছু ভাষায় এই দু'ধরনের জানাকে ইংরেজী ভাষার মত কেবল 'to know' কথাটি দিয়ে

না বুঝিয়ে দু'টি স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন জর্মান ভাষায় বলা হয় Wissen এবং Kennen, ফরাসী ভাষায় বলা হয় Savoir এবং Connaitre, ওয়েল্‌সে gwybod এবং adnabod. [বাংলায় আমরা জানা ও চেনা বলতে পারি] ঈশ্বরের জ্ঞান বলতে অবরোহ অনুমানের সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে ঈশ্বর সম্পর্কে কিছু সংবাদ সংগ্রহ বোঝায় না। ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য চাই সুগভীর আবেগ ; একজন বন্ধুর জন্য আর একজন বন্ধুর হৃদয় যেমন উদ্বেল হয়ে ওঠে তেমনি সুতীব্র হৃদয়াবেগ। এই পরিচয়কে জ্ঞান বলতে কোন বাধা নেই। অবশ্য ব্যক্তিগত এবং সামাজিক অভিজ্ঞতা দিয়ে সেই জ্ঞানের যথেষ্ট শোধনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

(b) এই দু'ধরনের জ্ঞানকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখা যাবে না। তাদের একটি মিলনক্ষেত্র প্রয়োজন। এক জীবনধারণ পদ্ধতির মধ্যে উভয় জ্ঞানের সমন্বয় ঘটবে। দু'ধরনের জ্ঞানের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা কেবল সাময়িক পার্থক্য, চিরন্তন পার্থক্য নয় : আপেক্ষিক পার্থক্য চূড়ান্ত নয়। এই দু'ধরনের জ্ঞানকে পরিচ্ছন্ন দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় না। বাস্তবে দেখা যায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেও কিছুটা বিশ্বাসের ভূমিকা রয়েছে, বিপরীত পক্ষে ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যেও যুক্তির স্থান থেকে গেছে। যুক্তির একটি উপাদান হল বিশ্বাস ; আবার বিশ্বাসের একটি উপাদান হল যুক্তি। বৈজ্ঞানিক সত্য ধর্মীয় সত্যের মত কতকগুলি কার্যকরী প্রকল্প নিয়ে গঠিত। কিন্তু এই প্রকল্পগুলিকে যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় নি কিংবা আরোহ অনুমানের দ্বারাও প্রমাণ করা হয় নি। কিন্তু এই প্রকল্পগুলির সাহায্যে আমরা বুদ্ধিমানের মত ভবিষ্যতের ঘটনাবলী অনুমান করতে পারি। বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সেই অনুমান-গুলি অবার ক্রমে ক্রমে বিশুদ্ধ জ্ঞানে পরিণত হয়। প্রকৃতির একরূপতা, শক্তির নিত্যতা প্রভৃতি জ্ঞান প্রায় ধর্মীয় বিশ্বাসের মত। এদের মেনে নিয়ে কাজ করলে অনেক জ্ঞান লাভ করা যায় কিন্তু এগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে প্রমাণ করা বেশ কঠিন কাজ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম এই বিশ্বাসগুলি অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে পাওয়া যায়। পরবর্তী-কালে এই বিশ্বাসগুলির মধ্যে অনেকেই প্রমাণিত তথ্য হয়ে ওঠে। বিশ্বাস এক বিরাট আবিষ্কারক। "বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন অন্য বিষয়েও তেমনি বিশ্বাস সর্বত্র অগ্রদূতের কাজ করে। পরে মনের অধিকতর গদ্যময় দিকগুলি

নবাবিষ্কৃত ভূভাগকে সভ্য করার জন্য উপস্থিত হয়"* যুক্তি নিজেই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। লোটজা (Lotza) বলেছেন, 'সকল জ্ঞানের মূলে রয়েছে বিশ্বাস। যুক্তি নিজেই নিজের ক্ষমতাকে বিশ্বাস করে। বিপরীত পক্ষে ধর্মীয় প্রকল্পগুলি যদি যথার্থ হয়, তাহ'লে তাতে যুক্তি সংযুক্ত থাকবেই। বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের যে পদ্ধতিতে যাথার্থ্য প্রমাণ করা হয় এবং তাদের যৌক্তিকতা বিচার করা হয়, ঠিক সেই পদ্ধতিতে ধর্মীয় প্রকল্পগুলিরও যৌক্তিকতা এবং যথার্থতা বিচার করা যেতে পারে। স্থূল অর্থে আমরা বিশ্বাস কথাটি ব্যবহার করছি না। বিশ্বাস যুক্তিবিরোধী কিছু নয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে জ্ঞানবিরোধীদের কাছে ধর্ম একটা কাপুরুষদের দুর্গের মত যুক্তি, সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নিজেকে লুকিয়ে রাখার একটা আশ্রয় হল ধর্ম।

উইলিয়ম জেম্‌স স্কুলের ছেলেদের জন্য বিশ্বাসের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন অর্থাৎ "যখন তুমি কোন কিছুকে সত্য বলে মনে করবে তখনই সেটা বিশ্বাস হয়ে উঠবে" আমরা এটিকে গ্রহণ করতে পারি না। একীভূত সুসমঞ্জস অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস এবং জ্ঞানের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। ধর্মবিশ্বাস বিচারের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে না। অন্যান্য প্রকল্পের মত ধর্মীয় প্রকল্পেরও যৌক্তিক বিচার হোক এটাই ধর্মীয় প্রকল্পের কাম্য। Ritschl মূল্য বিষয়ক অবধারণ এবং অস্তিত্বমূলক বা বর্ণনামূলক অবধারণের মধ্যে যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন, কিছুদূর পর্যন্ত তা প্রয়োজনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দু'রকমের জ্ঞান আছে—এ কথা স্বীকার করা যায় না। অন্যরকম জ্ঞানের অথবা সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ না এনে কোন এক রকমের জ্ঞান যথার্থতা দাবি করতে পারে না। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মূল্য বিচারও কেবল ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্ভব নয়। তাকে ধর্মহীন এবং বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার তথ্য বিচারের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ও সুসমঞ্জস হতে হবে। তখন দুই অভিজ্ঞতাই সম্পূর্ণ দার্শনিক বিশ্ব-চিন্তায় এক হয়ে যাবে। অস্তিত্বের জগৎ এবং মূল্যের জগৎ সম্মিলিত হয়ে বিশাল এক সত্তার জগতে একাকার হয়ে যাবে।

(c) কিন্তু যদিও আমরা জ্ঞানের ঐক্যবদ্ধ একটি চরিত্রের উপর জোর দিচ্ছি, তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে জ্ঞানকে আমরা সম্পূর্ণ এক রকম মনে করছি। জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য। বিষয়টি এত সহজ নয় যে

* H. E. Fosdick, The Meaning of Faith (1918), P. 47

আমরা হেনরী জোন্‌সের (Sir Henry Jones) 'জ্ঞানলাভের মাত্র একটাই পদ্ধতি আছে' এই উক্তিটি মেনে নেবো। হেলডেনের (Viscount Haldane) দৃষ্টিভঙ্গীর সারবত্তা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। তিনি বলেছেন, "জ্ঞান সব সময় একই রকম হতে পারে না। বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন মাত্রার জ্ঞান আছে। বিভিন্ন স্তরের সেই জ্ঞানের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ রয়েছে। কিন্তু তাদের একটিকে অন্যটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা যায় না।"* সত্তার নিজেরই অনেক স্তর আছে। সুতরাং সত্তার সম্যক জ্ঞান যদি আমাদের লাভ করতে হয় তাহ'লে সত্তার স্তর অনুযায়ী জ্ঞানেরও বিভিন্ন স্তব থাকা প্রয়োজন। জ্ঞানের প্রত্যেক নতুন স্তর নতুন জাতিভুক্ত হবে অর্থাৎ নতুন এক রকমের জ্ঞান হয়ে উঠবে। নিম্নতর স্তরের সঙ্গে সেই নতুন জ্ঞানের পার্থক্য থাকবে। এই বিভিন্ন স্তরের জ্ঞানগুলিকে উন্নত, উন্নততর আরও উন্নত এই ভাবে বাস্তব জগতের জটিলতা অনুযায়ী ক্রম ঊর্ধ্বমুখী করে সাজানো যেতে পারে। এই ভাবে আমরা সাধারণ গণিতের স্তর থেকে আরম্ভ করে, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, সৌন্দর্যতত্ত্ব, ধর্ম প্রভৃতিকে পর পর সাজাতে পারি। প্রত্যেক উন্নত স্তর সত্তার নতুন একটি দিক প্রকাশ করে এবং তাকে জানার জন্য নতুন রকমের জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক নতুন স্তরের জ্ঞান সাধারণভাবে নিজের পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু পরম সত্তার জ্ঞানলাভের সূত্রটি খুঁজে পেতে হলে সর্বনিম্ন স্তব থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সব রকমের জ্ঞানকে একসঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে জ্ঞানলাভের পথ এক নয় অনেক। কিন্তু জ্ঞানকে সম্পূর্ণ হতে হলে সকল জ্ঞানকে একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে সমবেত হতে হবে। এই সঙ্গে বলা উচিত, প্রত্যেক স্তরে অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের শর্ত। অন্য ভাষায় বলা যায় জ্ঞেয় যে স্তরের অর্থাৎ যেমন উন্নত ও জটিল জ্ঞানকেও সেইরকম উন্নত স্তরের হতে হবে। মানসিক স্তরের নিচের

* Henry Jones, A Faith that enquires (1922), pp. 63,79 Haldane, The Reign of Relativity (1921), pp 130f et-passim. জোন্‌স স্বীকার করেছেন যে অনেকগুলো প্রণালীর মধ্যে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ প্রাণালী। জ্ঞানের প্রত্যেক অংশে আছে বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য। কিন্তু এই পার্থক্যটি আপেক্ষিকতার সূত্রের সাহায্যে হেলডেনই সম্ভবত সবচেয়ে ভাল বুঝতে পেরেছেন।

কোন জীবন মনকে জানতে পারে না। তেমনি নৈতিক স্তরের নিচের জীবনের পক্ষে নৈতিক জীবনের জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়। পিটার বেল্‌স (Peter Bells) নদীর ধারে বসন্ত কালে ফোটা হলুদে রঙের ফুলগুলিই কেবল দেখবেন। তার বেশি কিছু তিনি দেখতে পাবেন না। আর চার্লস ল্যাম্বস্ (Charles Lambs) এর কানে যেহেতু সুর নেই তিনি বিটোফেনের (Beethoven) সিম্‌ফনি শুনতে পারেন কিন্তু 'কিম্ভুত কিমাকার একটা জিনিস' বলে তাঁর সেটা মনে হতে পারে। সেই রকম যে স্তর থেকে ধর্ম-জ্ঞান লাভ করা সম্ভব জ্ঞাতাকে সেই অবস্থায় গিয়ে ধর্মের মধ্য থেকেই ধর্ম-জীবনকে উপলব্ধি করতে হবে। জ্ঞাতার তখনই কেবল ধর্মজ্ঞানকে অসম্পূর্ণ বলে মনে হতে পারে। "আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিকে আধ্যাত্মিকতা দিয়েই নির্ধারণ করতে হবে"। ধর্ম অপেক্ষা ন্যূন কোন মানদণ্ড দিয়ে আমরা ধর্মীয় সত্যের পরিমাপ করতে পারি না। এই কথার অর্থ এই নয় যে আমরা আবার Ritschl-এর কথা মেনে নিচ্ছি, অর্থাৎ স্বীকার করছি যে, 'ধর্ম দিয়ে ধর্মের মূল্যায়ন করতে হবে। আমাদের বক্তব্য হল যথার্থতার সমর্থনের জন্য উচ্চ-স্তরের জ্ঞানকে নিম্নস্তরের জ্ঞানে পরিণত করা যায় না। প্রত্যেক স্তরের জ্ঞান নিজের জায়গায় থেকে সমগ্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে সুসমঞ্জস হয়ে উঠবে। অভিজ্ঞতার সুসম্পূর্ণতায় এবং আভ্যন্তরীণ ঐকতানেই সম্ভবতঃ চূড়ান্ত বিচারের নীতি (বা মানদণ্ড) নিহিত।

6. এখন তাহ'লে দেখা গেল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমস্যা দুটি সমবিস্তৃত। যখন আমরা জানতে চাই 'ধর্ম কি'? তখন অমরা প্রকৃতপক্ষে জানতে চাই ধর্ম কি মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতায় কোন একটি অপরিহার্য অংশ? আমরা অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুর সঙ্গে অভিজ্ঞতা বহির্ভুক্ত কোন কিছুর তুলনা করে তাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য আছে কিনা তা আলোচনা করতে চাইছি না। সত্যের অনুরূপতাবাদ বা 'চিত্র' মতবাদ (Correspondence or Picture theory of truth) কে আমরা স্বীকার করতে পারি না। আমরা মনের আবরণ থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে মনের ভেতর ও বাইরের সঙ্গে তুলনা করতে পারি না। আমরা যা করতে পারি অথবা যা আমাদের করা প্রয়োজন তা হ'ল অভিজ্ঞতার একটি অংশকে অন্য অংশের সঙ্গে অথবা সমগ্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করতে পারি এবং সমগ্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেই খণ্ড অভিজ্ঞতা সুসমঞ্জস কিনা

তা প্রত্যক্ষ করতে পারি। অভিজ্ঞতার যে অংশটি সমগ্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত নয়, তার যথার্থতাকে সন্দেহ করা যেতে পারে। সমগ্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে অভিজ্ঞতার যে অংশটি যত অসংলগ্ন থাকবে ততই সে সন্দেহের উদ্রেক করবে। যে অভিজ্ঞতায় অসংলগ্নতা ও অসামঞ্জস্য যত বেশি থাকবে সেই অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে ততই অস্বস্তিকর হয়ে উঠবে। জীবনের সমৃদ্ধি ও উন্নতির ক্ষেত্রে যে সব অভিজ্ঞতা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে, জগতের সম্পদকে কাজে লাগানোর সফল প্রচেষ্টায় যে অভিজ্ঞতা বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে আমরা সেই অভিজ্ঞতাকে অসত্য বলে স্বীকার করে নেবো। স্বস্তি বা পরিতৃপ্তির অনুভূতির সঙ্গে বিচারকে এক করে ফেলে আমরা আমাদের বিচারের নীতিকে আবার ব্যক্তিগত মানদণ্ডে রূপান্তরিত করলাম—এ রকম সন্দেহ করার কোন কারণ আছে বলে আমরা মনে করি না। কারণ প্রথমতঃ, তৃপ্তি বলতে আমরা কোন মুহূর্তের তৃপ্তির অনুভূতি অথবা কয়েকজন আবেগপ্রবণ লোকের তৃপ্তিকে বোঝাতে চাইছি না। আমরা তৃপ্তি বলতে মনে করি স্থায়ী ও স্বাভাবিক তৃপ্তি। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং বিভিন্ন পরিবেশে ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত এবং আত্ম-সমালোচনা ও সামাজিক বিচারে পুংখানুপুংখ পর্যালোচিত তৃপ্তির কথাই আমরা এখানে বোঝাতে চাইছি। জীবন ও জগতের বিস্তৃত ক্ষেত্রে নানানভাবে এই তৃপ্তিকে যাচাই করে নিয়ে তবে তাকে গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, অভিজ্ঞতা বলতে আমরা কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতাকে মনে করি না। আমরা ব্যাপক অর্থে অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করি। অর্থাৎ আমরা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সঙ্গে ধারণাকেও যোগ করে দিতে চাই। কারণ ধারণা প্রত্যক্ষ থেকে উদ্ভূত হলেও সমগ্র অভিজ্ঞতার প্ররিপ্রেক্ষিতে সে অর্থবহ হয়ে ওঠে। আমরা যে কেবল অনুভূতিকে যুক্ত করেছি তাই নয়, যে চিন্তার সূত্রে অনুভূতি গ্রথিত হয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই চিন্তাকেও এর সঙ্গে যোগ করছি। অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত নয়। অভিজ্ঞতার যেমন উদ্দেশ্য থাকে তেমনি বিধেয়ও থাকে। যেমনি জ্ঞাতার স্থান আছে তেমনি জ্ঞেয়ের স্থানও আছে। অভিজ্ঞতা অর্থাৎ কোন কিছুর অভিজ্ঞতা, স্বেচ্ছা—পরিচিত, স্বপ্রকাশ সত্তার সঙ্গে সংযোগ। পরম সত্তাকে আমরা এইভাবে জানতে পারি। ধর্মীয় অভিজ্ঞতাও পরম সত্তাকে জানার একটি উপায়। ধর্ম যদি অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারে তাহ'লে ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অবশ্য আমরা মনে করি ধর্ম পরম সত্তাকে জানবার একটি যথার্থ উপায়। কারণ

অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ধর্মের কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। আমরা যে মানদণ্ডটি এতক্ষণে আবিষ্কার করলাম তা হ'ল অভিজ্ঞতার মানদণ্ড। আমরা যখন আমাদের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার বিচার করবো, তখন হয়ত দেখা যাবে নীতিশাস্ত্র, সৌন্দর্যতত্ত্ব ও ধর্মীয় চেতনা আমাদের যে সংবাদ সরবরাহ করছে, বিজ্ঞানের বিমূর্ত, গুণগত, এবং যান্ত্রিক জ্ঞান অপেক্ষা সেগুলি অনেক বেশি সত্যকে প্রকাশ করছে।

এখন আলোচ্য বিষয় হল 'ধর্ম কি সত্য'? ধার্মিক ব্যক্তির কাছে ধর্ম অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে ত ব্যক্তিগত বিশ্বাস। তাতে ধর্মের বাস্তব সত্য প্রমাণিত হয় না। বিশ্বনিয়ম মানুষের কল্পনার বিষয় না বাস্তব তাও প্রমাণিত হয় না।

এই আলোচনার পূর্বে আমাদের প্রথম দেখতে হবে পরম সত্তার জ্ঞান লাভ করা আদৌ সম্ভব কিনা। বিষয়টি জ্ঞানশাস্ত্রের। জ্ঞান যদি সম্ভব হয় তখন ধর্মজ্ঞান সম্ভব কিনা বিচার করা যেতে পারে।

I

প্লেটো, এরিস্টটল থেকে আরম্ভ করে ডেকার্ট, স্পিনোজা, লাইবনিজ প্রভৃতি সকল দার্শনিক যুক্তির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের মতে চিন্তার সাধারণ স্বভাব হল সত্য আবিষ্কার করা। জ্ঞানলাভের ক্ষমতা মানুষের আছে। নাস্তিকেরা অবশ্য মানুষের জ্ঞানলাভ করার ক্ষমতায় এত আস্থাবাদী নন। জ্ঞান-শাস্ত্রীয় সমস্যার সূচনা হয়েছে ডেকার্টের দ্বৈতবাদ থেকে। জ্ঞানের সম্ভাবনায় ডেকার্টের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদীরা পরম সত্তার যথার্থ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব কিনা, এ বিষয়ে সন্দিহান হয়ে উঠলেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত হল—সার্বিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।

কাণ্টের মতে যথার্থ জ্ঞান সম্ভব। কিন্তু সেই জ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞান সম্ভব নয়। হাক্সলে, হারবার্ট স্পেনসার, কোঁৎ প্রভৃতি দার্শনিকেরা কাণ্টের সমর্থক। তাঁদের মতেও পরম সত্তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। পৃথিবীতে মানুষ যেন ভিন্‌দেশী, সে নতুন দেশ জানতে চায়।

ডারউইন বলেছেন, মানুষ প্রকৃতিরই অংশমাত্র। প্রকৃতি মানুষের কাছে বিদেশ নয়। হেগেল বলেছেন, চিন্তা আমাদের জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় নি। বরং চিন্তার ফলে জগতের সঙ্গে আমরা এক হই। প্রকৃতি মানুষের চোখ (যুক্তি) দিয়ে যেন নিজেকে নিজেই দেখে।

কেবল অভিজ্ঞতা বা কেবল যুক্তি দিয়ে পরম সত্তার জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। তা হ'লে অন্য কোন পদ্ধতি আছে কি, যার সাহায্যে পরম সত্তার জ্ঞান লাভ করা যায়? কাণ্ট তাঁর Critique of practical reason-এ 'ব্যবহারিক

যুক্তি' বা নৈতিক ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। নৈতিক ইচ্ছা পরম সত্তার সক্রিয় উপদেশ বলে এর সাহায্যে পরম সত্তার জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। সোপেনহাওয়ার মনে করেন স্বজ্ঞার সাহায্যে সরাসরি পরম সত্তার উপলব্ধি সম্ভব।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমাংশে বেগস' স্বজ্ঞাবাদের উন্নতি করেন। তিনিও মনে করেন পরম সত্তাকে যৌক্তিক চিন্তা-ভাবনা দিয়ে জানা যাবে না। আমাদের চেতনাকে যেমন আমরা সরাসরি জানতে পারি পরম সত্তার জ্ঞানও আমরা সেই ভাবে লাভ করতে পারি। পরম সত্তা মূলতঃ প্রবাহ। তাই তার জ্ঞান স্বজ্ঞা দ্বারাই লাভ করা সম্ভব। মনে যে ক্রমাগত প্রবাহ চলছে তার সরাসরি পরিচিত হওয়ার পদ্ধতিকে স্বজ্ঞা বলে।

বেগস'র মতবাদকে রহস্যবাদের দার্শনিক ভিত্তি বলা যেতে পারে। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরম সত্তাকে জানা যায়—ধর্মের এই দাবীর সঙ্গে বেগস'র দর্শনের সঙ্গতি রয়েছে।

বেগস' চিন্তা ও স্বজ্ঞার সঙ্গে পার্থক্য করতে গিয়ে চিন্তার পরিধিকে সংকীর্ণ করে ফেলেছেন। কিন্তু জ্ঞানলাভের অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গে চিন্তার কোন বিরোধ নেই। চিন্তা কেবল স্থিতিশীলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, চিন্তা গতিশীলও। অবশ্য চিন্তা প্রকৃতি বিজ্ঞানে যতটা সুনিশ্চিত, ধর্মদর্শন প্রভৃতিতে ততটা নয়। বুদ্ধির সঙ্গে স্বজ্ঞার সম্পর্ক স্বীকার করতে হবে। বুদ্ধি ব্যতীত স্বজ্ঞা নিতান্তই নিজস্ব, ব্যক্তিগত ও অবর্ণনীয়। বুদ্ধি দ্বারাই স্বজ্ঞাকে প্রকাশ করা যায়।

আর এক ধরনের বুদ্ধি-বিরোধী আন্দোলনের নাম প্রয়োগবাদ। এই মতবাদে ইচ্ছার স্থান বুদ্ধির আগে। সকল চিন্তা ব্যক্তিগত ও উদ্দেশ্যপ্রাণোদিত। যে ধারণার উপযোগিতা আছে সেই ধারণা সত্য। সত্য মানুষের বানানো যন্ত্র। বেগস'র সঙ্গে অন্য বিষয়ে প্রয়োগবাদের সাদৃশ্য থাকলেও, প্রয়োগবাদ স্বীকার করে না যে স্বজ্ঞার সাহায্যে সত্যোপলব্ধি সম্ভব। উদ্দেশ্যহীন সত্য লাভ একটা অবাস্তব ব্যাপার। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে সত্যানুসন্ধান সম্ভব নয়—প্রয়োগবাদের এই যুক্তি ধর্মদর্শনে প্রয়োজনীয়।

কিন্তু এই মতবাদকে পুরোপুরি স্বীকার করলে জ্ঞান ব্যক্তিগত হয়ে পড়ে। চরম সত্য বলে কিছু থাকে না। আমরা সত্য সৃষ্টি করি স্বীকার করলে, পরম সত্তা অসম্পূর্ণ একথাও স্বীকার করতে হয়। জ্ঞানের সমস্যা মানে বিশ্ব-নিয়মের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করা। সেই বিশ্বনিয়মকে আমাদের জানতে

হবে। কিন্তু জানতে গিয়ে আমরা সৃষ্টি করতে পারি না। পরম সত্তা জ্ঞানের একটি উপাদান। তাকে অস্বীকার করে জ্ঞান সম্ভব নয়। পরম সত্তাই পরম জ্ঞেয়।

নব্যবস্তুবাদ :— নববস্তুবাদিগণ সত্তাকে মিথ্যা বলেন না। বরং সত্তাকে বিশ্লেষণ করে তার জ্ঞানলাভ করতে চান। জ্ঞেয় হিসাবে সত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করেন। সত্যকে তাঁরা ব্যক্তিগত বলে মনে করেন না। চিন্তার দ্বারাই সত্যকে জানা সম্ভব।

কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের জ্ঞান সম্পর্কে তাঁরা চিন্তার উপর যতটা আস্থাশীল, অতীন্দ্রিয় জগতের জ্ঞান সম্পর্কে কিংবা চরম মূল্যের জ্ঞান সম্পর্কে চিন্তার ক্ষমতার উপর তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত। দেখা যাচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবনের মৌলিক সত্যগুলি আলোচনা করতে চিন্তা সক্ষম নয়: অন্তত রাসেল এধরনের অভিমত প্রকাশ করেছেন।

হেন্‌রী জোন্‌স, হেলডেন ও বোসাঙ্কের ভাববাদ :—বোসাঙ্কে বলেছেন,—মনের পক্ষে সত্য জ্ঞান লাভ করাই স্বাভাবিক। ভ্রান্তি ব্যতিক্রম মাত্র। চিন্তার স্বভাবই হল পরম সত্তার বৈশিষ্ট্যগুলি জানা। হেন্‌রী জোন্‌স বলেছেন,—বিজ্ঞান যে জগতের জ্ঞান দেয় সেই জগৎ পরম সত্তার একটি অংশ বা একটা দিক মাত্র। অন্তর্দৃষ্টিতে মানুষ যত বিস্তৃতি লাভ করবে ততই সত্তার সমগ্রতা উপলব্ধি করতে পারবে। ধর্মও বিশ্বাস করে যে সমগ্র অনন্ত বৈচিত্র্যের একটি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব।

II

ধর্মদর্শনে জ্ঞানের সমস্যা নিয়ে আমাদের অভিমত :—

1. মানুষের অভিজ্ঞতা সব সময় অসম্পূর্ণ। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও বৃদ্ধি পায়। জ্ঞান সর্বদা আপেক্ষিক। আলোচ্য বিষয় যতই বিমূর্ত এবং আকৃতিগত হবে বিষয়টি ততই সহজবোধ্য হবে। গণিত শাস্ত্র সর্বাধিক বিমূর্ত এবং সম্পূর্ণ আকৃতিগত। পরিমাণের আকৃতি নিয়ে তার আলোচনা। তাই সে সুনিশ্চিত জ্ঞান দেয়। দুই যোগ দুই সমান চার। কিন্তু দু'টো কমিতা যুক্ত দু'টো ফল সমান কত? গণিত এর জবাব দিতে পারে না। পরম সত্তার জ্ঞানলাভ বিস্ময়করভাবে জটিল।

2. অজ্ঞেয়বাদ দু'ধরনের। মিথ্যা অজ্ঞেয়বাদ ও প্রকৃত অজ্ঞেয়বাদ। প্রকৃত অজ্ঞেয়বাদকে ধর্মের মূল কারণ বলা যেতে পারে। অনির্বচণীয় সত্তাকে প্রকাশ

করার মত মানুষের চিন্তা ও ভাষা নেই—একথাটা স্বীকার করে নেওয়াকেই প্রকৃত অজ্ঞেয়বাদ বলে। যদি জগতে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কোন রহস্য না থাকে তাহ'লে ধর্ম বা কবিতার অস্তিত্বও থাকবে না। প্রকৃতিবিজ্ঞানের পশ্চাৎপটেও রয়েছে রহস্য।

3. এর অর্থ হল সব কিছু আমরা জানি না। কিন্তু যতদূর আমরা জানি সেই জ্ঞান যথার্থ হ'তে পারে। সম্পূর্ণ সংশয়বাদ অযৌক্তিক ও আত্মঘাতী। সন্দেহও একধরনের বিশ্বাস। কোন একটি জ্ঞানকে সন্দেহের অর্থ হ'ল অন্য কোন জ্ঞান বা সমগ্র জ্ঞানে বিশ্বাস। সম্পূর্ণ ভুল বা মিথ্যা বলে কোন কথা নেই। যা আছে তা হ'ল অপর্যাপ্ততা। অংশকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করার ত্রুটি। বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে প্রকৃত জ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব।

4. তাহ'লে স্বীকার করতে হয় যে একটি বাস্তব সত্তা আছে। এবং সেই সত্তা নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে। সত্য সামাজিক রীতিনীতি নয়। সত্য হল সত্তার উপলব্ধি। বিশ্বপ্রকৃতি মূক বা বধির নয়। তাহ'লে প্রকৃতির কোন গোপন রহস্য বিজ্ঞান দিতে পারত না। প্রকৃতিতে আমাদের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

5. তাহ'লে ধর্মীয় জ্ঞানলাভের পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের পদ্ধতি এক না স্বতন্ত্র? ধর্মবিশ্বাস কি অবাস্তবতা থেকে বাস্তবতায় সরাসরি চলে যায় আর বিজ্ঞান যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে? তাহ'লে কি দু'রকমের জ্ঞানলাভের পদ্ধতি আছে? (1) বিশ্বাসের সাহায্যে জ্ঞানলাভ (2) যুক্তির সাহায্যে জ্ঞানলাভ।

(a) জ্ঞান দু' রকমের (1) তথ্যজ্ঞান যা জগৎ সম্পর্কিত জ্ঞান (2) বাস্তব জ্ঞান বা ব্যবহারিক পরিচিতিমূলক জ্ঞান। তথ্যজ্ঞান বিশুদ্ধ, বৌদ্ধিক ও নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু পরিচিতিমূলক জ্ঞান অন্তরঙ্গ—একজন বন্ধু সম্পর্কে আর একজন বন্ধুর জ্ঞান। ঈশ্বরের তথ্য জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। সুতীব্র হৃদয়াবেগের সাহায্যে ঈশ্বরের পরিচিতিমূলক জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে।

(b) এক জীবনধারণ পদ্ধতিতে এই দু' ধরনের জ্ঞানকে পৃথক করে রাখা যাবে না। তাদের সমন্বয় ঘটবে। দুই ধরনের জ্ঞানের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা নিতান্তই আপেক্ষিক, চূড়ান্ত নয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেও বিশ্বাসের ভূমিকা রয়েছে। আবার ধর্মীয় জ্ঞানেও যুক্তি নেই এমন নয়। বিশ্বাস যুক্তি বিরোধী কিছু নয়।

(c) জ্ঞান কিন্তু সম্পূর্ণ এক রকমের নয়। জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য। বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন মাত্রার জ্ঞান আছে। বিভিন্ন স্তরের জ্ঞানের

মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকলেও, একটিকে অন্যটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা যায় না। সত্তার নিজের অনেক স্তর আছে। সুতরাং সত্তার জ্ঞান লাভ করতে হলে সত্তার স্তর অনুযায়ী জ্ঞানেরও বিভিন্ন স্তর থাকা প্রয়োজন। জ্ঞেয় যে স্তরের জ্ঞানকেও সেই স্তরের হতে হবে। জ্ঞেয় যত উন্নত স্তরের হবে জ্ঞানকেও তত উন্নত স্তরের হতে হবে। প্রত্যেক স্তরের জ্ঞান নিজের জায়গায় থেকে সমগ্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

6. যখন আমরা জানতে চাই ধর্ম কি? প্রকৃতপক্ষে আমরা তখন জানতে চাই ধর্ম কি মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতার একটা অপরিহার্য অংশ? অভিজ্ঞতার একটি অংশকে অন্য অংশের সঙ্গে অথবা সমগ্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করে সেই খণ্ড অভিজ্ঞতা সমগ্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে সুসমঞ্জস কিনা তা বিচার করতে পারি। সমগ্রের সঙ্গে যে অংশ দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত তা যথার্থ। যে অংশ সমগ্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তার যথার্থতা সন্দেহের বিষয়। জীবনের উন্নতির ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা যত বেশি বাধাস্বরূপ সেই অভিজ্ঞতা তত বেশি অসত্য। যে অভিজ্ঞতা যত তৃপ্তি দেয় তত সার্থক। কিন্তু আমরা এই তৃপ্তি বলতে স্থায়ী ও স্বাভাবিক তৃপ্তি বোঝাতে চাইছি। দ্বিতীয়তঃ, অভিজ্ঞতা বলতে আমরা তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতাকে বোঝাচ্ছি না। অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগতও নয়। অভিজ্ঞতার যেমন উদ্দেশ্য আছে তেমনি বিষয়ও আছে। অভিজ্ঞতা অর্থাৎ কোন কিছুর অভিজ্ঞতা, স্বপ্রকাশ সত্তার সঙ্গে সংযোগ। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা পরম সত্তাকে জানার একটা উপায়, বলা যেতে পারে একটি যথার্থ উপায়।

সপ্তম অধ্যায়

ধর্ম এবং পরম সত্তা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের যুক্তি যদি যথার্থ হয় তাহ'লে সঙ্গত কারণে অনুমান করা যেতে পারে যে পরম সত্তার জ্ঞান লাভের ক্ষমতা মানুষের আছে। মানুষ তার ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরম সত্তার জ্ঞান লাভ করতে পারে। সেই জ্ঞান কখনো হয়ত সম্পূর্ণতা লাভ করবে না, কিন্তু যতটা সে জানতে পারবে তার মধ্যে কোন অসত্য থাকবে না। আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে সব যুক্তির অবতারণা করেছি তার মাত্র একটি লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্য হল অজ্ঞেয়বাদী কুসংস্কারকে খণ্ডন করা। অজ্ঞেয়বাদ জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে আমাদের আত্মবিশ্বাসকে নষ্ট করে। কিন্তু কেবল সাধারণ অভিজ্ঞতার উপর আস্থা স্থাপন করলেই বিশেষ জ্ঞানের যথার্থতা লাভ করা যায় না। আমরা যদি স্পিনোজা (Spinoza) এবং বোসাঙ্কের (Bosanquet) মত গ্রহণ করি, অর্থাৎ স্বীকার করি যে চিন্তার ধর্মই হল—'প্রত্যেক স্বীকৃতির অর্থ অস্বীকৃতি, তাহ'লেও যখন কোন বিষয় সম্পর্কে আমাদের ইতিবাচক জ্ঞান সন্দেহ-মুক্ত হয় (অর্থাৎ স্বীকার করি) তখনও ভ্রান্তি, স্বপ্ন, ভ্রম প্রত্যক্ষণ, অলীক প্রত্যক্ষণ প্রভৃতির সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। স্পষ্টতঃ এগুলি ব্যক্তিগত ধারণা। বাস্তব সত্য এদের থেকে লাভ করা যায় না। ধর্মীয় জ্ঞান বা পরম সত্তার অভিজ্ঞতা যে ভ্রম প্রত্যক্ষণের ফল নয়,—এ বিশ্বাসের সমর্থনে কি কোন যুক্তি আছে? সংশয়বাদী অন্ধ বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। এখন আমরা আরো সুনির্দিষ্ট ভাবে 'ধর্ম কি সত্য'? এই প্রশ্নের পর্যালোচনা করতে পারি। জগৎ সম্পর্কে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবে কি যথার্থ? মানুষের আধ্যাত্মিক আদর্শ অন্বেষণের ক্ষেত্রে বিশ্বপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য কি মানুষকে সহযোগিতা করে? মানুষের সকল মূল্যবোধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা-উদ্যম সব কিছু কি স্বপ্নে গড়া মাকড়সার জালের মত অলীক। অথবা সত্তার প্রকৃতিতে সত্যই এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে? উইলিয়ম জেম্‌স (William James) মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের এই রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে যে প্রকৃতির উন্নত অংশটি তার থেকে অধিক উন্নত এবং একই গুণবিশিষ্ট কোন কিছুর সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে সহ অবস্থিত। সেই 'অধিকতর' কিছু মানুষের বহির্জগতে ক্রিয়াশীল এবং তার সাহায্যেই মানুষ উন্নতি করতে পারে … … ''*

* William James—Varieties of Religious Experience. (1902), P. 508. cf, his Pluralistic Universe (1909), P. 307.

দান্তে (Dante) যে সুখদায়ী পরিজ্ঞান লাভ করেছিলেন তাই দিয়ে তিনি তাঁর Paradiso শেষ করেছেন—

একটি অবিরাম ঘূর্ণায়মান চক্রের মত
যার গতি এক ছন্দে বাঁধা
আমার ইচ্ছাও ঘোরে প্রেমের শাসনে
যে প্রেমের নির্দেশে ঘোরে সূর্য আর
অসংখ্য তারকা ।

তাহ'লে মানুষের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা অবস্থার সঙ্গে তার ব্যক্তি অভিজ্ঞতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে 'তারই মত, কিন্তু অধিকতর গুণবিশিষ্ট এক সত্তার সঙ্গে যে নিজেকে যুক্ত করতে পারে, 'সেই সত্তা মানুষের বহির্বিশ্বের উপর ক্রিয়াশীল।' মানুষের এই ধারণা ক্রমশঃ দূর হয়,—যে ভালবাসা তার অন্তরকে আন্দোলিত করে, সেই ভালবাসাই সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রকে আবর্তিত করে। এই ধারণা মানুষের পক্ষে অবশ্যই উৎসাহব্যঞ্জক। বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এবং মানুষের শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধগুলির প্রতি মমতাময়ী—এই বিশ্বাসই হল ধর্মবিশ্বাস। এগুলিকে প্রকৃতি নিরপেক্ষ কোন বিশ্লেষণে প্রমাণ করা কি সম্ভব হবে? ঈশ্বর বাস্তব না কল্প-কাহিনী? আমরা কি ফায়ারবাকের (Feuerbach) মত বলবো যে 'ঈশ্বর হলেন মানুষের ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাগুলি পূরণ হয়ে গেছে বলে মানুষ ভাবে ঈশ্বর হলেন সেই ইচ্ছা' ধর্মের স্বীকৃত সত্যগুলি কি শূন্য থেকে প্রাপ্ত এবং কেবল ব্যক্তিগত মানবিক আদর্শ মাত্র? এই প্রশ্নগুলি ধর্মের পক্ষে যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই গুরুত্ব যে সুদূরপ্রসারী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমরা প্রথমে এমন কতকগুলি দার্শনিক মতবাদ আলোচনা করবো যে মতবাদগুলি ধর্মের স্বীকৃত সত্যের বাস্তবতার যথার্থতা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করে। পরে আমরা দেখাতে চেষ্টা করবো, ধর্মের স্বপক্ষে কি কি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে।

I

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জগৎ-সম্পর্কিত যে মতবাদ ধর্মবিশ্বাসের সবচেয়ে বেশি অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল তার নাম প্রকৃতিবাদ। প্রকৃতিবিজ্ঞানের ভাষায় এই মতবাদ জগতকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিল। এই মতবাদ অনুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মানুষ সব কিছু জানতে সমর্থ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সেইজন্য আত্মা, উদ্দেশ্য, মূল্য প্রভৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা

এই মতবাদে পরিত্যক্ত হয়েছিল। অনেক রকমের প্রকৃতিবাদ আছে। আমাদের বর্তমান প্রয়োজনে আমরা মাত্র দু'রকম প্রকৃতিবাদ আলোচনা করবো। (1) গোঁড়া প্রকৃতিবাদ বা জড়বাদ (2) অজ্ঞেয়বাদী প্রকৃতিবাদ। অজ্ঞেয়বাদী প্রকৃতিবাদকে সাধারণতঃ কেবল প্রকৃতিবাদই বলা হয়। জড়বাদ মনে করে প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা যে জড় প্রকৃতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, পরম সত্তার সঙ্গে সেই প্রকৃতি অভিন্ন। আত্মা জড়ের এক রকমের প্রকাশ। আত্মা সম্পর্কে এর বেশি কোন কিছু মানতে জড়বাদিগণ রাজি নন। প্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হয়ত যথেষ্ট নয়, কিন্তু ঐ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে আমরা সত্তার একটি উল্লেখযোগ্য দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি, এবং ঐ পর্যন্তই কেবল সত্তা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে পারি। তাই জীবনের ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের জন্য আধ্যাত্মিক দিকটির অবহেলা করা যেতে পারে।

গোঁড়া জড়বাদের অসারতা অল্প দু' এক কথায় প্রমাণ করা যায়। বর্তমান যুগে ধর্মীয় চিন্তার প্রকৃত বাধাটা কিন্তু জড়বাদ থেকে আসে নি। জড়বাদ বিশ্বের সমস্ত গুণগত ঐশ্বর্যকে কেবলমাত্র পদার্থ ও গতিতে পর্যবশিত করেছে। এই মতবাদ অনুসারে পদার্থ এবং গতিই একমাত্র সত্য। Büchner Karl Vogt, Haeckel এবং Loeb এর মত ঊনবিংশ শতকের জড়বাদীদের চিন্তা এখন আর আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করতে পারে না। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে পদার্থকে চরম সত্য হিসেবে গ্রহণ করে জীবন ও জগতের জটিল বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা অতি সারল্য দোষ-দুষ্ট।

অধিকতর আধুনিক যুগের প্রকৃতিবাদ (যাকে আমরা অজ্ঞেয় প্রকৃতিবাদ বলেছি) অনেক কম দুঃসাহসী। এই মতবাদ অনেক সুচিন্তিত এবং তার সিদ্ধান্তগুলিও অনেক নম্র। জ্ঞানশাস্ত্রে (Epistemology) এই মতবাদ বিশ্বাসী। তাই প্রাচীন জড়বাদীদের মত পরম সত্তা, সম্পর্কে এই মতবাদের কোন গোঁড়ামী নেই। এই মতবাদ অনুসারে 'পদার্থ এবং আত্মা' দ্রব্য হিসাবে উভয়েই অজ্ঞেয়। ঐ দ্রব্যগুলির কেবলমাত্র প্রাকল্পিক মূল্য আছে। আমরা পরম সত্তাকে জানতে পারি না। কেবলমাত্র প্রপঞ্চময় জগতকে জানতে পারি। সেইজন্য এই মতবাদ অনুসারে প্রপঞ্চই বিশ্ব। পদার্থের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপই আমাদের সকল ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধন করে। আধ্যাত্মিক প্রপঞ্চ যেহেতু ক্ষীণ ছায়া মাত্র জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাকে অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। এই মতবাদের সবচেয়ে বড়

সমর্থক হলেন ইংলণ্ডের হাক্সলে (Huxley)। তিনি মানুষের সকল রকম ধর্মীয় চিন্তাকে (অর্থাৎ যে চিন্তার সঙ্গে আত্মার যোগাযোগ আছে) একে একে বিসর্জন দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'আমরা দ্রব্যের প্রকাশকে আত্মা বলবো, না আত্মার প্রকাশকে দ্রব্য বলবো, সেটা নিতান্তই একটা মুহূর্তের ব্যাপার। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য সর্বস্তরের জড়বাদীদের মধ্যে একই মত শব্দ নির্বাচন অধিকতর কাম্য। তার ফলে প্রপঞ্চের সঙ্গে চিন্তা সহজে যুক্ত হতে পারবে আর আধ্যাত্মিক শব্দগুলিকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র করে ফেলা সম্ভব হবে। কারণ আধ্যাত্মিক শব্দ জ্ঞানের রাজ্যে, অকারণ জটিলতা ও অস্পষ্টতার সৃষ্টি করে।' জেমস্ ওয়ার্ড (James Ward) প্রশংসনীয়ভাবে জড়বাদের বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখ করেছেন। "জড়বাদে পদার্থ না থাকলেও তার ফলাফলগুলি থেকে যায় কিন্তু অধিবিদ্যা থেকে সে বর্জিত হয়।"* এই মতবাদের সমর্থকেরা খুব সততার সঙ্গে জড়বাদের অভিযোগ খণ্ডন করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নামমাত্র। ব্যবহারিক প্রয়োজনে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দরকার নেই এই যুক্তিতে তাত্ত্বিক আলোচনাতেও আত্মাকে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই—এ কথা প্রমাণিত হয় না। যে ভাবেই হোক প্রকৃতিবাদ আমাদের পরিচিত জগতকে একটা আত্মা-বেষ্টিত স্বয়ংসম্পূর্ণ জগতে পরিণত করেছে। আধ্যাত্মিক গুণ ও মূল্যগুলিকে বিদেশীর মত জোর করে জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। কারণ তাদের অনুপ্রবেশ ঘটলে জগতের স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং স্বয়ংক্রিয়তার ধারণা ভেঙ্গে তচনচ হয়ে যাবে। তাছাড়া এই মত অনুসারে জগৎ যান্ত্রিক নিয়মে শাসিত, জড় দ্রব্য ও গতির অন্তহীন ভাঙ্গা-গড়া মাত্র। জগতের এই রকম বর্ণনায় বিজ্ঞান সন্তুষ্ট হতে পারে। কারণ বিজ্ঞান জগতের পরিমাণ-গত ভিন্নতাই কেবল স্বীকার করে। গুণগত কোন ভিন্নতা জগতে আছে কি নেই তাকে নিয়ে বিজ্ঞান বড় একটা মাথা ঘামায় না। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে জড় জগৎ সম্পর্কে প্রকৃতিবাদের এই বিশ্লেষণ যথার্থ; তাহলেও মানুষের চেতনায় আধ্যাত্মিকতা, মূল্যবোধ, উদ্দেশ্য প্রভৃতিকে স্বীকার করে নিতে বাধা কোথায়? এ বিষয়ে প্রকৃতিবাদের জবাব কিন্তু স্পষ্ট। তাঁরা মানুষকেও যন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। হাক্সলে (Huxley) বলেছেন, মানুষ একটি সচেতন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। চেতনা যেন এক ঘুমন্ত অংশীদার। সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে যেন সেই সব

* J. Ward—Naturalism and Agnosticism (1899), 3rd ed (1906). vd. II P. 205.

কিছু করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেহযন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে সকল কাজ করে যাচ্ছে। আত্মা মানুষের দেহে রহস্যজনকভাবে যুক্ত আছে। সে আত্মা দেহের একটা দুর্বল অহেতুক পরিশিষ্ট মাত্র। রেলগাড়ির ছায়া যেমন রেলগাড়ির গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না, তেমনি আত্মাও দেহযন্ত্রের কাজকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারে না। আত্মা দেহযন্ত্রের ছায়ার মত। তার বেশি কিছু নয়।

এই যুক্তিগুলিকে যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় তাহ'লে প্রশ্ন ওঠে, এই যান্ত্রিক জগতে ঈশ্বরের কি কোন ঠাঁই আছে? তিনিও তাহ'লে স্বয়ংক্রিয় জগৎ-যন্ত্রের গতির ছায়া মাত্র। ঈশ্বর জগৎ-যন্ত্রের ঘুমন্ত অংশীদার, বিশ্ব-নাটকের এক চরম বিলাসী ও নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র। তিনি বিশ্বের নিয়ন্তা নন। তিনি যেন এ্যারিস্টটলীয় (Aristotle) ঈশ্বরের এক বিমর্ষ প্রেতাত্মা, এখনো আত্মচিন্তায় মগ্ন এবং তাতেই তিনি তৃপ্ত। তাঁর চিন্তা বাস্তব জগতের ঘটনাবলীর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অতএব তিনি কোন অর্থেই বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করছেন না।"

প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভিত্তিতে যে বিবর্তন হয় সেই বিবর্তনবাদের উপর এবং যান্ত্রিক মতবাদের উপর প্রকৃতিবাদ প্রতিষ্ঠিত। তাই বিশেষ বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য সাধনে এই মতবাদের যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। বিজ্ঞানী নিজ অনুসন্ধানের জন্য একটি পরিধি সুনির্দিষ্ট করে নেন। যান্ত্রিক মতবাদের সাহায্যে সেই গণ্ডীর মধ্যে বিজ্ঞানী অত্যন্ত সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে পারেন। ভাষাকে বাহুল্য-বর্জিত করে, অনির্দিষ্ট কিছুকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত না করে, সুনির্দিষ্টভাবে পরিমাপযোগ্য বিষয়ের মধ্যে নিজের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রেখে, বৈজ্ঞানিক সূত্রের মত নিশ্চয়তা লাভ করার জন্য জটিল বিষয়গুলিকে সহজ ও সরল করে নিয়ে বিজ্ঞানী নিজ উদ্দেশ্য সাধন করেন। বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কোন একটি লক্ষ্যে পৌঁছানোর কাজে প্রকৃতিবাদ যে একটি কার্যকরী প্রকল্প তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে এই মতবাদের ভূমিকা নগন্য। অভিজ্ঞতার একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে এই মতবাদ অবশ্যই মূল্যবান, কিন্তু সমগ্র অভিজ্ঞতার দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে এই মতবাদকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। দর্শন একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে অভিজ্ঞতার প্রত্যেকটি দিককে এবং সমগ্র অভিজ্ঞতাকে এক করে আলোচনা করতে চায়। কিন্তু প্রকৃতিবাদ অভিজ্ঞতার এক একটা দিককে পৃথক করে গ্রহণ করে। যখন সে নিজেকে

দর্শনের সমগোত্রীয় ভাবে তখন অস্বাভাবিকভাবে অভিজ্ঞতার ঐ একটি দিককেই সমগ্র অভিজ্ঞতার পর্যায়ভুক্ত করতে চায়। জীবনের সামগ্রিক বিশ্লেষণের তাৎপর্য এই মতবাদ উপলব্ধি করতে পারে না। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যেগুলি অপরিহার্য সেই অর্থ, মূল্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শকে এই মতবাদ স্বীকার করে না। বর্ণনার ক্ষেত্রে এই মতবাদ সফল সন্দেহ নেই, কিন্তু মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মতবাদটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এমনকি বিজ্ঞানেও পারম্পর্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এবং ঐ পারম্পর্য এবং পরিমাণগত ভিন্নতার সাহায্যে আমরা জাগতিক নিয়ম বুঝতে পারি। কিন্তু প্রকৃতিবাদ উঁচু নীচু সবকে সর্বনিম্নস্তরে একাকার করে দিয়েছে। প্রিংগ্‌ল প্যাটিশনের (Pringle-Pattison) ভাষায়, "প্রকৃতিবাদের পদ্ধতি হল লঘুকরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা। উন্নতকে অনুন্নত দিয়ে ব্যাখ্যা করা, সামাজিক এবং মানসিক বিষয়কে জীববিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যা করা, জীববিজ্ঞানের বিষয়কে অজৈব রসায়নের স্তরে নামিয়ে এনে ব্যাখ্যা করা, আবার অজৈব রসায়নকে কেবলমাত্র পরিমাণগত সম্বন্ধে রূপান্তরিত করা। অপর পক্ষে এই মতবাদে নীতিবিজ্ঞান, সৌন্দর্যতত্ত্ব, তর্কবিদ্যা প্রভৃতি আদর্শগত বিজ্ঞানের নিজস্ব ক্রিয়ার কোন অস্তিত্ব নেই বললে চলে। শাস্ত্রগুলি সব সিদ্ধান্তে মৌন সম্মতি দিয়ে চলেছে। যখন ঐ লঘুকরণের পদ্ধতি তার্কিক সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছায়, তখন বিশ্বের অনন্ত বৈচিত্র্য ও সম্পদ কেবল পরমাণুর নৃত্যে পরিণত হয়। আমাদের দিনের সমস্ত আলো নক্ষত্রহীন রাত্রিতে রূপান্তরিত হয়। সেই গাঢ় তমিস্রায় সকল বেড়ালকেই কালো মনে হয়।" লোট্‌জা (Lotza) আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন—বিচিত্র জগৎ-নাট্যের প্রকৃত রসটি উপভোগ করতে আমরা ব্যর্থ হবো যদি আমাদের মনোযোগ থাকে কেবলমাত্র দৃশ্যপট, আলো, মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চের কলাকৌশলের দিকে। নাটক এসব ছাড়াও বাড়তি কিছু। এবং সেটাই প্রধান। এগুলি উপলক্ষ্য মাত্র। আবার কাগজ কালির বিশ্লেষণে অর্থাৎ নাট্য-সমালোচনার ফলেও নাটকের সত্য বোঝা যাবে না।

এই মতবাদ অনুসারে মানুষের মনও একটা উপ-প্রতিভাস (epi-phenomenon)। প্রতিভাসকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন ক্ষমতাই তার নেই। হাক্সলে (Huxley) বলেছেন, "দেহে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যে পরিবর্তন হয় তার চেতনার প্রতীক হল আমাদের মানসিক অবস্থা। অনুভূতি ইচ্ছা প্রভৃতি আমরা যাদের বলি সেগুলির কারণ কোন ঐচ্ছিক ক্রিয়া নয়। সেগুলি মস্তিষ্কের অবস্থার প্রতীক মাত্র। কারণ মস্তিষ্কের পরিবর্তনই হল ঐগুলির অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা।"* যদি আমাদের দৈনন্দিন

* Quoted by James Ward, Op cit. Vol I, P. 179.

জীবন-যাত্রায় ইচ্ছা অনুভূতির কোন ভূমিকা না থাকে তাহ'লে প্রতীকেরই বা প্রয়োজন কি? ওটা তা'হলে মস্তিষ্ক ও দৈহিক পরিবর্তনের ফলে বাস্তব জগতে নিজস্ব গতিতে প্রবাহিত এক ছায়া জগতের প্রতিধ্বনি মাত্র। চেতনা যদি মনুষ্য দেহের একটি দুর্বল পরিশিষ্ট মাত্র হয়, তাহলে এর অস্তিত্ব কি কেবল শোভা বর্ধনের জন্য? কারণ প্রয়োজনীয় কোন কাজেই ত সে আসবে না। জীবন সংগ্রামে প্রাণীর কোন কাজ যদি চেতনা না করে তাহ'লে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিষ্ঠুর নিয়মে চেতনা একদিন পরিত্যক্ত হবে। কিন্তু যদি চেতন মন ছাড়া কেবল দেহযন্ত্রের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাটক রচনা করা সম্ভব হত তাহ'লে প্রকৃতি অকারণে সেক্সপীয়রের উপর চেতনার বোঝা চাপিয়ে দিত না। দৈহিক উদ্দীপককের দৈহিক প্রতিক্রিয়াই কেবল নাটক পড়া নয়। আমাদের ব্যাখ্যা, প্রশংসা, উপভোগ প্রভৃতিও কেবলমাত্র প্রতিবর্ত ক্রিয়া নয়। এগুলি যে মানসিক ক্রিয়া তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই মানসিক ক্রিয়া আমাদের জীবন-যাত্রার উপর একটি সূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করে থাকে। স্বাধীনতা, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ প্রভৃতি মানুষের অধ্যাত্ম প্রকৃতির অন্তরঙ্গ গুণগুলিকে এই মতবাদ (চেতনার স্বয়ংক্রিয়তার মতবাদ) অস্পষ্ট আয়নায় প্রতিবিম্বিত করে তোলে। কারণ বাস্তব জগতের প্রকৃত ঘটনাবলীর সঙ্গে এদের কোন যোগ নেই। বাস্তব জগত জড়জগৎ মাত্র। আমাদের সমস্ত যৌক্তিক জীবন এই মতবাদের বিরুদ্ধে।

ধর্মীয় সত্যতার প্রসঙ্গে এই সব আলোচনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আমরা দেখেছি যে ধর্মীয় চেতনা মূল্যের বাস্তবতায় বিশ্বাসী। জীবনের চরম মূল্যবোধ কেবল প্রাকৃতিক বিষয় সম্পর্কে মানুষের ধারণা মাত্র নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ভিত্তিস্বরূপ। আমাদের জীবনের চরম ও পরম অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্বগোত্রীয়। প্রকৃতিবাদ তার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সর্বনিম্ন সম্পর্ক অর্থাৎ পরিমাণগত সম্পর্কটি অবশিষ্ট রেখেছে। আমাদের পরম অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক বিষয় সম্পূর্ণ নিরুত্তাপ ও নিরপেক্ষ। জাগতিক এই শীতল নৈর্ব্যক্তিকতায় এবং কেবলমাত্র ভৌত নিয়ন্ত্রণের ফলে, জগতের সুবিশাল যান্ত্রিকতার মধ্যে মানুষের সকল মূল্যবোধ তুচ্ছ ও অর্থহীন হয়ে পড়ে।

কিন্তু মানুষের প্রতি জগতের শত্রুতার কথা অর্থহীন। কারণ শত্রুতা স্বীকার করার অর্থ মানুষ সম্পর্কে জগতের আগ্রহ স্বীকার করা। প্রকৃতির কোন বিষয় আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন তার অর্থ এই নয় যে প্রকৃতি আমাদের প্রতি

শত্রুভাবাপন্ন। মানুষের সুখ দুঃখের প্রতি নির্মম ঔদাসীন্যই তার কারণ। "প্রকৃতির যান্ত্রিক নিয়মে বাঘের নিষ্ঠুরতা নেই, আছে একটা নির্বোধ ভাবলেশ-হীনতা। একটা গাড়ির চাকা যে রকম নির্মোহ নিরাসক্তভাবে একটা পাথরের টুকরো মাড়িয়ে যায় ঠিক একই রকম নিরাসক্তভাবে একটা মানুষের গলাও মাড়িয়ে যেতে পারে"* এই ঔদাসীন্যের ফলে পাথর ও মানুষের মধ্যে যেমন কোন পার্থক্য থাকে না, তেমনি পাপীর সঙ্গে সাধুর, নির্বোধের সঙ্গে প্রতিভাবানেরও কোন তফাৎ থাকে না। সব কিছুই স্বতন্ত্র। যেমন ভূমিকম্প ও জাহাজ দুর্ঘটনা, কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক নেই। এখন দেখা যাচ্ছে প্রকৃতি নিরপেক্ষ। কোন পক্ষপাতমূলক আচরণের কোন সুযোগ এখানে নেই। কিন্তু প্রকৃতির এই নিরপেক্ষ-তাকে সুবিচার বলা যেতে পারে কি? মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ করতে প্রকৃতি কি কোন সহযোগিতা করে? যিশু প্রকৃতির নিরপেক্ষতা বলতে বুঝেছেন, "ঈশ্বর সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন ভাল মন্দ সকলকেই কিরণ দিতে, বৃষ্টি পাঠিয়েছেন সৎ ও অসৎ সকলের জন্যই"। মূল্যের বাস্তবতার প্রশ্নটিতে আমরা আবার ফিরে আসবো, যখন এই বিষয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করবো। এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে সকল ভাববাদী দার্শনিকই একথা অস্বীকার করেন (ধর্ম যেমন অস্বীকার করে) যে সত্য সুন্দর ও মঙ্গল কেবলমাত্র পরমাণুদের যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার ফলে দৈবাৎ সৃষ্টি হয়েছে। সত্য সুন্দর ও মঙ্গল এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এদের সঙ্গে যন্ত্র অপেক্ষা জীবনের উপমাই হবে শ্রেয়। এগুলি ফুলের কুঁড়ির মত; যন্ত্রে তৈরী কোন কিছু নয়। এদের মূল রয়েছে অন্তরের অনেক গভীরে। বস্তুতপক্ষে পরম সত্তার স্বরূপের বিশ্বাসযোগ্য প্রকাশ ঘটেছে এই সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের মধ্যে।

II

আধুনিক কালে নতুন এক রকমের প্রকৃতিবাদের আবির্ভাব হয়েছে। আমরা এর নাম দিচ্ছি মনোবৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ। মনোবিজ্ঞান এখন ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। প্রাচীন প্রকৃতিবাদ বিশ্বপ্রকৃতিকে কেবল প্রকৃতি বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যা করেছিল। তার ফলে আধ্যাত্মিকতা একটা নগন্য ছায়া জগতে পরিণত হয়েছিল। নব্য মনোবিজ্ঞানিগণ ধর্মবিশ্বাসের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁরা মনে করেন, ধর্মবিশ্বাস চেতন মনের উপর নির্জ্ঞান মনের

* Autobiography of Mark Rutherford (9th ed), P. 30.

প্রভাব থেকে উদ্ভূত। সতরাং এই বিশ্বাসের কোন যুক্তিসঙ্গত অস্তিত্ব নেই। অথবা এই বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে কোন বাস্তব সত্তাও প্রকাশ পায় না। আমাদের মনে হয়, ধর্মবিশ্বাসের বাস্তব সত্যতার উপর তীব্রতম আক্রমণ করেছে নব্য-মনোবিজ্ঞান। ধর্মদর্শনের উপর নব্য-মনোবিজ্ঞানের কতটা প্রভাব—সেই আলোচনা আরো বিস্তৃতভাবে করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু লেখকের কাছে বিষয়টি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপাদান নেই এবং আলোচনা করার মত জায়গারও একান্ত অভাব। তাই আমি নব্য-মনোবিজ্ঞানে আক্রমণগুলি, এবং কিভাবে তাদের জবাব দেওয়া যেতে পারে এখানে সংক্ষেপে কেবল তাই উল্লেখ করবো।

নব্য-মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ দু'টি উৎস থেকে হয়েছে বলা যেতে পারে। (1) ডারউইনের (Derwin) মতবাদ—মানুষ এসেছে প্রাণী থেকে (2) অচেতন বা নির্জ্ঞান মনের আধুনিক আবিষ্কার। প্রথম মতবাদটিতে বলা হয়েছে যেহেতু মানুষ সৃষ্টি হয়েছে জৈব বিবর্তনের ফলে, তার দেহ ও মনের সঙ্গে অনুন্নত প্রাণীর দৈহিক ও মানসিক ধারাবাহিকতা রয়েছে। ডারউইনের (Derwin) এই স্বীকৃত মতবাদটি ক্রমে মনোবিজ্ঞানে বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এখন অবশ্য তুলনামূলক মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব বিবর্তনবাদ রয়েছে: মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন সহজাত প্রবৃত্তিগুলি মানুষ এবং জন্তুদের ক্ষেত্রে অভিন্ন। এখানে দেখা যাচ্ছে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক সময় মনোবিজ্ঞান মানুষের চিন্তাধারার বিকাশ সম্পর্কে অধিকতর আলোচনা করত। এখন নব্য-মনোবিজ্ঞানীরা কেবলমাত্র জান্তব আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার উপরই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে স্থাপন করেছেন। এর থেকেও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল মনের অবচেতন অঞ্চলের আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের প্রধান কৃতিত্ব মায়ার্সের (F. W. H. Myers)। ধর্মীয় মনোবিজ্ঞানে মায়ার্সের (Myers) অবচেতন মনের ধারণা উইলিয়ম জেম্স (William James) তাঁর Varieties গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে প্রচলন করেন। "অনুন্নত অবস্থায় যাই হোক না কেন ধর্মের উন্নত অবস্থায় আমরা যে অতীন্দ্রিয় ধারণা লাভ করেছি, সেই ধারণা অবচেতন স্তর থেকেই আমরা চেতন মনে পেয়েছি"। অবশ্য তিনি সমজাতীয় অধিকতর গুণবিশিষ্ট সত্তার (যাকে তিনি ঈশ্বরও বলেছেন) বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নি। 'অনুন্নত অবস্থায়' ধর্মের সম্পর্ক বাহির্জগতের সঙ্গেই বেশি ছিল। ধর্ম নিজের আত্মার মধ্যে তখন সীমাবদ্ধ ছিল না।

বিশ্বচরাচরে এক আদর্শ নিয়ম রয়েছে। সেই নিয়ম শাশ্বত। ধর্মবিশ্বাস সেই শাশ্বত নিয়ম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।" তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন এই বিশ্বাস কিছুটা 'অতিরিক্ত বিশ্বাস'* (Over belief)।

বর্তমান যুগে মনঃসমীক্ষণবাদী সম্প্রদায়, অথবা বলা যেতে পারে ফ্রয়েড (Freud) এবং য়ুঙ্ (Jung) পরিচালিত সম্প্রদায় মায়ার্স (Myers) এবং জেম্‌সের (James) মতবাদকে স্বীকার করেছে। তারপর তারা এই মতবাদকে পুংখানুপুংখরূপে আলোচনা করে অধিকতর বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলেছে। ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান মন বলতে বোঝায় মনের একটা অন্ধকার অঞ্চল। চেতন মনে যে সব ইচ্ছা বেদনাদায়ক বা অসমীচীন বলে মনে হয়, সেই ইচ্ছাগুলি ঐ অন্ধকার মনে অবদমিত হয়। চেতন মন থেকে ঐ সব অসঙ্গত কামনাগুলি নির্বাসিত হয়। ঐ অবদমিত বাসনাগুলি আবার চেতন মনে আসে। কিন্তু তখন তারা আসে ছদ্মবেশে। অবদমিত বাসনাগুলি কখনো নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় না। তারা তাদের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করে। বিশেষতঃ স্বপ্নের রূপ ধরে তারা আত্মপ্রকাশ করে। অপূর্ণ ইচ্ছাই স্বপ্নের রূপ পরিগ্রহ করে। যে ইচ্ছাগুলিকে চেতন মন একদা নির্বাসিত করেছিল, তারাই ঘুমের সময় চেতন মনের প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে, চেতন মনে পুনঃপ্রবেশ করে এবং পরিতৃপ্ত হয়। ফ্রয়েড মনে করেন সকল ইচ্ছাই মূলতঃ যৌন ইচ্ছা। আমরা এখানে ফ্রয়েড এবং য়ুঙ্ এর মনোবিজ্ঞানের সেই অংশটি কেবল আলোচনা করবো যার সঙ্গে ধর্ম-দর্শনের সম্পর্ক রয়েছে। য়ুঙ্-এর (Jung) Psychology of Unconscious (ইং-অনুবাদ 1916) গ্রন্থে এই বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা রয়েছে। তিনি সেখানে মন্তব্য করেছেন, সকল ধর্মবিশ্বাসের জন্ম হয়েছে যৌনতা থেকে (eroto-genetic)। ধর্ম হল সামাজিক দিবাস্বপ্ন। আদিম মানসিক শক্তির অথবা লিবিডোর (Libido) অচেতন ক্রিয়ার ফলে এই স্বপ্নের সৃষ্টি হয়েছে। অথবা বলা যেতে পারে ধর্ম হল বিকাশমান যৌন জীবনের প্রতীকী কল্পনা। শৈশবে প্রত্যেক শিশু পিতামাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকে। নির্ভরশীলতার সেই শৈশব স্মৃতি নির্জ্ঞান মনে সঞ্চিত থাকে। নির্জ্ঞান মনের সেই স্মৃতি পিতৃরূপ কল্পনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। পিতৃ-সদৃশ ঈশ্বরের বাস্তব সত্তা কল্পনা করে [ঈশ্বরের কাছে আমরা আমরণ নির্ভরশীল থাকি]। তার সঙ্গে

* William James—Varieties, PP. 508—513.

স্বাভাবিকভাবে শ্রদ্ধাভক্তি যুক্ত হয়। নির্ভরশীল থাকার অবদমিত আকাঙ্ক্ষাই ঈশ্বরের রূপ পরিগ্রহ করে এবং জাতির পিতার আকাঙ্ক্ষা (অর্থাৎ যার উপর সমগ্র জাতি নির্ভর করতে পারবে) এইভাবে ঈশ্বর প্রতীকের সাহায্যে পূর্ণ হয়। যুঙ্-এর সাম্প্রতিক রচনা থেকে বিশিষ্ট কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "মানুষ নির্জ্ঞান মনে আরও একটি সম্ভাবনা লাভ করল। সৃজনশীল কল্পনার মাতৃজঠর হল এই নির্জ্ঞান মন"। "ব্যক্তির অতীত জীবনের গূঢ়ৈষা নির্জ্ঞান মনে প্রকট হয়ে থাকে ; সবার উপরে থাকে পিতা-মাতা সম্পর্কিত গূঢ়ৈষা (Complex)। শৈশবে পিতা-মাতার প্রতি যে নির্ভরশীলতা থাকে তার সঙ্গে এই গূঢ়ৈষা অভিন্ন। লিবিডো (Libido) নির্জ্ঞান মনে অবদমিত হয়ে পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। শৈশব-স্মৃতি, বিশেষ করে শৈশবের পিতা-মাতার স্মৃতিটি জীবনের সঙ্গে মিশে যায়। এই স্মৃতিগুলি নির্জ্ঞান মনে পুনরায় সক্রিয় হওয়ার ফলে যে কল্পনার সৃষ্টি হয় তার থেকেই দেব-দেবীর ধারণা জন্মলাভ করে, এবং ঐ সব দেব-দেবদেবীর সঙ্গে শিশুসুলভ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এইভাবে ধর্মের উদ্ভব হয়"। ব্যক্তির চেতন মনে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্বের সর্বাত্মক ধারণার সৃষ্টি হয় নির্জ্ঞান মনে সঞ্চিত অসীম ক্ষমতা থেকে। এই অবদমিত অপরিসীম বাসনা কল্পনাকে ব্যক্তিরূপ প্রদান করে। এইভাবে ঈশ্বরের ধারণার জন্ম হয়। আমাদের মনোবিজ্ঞানে ঈশ্বর নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া মাত্র। তথাকথিত ঐশ্বরিক ক্রিয়ার উৎস হল আমাদের নিজেদের অন্তর্নিহিত আত্মা। উদ্ভট কল্পনা শব্দটিতে যে গূঢ়ৈষা প্রকাশিত হয় অন্যান্য গূঢ়ৈষা থেকে তাকে স্বতন্ত্র করা যায়। কারণ এই গূঢ়ৈষার সঙ্গে প্রকৃত বাহ্য ঘটনার কোন সংযোগ নেই"*। এই সঙ্গে একটা কথা বলে রাখা দরকার। যুঙ্ (Jung) 'কল্পনার গতিময় পদ্ধতির মূল্যের উপর' যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। "এমন কোন মহান বিষয় কি আছে, যা আগে কল্পনায় ছিল না ? কেবল শিল্পীদের ক্ষেত্রে নয়, প্রত্যেক সৃজনশীল ব্যক্তি, তার জীবনের শ্রেষ্ঠ যা কিছু লাভ করেছে তার জন্য সে কল্পনার কাছে ঋণী"‡ "তা হলেও এই সত্যটা আমাদের স্বীকার করতে হচ্ছে যে সৃষ্টি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। কারণ তার সঙ্গে বহির্বিশ্বের কোন যোগাযোগ নেই"।

* C. G. Jung—Psychological Type (E. Tr 1923), PP 144-156f. 300f. ,573 (abbreviated)

‡ Op. Cit. PP 77-82

ফ্রয়েড (Freud), য়ুঙ্ (Jung) এবং তাঁদের অনুগামীদের কাজের যে প্রভূত গুরুত্ব রয়েছে একথা কেউই অস্বীকার করবেন না। এক অর্থে তাঁদের আবিষ্কারকে যুগান্তকারীও বলা যেতে পারে। এর ফলে মনোবৈজ্ঞানিক আলোচনার একটা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং মনোবিজ্ঞানের একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এসব বিষয়ে সকলে একমত। কিন্তু তাঁরা যখন গবেষণা বন্ধ রেখে মন্তব্য করেন, সাধারণ লোকদের কেবল 'অপেক্ষা করা' ও 'পর্যবেক্ষণ করা' ছাড়া কোন বিকল্প নেই, তখন মনে হয় তাঁদের এই সিদ্ধান্তটি অতিশয়োক্তি দোষদুষ্ট। অথবা এই সময় তাঁরা একটা মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁদের মতবাদ কতটা সত্য বা মিথ্যা সেই আলোচনা আমাদের এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। ধর্মীয় ধারণার বাস্তবতা প্রসঙ্গে তাঁরা যে দার্শনিক প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন, আমরা কেবলমাত্র এখন সেই আলোচনা করবো।

যে পরম সত্তা মানুষের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন তার সঙ্গে মানুষের কেবল বাণিজ্যিক সম্পর্ক কিনা, অথবা মানুষ তা নির্জ্ঞান মনের জান্তব আকাঙ্ক্ষাগুলির প্রতিচ্ছবিকেই কেবল উপাসনা করছে কিনা, অর্থাৎ নিজের নির্জ্ঞান মনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতেই সে সর্বদা ব্যস্ত কিনা—প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি ধর্মের আলোচনার ক্ষেত্রে যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। য়ুঙ্ যদিও সৃজনশীল কল্পনার প্রশংসা করেছেন, কিন্তু আমরা যখন একবার জানতে পেরেছি, তারপর আর নির্বোধের স্বর্গে বাস করে যেতে পারি না। দিবাস্বপ্নের ছদ্মবেশে কোন প্রকৃত ধর্ম সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। কারণ এই দিবাস্বপ্ন ছদ্মবেশী লিবিডো (Libido) ছাড়া আর কিছু নয়। মনঃসমীক্ষকদের 'কল্পনার গতিময় পদ্ধতি'র মূল্য বিশ্বাস করাটা একটা কৌশল হতে পারে। তাঁরা হয়ত চান না যে আমরা কল্পনার প্রকৃত সংবাদটা জেনে ফেলি। কারণ যখনই আমরা সেটা জেনে ফেলবো তখন আর কল্পনাকে গতিশীল বলে স্বীকার করবো না। (অন্ততঃ ধর্মের ক্ষেত্রে কল্পনাকে গতিশীল বলে স্বীকার করবো না, কবিতার ক্ষেত্রে কল্পনা গতিশীল থাকতে পারে)। বিষয়টা নিশ্চয় 'অজ্ঞতাই আনন্দ' অথবা 'জ্ঞানী হওয়া মূর্খতা'র মত। অথবা প্র্যাট্ (Pratt) কৌতুক করে যেমন বলেছিলেন, (অবশ্য সেখানে তিনি ফ্রয়েড বা য়ুঙ্ সম্পর্কে কোন আলোচনা করছিলেন না) "প্রার্থনার মূল্য যদি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত হয় তাহ'লে এই সংবাদটা আমাদের বিজ্ঞ ধর্ম-মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক। তা না হ'লে খেলা তাড়াতাড়ি

শেষ হয়ে যাবে। মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করার মত ধর্ম তখন আর অবশিষ্ট থাকবে না। [কারণ ধর্মই থাকবে না। আমি নিজেকে নিজেই উপাসনা করছি অথবা আমি নিজের কাছে প্রর্থনা করছি এটা জানার পর কে আর উপাসনা বা প্রার্থনা করবে ?] যে হাঁসটা সোনার ডিম পাড়ছে আমরা তাকেই তাহ'লে হত্যা করে বসবো।"* একবার যদি মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের এই ভ্রম ঘুচিয়ে দেন, তাহ'লে কল্পনার ঈশ্বরকে মানুষ আর উপাসনা করবে না। মানুষের অপূর্ণ বাসনাগুলি ছদ্মবেশে চেতন মনের আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয়ে যদি ঈশ্বর সৃষ্টি করে তবে সেই ঈশ্বরকে মানুষ কেন উপাসনা করবে ? যে দড়ির অপর প্রান্তে কোন কিছু বাঁধা নেই তাকে অকারণে কেউ টেনে যেতে চাইবে না।

মনোবিজ্ঞানিগণ মানসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করেন। তাঁরা যদি এই বিশ্লেষণের দ্বারা অনুমান করেন যে সকল ধর্মীয় বিষয়েরও তাঁরা বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং ধর্মকে ভ্রমাত্মক বলে প্রমাণ করতে পারবেন তাহ'লে তাঁরা নিজেরাই কিন্তু অসুবিধায় পড়ে যাবেন। কারণ এই একই পদ্ধতির সাহায্যে আমাদের চারিদিকের বাস্তব জগতকেও অস্বীকার করা যেতে পারে। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ এবং মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে অভিজ্ঞতা একটি ব্যক্তিগত মানসিক বিষয়। এর মধ্যে বাস্তব জগতের কোন স্থান নেই। কিন্তু জ্ঞাতা মনকে বিশ্লেষণ করার ফলে যদি জ্ঞেয় জগতকে অস্বীকার করতে হয়, তাহ'লে সেটিকে কোনমতে যুক্তিসঙ্গত বলে মেনে নেওয়া যায় না। [মনোবিজ্ঞান জ্ঞাতা যে মন তার বিশ্লেষণ করে। কিন্তু সেই একই পদ্ধাতিতে 'জ্ঞানের বিষয় যে জগৎ তাকেও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে] যখন মনোবিজ্ঞানীরা ভুলে যান যে অভিজ্ঞতা-লাভের প্রণালী এবং অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব জগতের দার্শনিক ভিত্তি পৃথক, তখনই তাঁদের আলোচনা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞতার যৌক্তিকতার প্রশ্ন অথবা সত্তার স্বরূপের প্রশ্নটি দর্শনের আলোচ্য বিষয়, মনোবিজ্ঞানের নয়। নির্জ্ঞান মনের বাসনার প্রতীক করে তুললেই ধর্মীয় ধারণাকে ভ্রমাত্মক প্রমাণ করা যায় না। কারণ, তখনো প্রশ্ন থাকে—বিশ্বজগৎ নির্জ্ঞান মনের সেই ইচ্ছাগুলির সঙ্গে কোন সংযোগ রাখে কি ? বিশ্বাসের মনোবৈজ্ঞানিক ইতিহাস অনুসন্ধান করলেও এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। কারণ ঐতিহাসিক আলোচনা থেকে আমরা উৎপত্তি ও বিকাশের ধারাটির সংবাদ পেতে পারি। কিন্তু কোন

* J. B. Pratt--The Religious Consciousness (1921), P. 336.

বিষয়ের উৎপত্তি অকুলীন বলে তার পরিণতি সুন্দর হবে না এমন কোন কথা নেই। মোটকথা যথার্থতার প্রশ্নটিকে উৎপত্তির প্রশ্নের সঙ্গে মিশিয়ে ফেললে চলবে না। বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছিল স্থূল ইন্দ্রজাল থেকে। তাই বলে বিজ্ঞানের বর্তমান সাফল্যকেও কি আমরা ইন্দ্রজালের মত মিথ্যা ভাবব? আর একটি পদ্ধতি আছে। সেটি হল উন্নতকে অনুন্নত দিয়ে ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি। প্রকৃতিবাদের এই লঘুকরণ পদ্ধতির ত্রুটিগুলি আমরা আলোচনা করেছি। নব্য মনোবিজ্ঞানীদের সম্পর্কে একজন আধুনিক লেখক সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়েছেন। "ফ্রয়েড (Freud) পন্থীরা 'শৈশব যৌনতা'র উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের অবস্থা অনেকটা সেই উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মত, যিনি একটি ওক গাছের গোড়া খুঁড়ে খুঁড়ে অবশেষে আবিষ্কার করেছিলেন একটি ওক বীজ। এবং তিনি দাবী করেছিলেন যে ওক বীজে ওক গাছের সকল বৈশিষ্ট্যগুলিই রয়েছে। কারণ ঐ ওক বীজ থেকেই ত গাছটির উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু যেসব বিজ্ঞানী গাছের গঠন জানার জন্য প্রাণপাত করছেন, কিংবা যেসব শিল্পীরা ওক গাছের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন, অথবা যে কাঠের মিস্ত্রি ওক কাঠ ব্যবহার করছেন ওঁরা সকলেই মূর্খের স্বর্গে বসবাস করছেন। কারণ ওক গাছ ক্ষীয়মান ওক বীজ মাত্র"।*

আমাদের অপূর্ণ কামনা-বাসনাই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে এই যুক্তিতে ধর্মের বাস্তব সত্যকে ত অস্বীকার করা যায়ই না অধিকন্তু ধর্মের বাস্তবতার সমর্থনে এই যুক্তিকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। মানুষের প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে জগৎ সম্পর্কে যে আচরণ প্রকাশ পায় তার একটা তত্ত্ববিদ্যাগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। জগতের সঙ্গে আমাদের আচরণের মধ্যেই আমাদের ইচ্ছার প্রকাশ হয়। ইচ্ছা অর্থাৎ, কোন কিছু সম্পর্কে ইচ্ছা, এবং সেই 'কোন কিছু' অবশ্যই জগতে থাকে। হয় আমরা কিছু পেতে চাই, নয় কোন কিছু থেকে দূরে সরে থাকতে চাই—ইচ্ছার চরিত্র অনুযায়ী আমাদের আচরণও বিভিন্ন রকম হয়। কিন্তু যে-কোন ইচ্ছাই জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। অর্থাৎ জগতের অস্তিত্ব ইচ্ছার পূর্ব ধারণা। যে জগতে আমরা বাস করি সেই জগৎ আমাদের ইচ্ছার মধ্য দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করে। অবশ্য যে-কোন খামখেয়ালী ইচ্ছার সঙ্গে বাস্তব জগতের যে

* R.H. Thouless—An Introduction to the Psychology of Religion. (1923), PP 138f.

যোগ থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই। যেমন শিশু চাঁদকে খেলনা হিসেবে পেতে চায়। চাঁদ অবশ্যই খেলনা নয়। ক্রমাগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ভ্রমাত্মক বাসনাগুলি বর্জিত হয় এবং বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কার্যকরী ইচ্ছাগুলিই কেবল থেকে যায়। যাই হোক ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষাই ঈশ্বরের অস্তিত্বের একটি অকাট্য প্রমাণ। বস্তুবাদী আলেক্জাণ্ডার (Alexander) মানুষের আবেগ ও তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রশংসা করেছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বোসাঙ্কের (Bosanquet) মত ভাববাদী চিন্তাবিদও এইসবকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করেছেন। কারণ এদের তত্ত্ববিদ্যাগত মূল্য রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বোসাঙ্কে (Bosanquet) লিখেছেন, "ঈশ্বরের প্রতি মানুষের সহজাত আকাঙ্ক্ষাই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ। যেমন ক্ষুধার দ্বারা খাদ্যের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় এবং আমাদের যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রমাণ করে সঙ্গী বা সঙ্গীনীর অস্তিত্ব। অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে। কেউ না খেতে পেয়ে মারা যেতে পারে। আর কারো জীবনে কখনো সঙ্গীনী না মিলতে পারে। [যদিও মনে তার নিত্য আনাগোনা……] কিন্তু স্বভাবতঃ প্রতিটি বাসনা একটি বিষয়কে নির্দেশ করে। যদি তুমি ধর্ম বা উপাসনার মত বিশেষ রকমের কোন আকাঙ্ক্ষা বোধ কর [সকল রকমের অভিজ্ঞতার মধ্যেই এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষাই একটি আকাঙ্ক্ষাকে নির্দেশ করে] তাহ'লে এই আবেগের বিষয়কে স্বীকার না করে তোমার উপায় নেই। অন্ততঃ জগতের কিছু বৈশিষ্ট্য তোমাকে স্বীকার করতেই হবে।"*

III

এখন আমাদের সংক্ষেপে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আর একটি মতবাদের আলোচনা করতে হবে। এটিকে মতবাদ না বলে এক রকমের ভাবপ্রবণতাও বলা যেতে পারে। ধর্মের স্বীকৃত সত্যগুলিকে মেনে নেওয়ার পথে এই মানসিকতা একটা প্রচণ্ড বাধা। আমরা এই মানসিকতাকে সহজেই দুঃখবাদের স্বগোত্রীয় ভাবতে পারি। প্রকৃতিবাদীদের কাছে বিশ্বজগৎ নৈতিক দিক থেকে ভালও নয় মন্দও নয়, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। মানুষের নৈতিক মূল্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ উদাসীন। কিন্তু দুঃখবাদীদের কাছে জগৎ মূলতঃ মন্দ। অমঙ্গলের এখানে এতই প্রাধান্য যে বিশ্ব চরাচরের আদৌ যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে, তা অবশ্যই অসদুদ্দেশ্য। সৎ উদ্দেশ্যের বা মঙ্গলেচ্ছার কোন স্থান জগতে নেই। আমাদের এখন তাহ'লে সেই সুপ্রাচীন 'অমঙ্গলের সমস্যা'র আলোচনা করতে হয়। এই সমস্যা যুগ যুগ

* B. Bosanquet, Contemporary Philosophy (1921), p. 57

ধরে চিন্তাবিদদের বিপর্যস্ত করে এসেছে। সুতরাং অতি অল্প পরিসরে এই সুপ্রাচীন বিভ্রান্তিকর সমস্যা সম্পর্কে নতুন কিছু বলা, কিংবা সমাধানের কোন নতুন সূত্র দেওয়ার চেষ্টা করা নিতান্তই হঠকারিতা হবে। দুঃখের অভিজ্ঞতা সকলেরই রয়েছে। সংসারে অন্ততঃ চার রকমের অমঙ্গল আছে যথা—দুঃখ, ভ্রান্তি, কদর্যতা এবং পাপ। ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত সংসারে—যে চার রকম শ্রেষ্ঠ মূল্য রয়েছে বলে আমরা স্বীকার করি (যেমন—সুখ, সত্য, সৌন্দর্য ও মঙ্গল) এগুলি ঠিক তার বিপরীত। সত্য, শিব ও সুন্দরকে পরমমূল্য বলে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়। এগুলি কেবল মানুষের বা সমাজের মূল্যবোধ নয় এগুলি ধর্মীয় চেতনারও অন্তর্ভুক্ত। আরাম বা সুখকে ঠিক ঐ পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। অবশ্য বিশুদ্ধ সুখবাদীদের কাছে এমন কি সাধারণ মানুষের কাছেও সুখের একটা মূল্য রয়েছে। এবং সুখের সাহায্যেই অন্যান্য বিষয়ের মূল্যায়ন হয়ে থাকে। নিখিল সংসার সুখকর হবে এ আমাদের সকলের প্রত্যাশা। অন্ততঃ ঈশ্বর-শাসিত সংসারে সুখ এবং মূল্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকবে অর্থাৎ সুখ দিয়ে মানুষ মূল্যের পরিমাপ করতে পারবে—মানুষ এই প্রত্যাশা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনে দুঃখ, মিথ্যা, কদর্যতা এবং পাপের দুর্দান্ত প্রভাব। একদিকে বলা হচ্ছে মনুষ্যজীবন ঈশ্বরসৃষ্ট এবং ঈশ্বরের নির্দেশে পরিচালিত, আবার অন্যদিকে জগতে সুখ ও মঙ্গলের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের সর্বজনীন সত্যকে আবিষ্কার করাও সহজ হয়ে উঠছে না। প্রকৃতপক্ষে অমঙ্গলের সমস্যা নিয়ে যে আলোচনা হয়, তা হয়ে থাকে পরস্পর-বিরোধী দু'টি মূল্যের মধ্যে। তার একটিকে বলা যেতে পারে 'ভৌত অমঙ্গল' (দুঃখ যন্ত্রণা) অন্যটিকে বলা যায় 'নৈতিক অমঙ্গল' (পাপ)। আমরা যদি আমাদের আলোচনাকে এই দু'টির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি, তা'হলে কাজটি কিছুটা সহজ হবে। অবশ্য বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলে অন্যান্য বিষয়গুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ঈশ্বর যদি এই বিশ্ব-সংসার সৃষ্টি করে থাকেন, এবং নিয়ন্ত্রণ করেন, তাহ'লে ভ্রান্তি বা কদর্যতা এখানে কি করে থাকতে পারে? তেমনি দুঃখ যন্ত্রণা এবং পাপই বা কি করে থাকতে পারে?—প্রভৃতি প্রশ্ন খুবই যুক্তি-যুক্তভাবে এসে পড়ে। সংসারে যেসব দুঃখ-দুর্দশা রয়েছে তার অনেক ভয়ংকর ছবি আঁকা যেতে পারে। আমরা এই প্রসঙ্গে টেনিসন (Tennyson) প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করেছিলেন তা স্মরণ করতে পারি। 'প্রকৃতির দাঁত আর নখ রক্তে লাল হয়ে আছে।' প্রাণীকে বেঁচে থাকার জন্য যে সংগ্রাম

করতে হয় এবং যে ভয়ংকর দুঃখ-কষ্ট তাকে সহ্য করতে হয় ভিক্টোরীয় যুগের দু'জন বিখ্যাত লেখক তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। রোমানেস্ (Romanes) বলেছিলেন, "আমরা দেখছি যেসব প্রাণী জীবন-সংগ্রামে টিকে রয়েছে তাদের অর্ধেকেরও বেশি পরোপজীবী বা পরগাছা স্বভাবের। অনুন্নত, বোধশূন্য জীবগুলি উন্নততর ও অধিকতর সচেতন জীবগুলির উপর তাদের শোষণ চালাচ্ছে। আমরা দেখছি দাঁত আর তীক্ষ্ণ বাঁকা নখ দিয়ে, তারা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, হত্যা করছে, রক্ত শোষণ করছে। সর্বত্র একটা ত্রাসের রাজত্ব। ক্ষুধা আর অসুস্থতা, রক্ত চুইয়ে পড়ছে, শ্বাস নিতে গিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কেঁপে কেঁপে উঠছে। অবোধ চক্ষুগুলি মৃত্যুর করাল গ্রাসে নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে।" মিল (J. S. Mill) বলেছেন, "সত্যি বলতে কি মানুষ যেমন মানুষকে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখে বা ফাঁসী দেয়, তেমন ঘটনা প্রকৃতিতে নিরন্তর চলছে। বলা যেতে পারে একটা নৈমিত্তিক ক্রিয়া।" মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে যেসব দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছে তার তালিকা প্রণয়ন করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভূকম্পন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, হিমানীপাত, যুদ্ধ প্রভৃতির মত ব্যাপক বিপর্যয় ছাড়াও আছে ব্যক্তিজীবনের অজস্র জ্বালা-যন্ত্রণা। দারিদ্র্য, আত্মীয়বিয়োগ, অসুখ, উন্মত্ততা এবং প্রাত্যহিক জীবনের সহস্র অশান্তি ও উদ্বেগ কোন অংশে কম যন্ত্রণাদায়ক নয়। এই সব অভিজ্ঞতাই যুগে যুগে অনেক দুঃখবাদী সৃষ্টি করেছে। দুঃখবাদীরা তাই বলেছেন—সমস্তই বৃথা, মিথ্যার পেছনে অকারণ ঘোরপাক খাচ্ছি।' অথবা 'এ জগৎ জীবনধারণের উপযোগী নয়।' ওয়ালপোল (Horace Walpole) বলেছেন, 'যাঁরা চিন্তা করেন জীবন তাঁদের কাছে মিলনাত্মক, আর যাঁরা অনুভব করেন, তাঁদের কাছে জীবন বেদনায় ভরা।" জীবনের ট্র্যাজেডির প্রতি মরমী হৃদয়ের প্রতিক্রিয়া তাই অনেক সময় হতাশা ও বিরক্তির মধ্য দিয়ে, কখনো বা বিদ্রোহের রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই মানসিক অবস্থায় যখন পরিতৃপ্ত ঈশ্বরকে ধর্মগ্রন্থে বলতে শুনি, "দেখ সংসারে যা আছে সব বেশ ভাল" আমরা তখন কোনমতেই সন্তুষ্ট হতে পারি না। মানুষের বলতে ইচ্ছে করে জগতে যা চলছে তাহ'ল 'শয়তানের কাজ, একটা পৈশাচিক ব্যাপার'। ঈশ্বরের ভূমিকা এখানে বিন্দুমাত্র নেই। মানুষের জীবন 'মূর্খের বলা ভয়ংকর গালভরা শব্দের একটা অর্থহীন গল্পের মত'। কিন্তু প্রধান অভিযোগ সম্ভবতঃ নৈতিক অমঙ্গল

নিয়ে। নৈতিক অমঙ্গলকে ধর্মে পাপ বলা হয়। যে জগতে মানুষের অসদাচার এত ব্যাপক, যেখানে মানুষের অমানবিকতা শত সহস্র মর্মান্তিক বিলাপের সৃষ্টি করেছে সেই জগৎ কি সর্বমঙ্গলময় ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন? তিনিই কি এই জগতকে এখনো শাসন করে চলেছেন? এইসব দুঃখের মানসিকতা থেকে দুঃখবাদী দর্শন গড়ে উঠেছে। সোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) এবং অনেক প্রাচ্য দার্শনিকের চিন্তায় এই দর্শন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সোপেন-হাওয়ারের মতে জীবনে দুঃখ-কষ্ট আছে এটাই শেষ কথা নয়, জীবন অনিবার্য-ভাবে দুঃখ-কষ্টে পূর্ণ হবে। বাঁচার অর্থই হল কিছু আশা করা। আশা থেকে আসবে আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষা থেকে জন্ম নেবে অভাববোধ এবং অভাব-বোধ থেকে আসবে যত দুঃখ-কষ্ট।

অমঙ্গলের রহস্য অবশ্যই সুগভীর। সম্ভবতঃ এখনো এর কোন তাত্ত্বিক সমাধান সম্ভব হয়ে ওঠে নি। তবুও আমরা বিশ্বাস করি না যে জীবনে অমঙ্গল অপরিহার্য বা এই সমস্যার কখনো সমাধান করা যাবে না। কিন্তু সবিনয়ে আমাদের এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, জ্ঞানের এমন কোন উন্নত স্তরে আমরা এখনো এসে পৌঁছাই নি যাতে করে বুদ্ধি দিয়ে আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারি। স্বজ্ঞার সাহায্যে এই সমাস্যার প্রকৃত' তাৎপর্য কিছুটা বোঝা যেতে পারে। নিরস যুক্তি-তর্কের দ্বারা সমস্যাটির সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত হতে পারি না। কিন্তু তাই বলে আমরা ঘনিষ্ঠ চিন্তাকে বাদ দিতে পারি না। আমরা Von Hugel-এর মত করে রহস্যটি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে পারি। [Von Hugel কেবল মস্তিষ্ক দিয়েই চিন্তা করতেন না। তাঁর চিন্তার সঙ্গে হৃদয়েরও যোগ ঘটত] বিষয়টিকে আমাদের বিনয়, নিষ্ঠা, ধৈর্য ও ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। তা না হ'লে এই সমস্যা সমাধান করতে আমরা খুব বেশি সফল হবো না। কারণ কেবল বুদ্ধি দিয়ে বিভ্রান্তিকর সমস্যাটিকে বুঝে ওঠা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। অমঙ্গ'লের সমস্যা দেখা দেয় কেবল ধর্মীয় জীবনে। অমঙ্গলের সমস্যাটি যদিও ধর্মের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে তবুও পূর্বশর্ত হিসেবে ধর্মকেই সে স্বীকার করে নেয়। যদি কেউ আগে থেকে ঈশ্বরকে সর্বমঙ্গলময় ও সর্বশক্তিমান বলে না স্বীকার করে নেয়, তাহ'লে তার কাছে সংসারের দুঃখ, কষ্ট বা পাপের অস্তিত্ব কোন সমস্যাই সৃষ্টি করতে পারে

না। [অন্যান্য অজস্র বিষয়ের মত দুঃখ-কষ্টও আছে ভাবা যেত, কি করে দুঃখ-কষ্ট কম হয় বা কি করে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তার একটা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টাও চলত। কিন্তু দুঃখ-কষ্টের অস্তিত্বটা এই সংসারে অর্থাৎ পরম মঙ্গলময় যে ঈশ্বর তাঁর রাজত্বে কি করে সম্ভব—ঈশ্বরকে মঙ্গলময় ও শক্তিমান হিসেবে না স্বীকার করলে এধরনের কোন প্রশ্ন উঠতে পারত না] উদাহরণ স্বরূপ জড়বাদীদের কাছে অমঙ্গল কোন সমস্যাই নয়। জগৎ যদি অন্ধ শক্তির এক ক্রীড়াক্ষেত্র হয়, যা ঘটছে সে সম্পর্কে তার যদি কোন সচেতনতা না থাকে তাহ'লে—ধার্মিকেরা কেন কষ্ট পাবেন, বা দুষ্টরা কি করে উন্নতি লাভ করতে পারে—প্রভৃতি প্রশ্ন নিতান্তই অর্থহীন হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন ধরে নেওয়া হয় যে ঈশ্বর মঙ্গলময়, সুবিচারক ও সর্বশক্তিমান, তখনই কেবল ঐ সব প্রশ্ন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। এবং তখনই প্রকৃত অমঙ্গলের সমস্যা দেখা দেয়।

অনেক মতবাদ অমঙ্গলের রহস্য বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছে। অনেক মতবাদ আবার অমঙ্গলের বাস্তব অস্তিত্বকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে। তাঁদের মতে সমুন্নত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে ভৌত অমঙ্গল বা নৈতিক অমঙ্গল কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলে পরিপূর্ণ। আগস্টাইন (Augustine) বলেছেন, যা কিছু আছে সবই শুভ, সবই মঙ্গল। অমঙ্গল বা অশুভ প্রকৃতপক্ষে মায়া। তাদের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। যদি সর্বেশ্বরবাদী অদ্বৈতবাদ যুক্তিযুক্ত হয় তাহ'লে এই মতবাদেও অমঙ্গলের কোন স্থান থাকতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ স্পিনোজা (Spinoza) বিশ্বসংসারকে একমাত্র সত্তা হিসেবে স্বীকার করেছেন। আবার এই সত্তাকে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন বলেও মনে করেছেন (বিশ্বসংসার = সত্তা (দ্রব্য) = ঈশ্বর)। তাহ'লে সব কিছুকেই শুভ হতে হয়। কিন্তু বলা হয়ে থাকে সত্তার সঙ্গে শুভ বা অশুভের কোন সম্পর্ক নেই। শুভ বা অশুভ কেবল ব্যক্তিগত চিন্তা মাত্র। বাস্তবে এর কোন অস্তিত্ব নেই। ঈশ্বর সম্পূর্ণ। তিনি ভাল বা মন্দ কিছুই হতে পারেন না।

হেগেলের (Hegel) মতেও অমঙ্গল অবাস্তব। কোন একটি অংশ থেকে বিশ্লেষণ করলে অমঙ্গলের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অমঙ্গলের অস্তিত্ব অন্তর্হিত হবে। সসীমতার দৃষ্টিকোণ থেকেই অমঙ্গলের ধারণার উৎপত্তি। অজ্ঞতা থেকে যুক্তিসঙ্গত এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত

মূল্য লাভের জন্য যে দ্বান্দ্বিক অগ্রগতি দেখা যায় তার এক একটি উন্নতির চিহ্ন হিসেবে শুভ বা মঙ্গলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে লাইব্‌নিজের (Leibnitz) দৃষ্টিভঙ্গী হেগেল (Hegel) ও স্পিনোজার (Spinoza) থেকে স্বতন্ত্র। লাইবনিজ যদিও অমঙ্গলকে অবাস্তব বলেন নি, কিন্তু তিনিও অবশেষে অভাব বা ত্রুটিকে অমঙ্গলের কারণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি সকল রকম ভৌত অমঙ্গল ও নৈতিক অমঙ্গলের অনুসন্ধান করেছেন এক বিশেষ রকম অমঙ্গলের মধ্যে। তিনি সেই অমঙ্গলের নাম দিয়েছেন অধিবিদ্যাগত অমঙ্গল (Metaphysical evil)। ঈশ্বর পূর্ণ। অন্যান্য সবকিছু অপূর্ণ এবং সসীম। সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অনেক কিছুর মধ্যেই অসামঞ্জস্য দেখা যাবে। কিন্তু বৃহত্তর কোন দৃষ্টিকোণ থেকে সেই অসামঞ্জস্যকে একটি ঐকতানে বাঁধা মনে হতে পারে। তাহ'লে অশুভ বলে যাকে মনে করা হচ্ছে, তা কেবল সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের ফল মাত্র। তাই লাইবনিজের (Leibnitz) কাছে যে জগতে আমরা বসবাস করছি তা 'সম্ভাব্য সকল জগৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' যদিও এর থেকে সুন্দর জগতের কল্পনা করা সম্ভব।

উপরি-উক্ত মতবাদগুলিতে বিভিন্নভাবে অমঙ্গলকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কখনো বলা হয়েছে মঙ্গলের অভাবই হল অমঙ্গল। কখনো বলা হয়েছে আংশিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের ফলে অমঙ্গলের ধারণার উৎপত্তি হয়েছে। অমঙ্গলের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন মতবাদ অমঙ্গলের বাস্তব অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে আলোচনা করছে, ততক্ষণ আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি না। কারণ যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, তাকে যদি বলা হয় দুঃখ-কষ্ট বলে কিছু নেই, ওটা হ'ল মায়া, তোমার একটা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র, অথবা যদি বলি 'তুমি সসীম, তাই তোমার দুঃখ মনে হচ্ছে'--এতে ভুক্তভোগী কি কোন আরাম পাবে? যে ভোগ করে তার কাছে যন্ত্রণা এক ভয়ংকর বাস্তব ঘটনা। কোন উন্নত দার্শনিক জ্ঞান দিয়ে সেই যন্ত্রণার অসারতা প্রমাণ করা যাবে না। চেতনায় যার ভয়ংকর উপস্থিতি সেই বিষয় সম্পর্কে কোন দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। নৈতিক অমঙ্গল বা পাপের ক্ষেত্রে সমস্যাটি আরও জটিল। দুঃখ-কষ্টকে যদিও উন্নততর কোন কিছুর প্রাপ্তির উপায় হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়, নৈতিক অমঙ্গলকে কিন্তু সেভাবে ব্যাখ্যা করার কোন সুযোগ নেই। কারণ নৈতিক অমঙ্গল পরম নীতিকেই অগ্রাহ্য করে। কোন উন্নততর দৃষ্টিকোণ থেকে

নৈতিক অমঙ্গলকে, মঙ্গলে রূপান্তরিত করা বা তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার অবকাশ নেই। আমাদের পাপের যে অভিজ্ঞতা হয় তাকে উন্নততর কোন লক্ষ্যের উপায় হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারি না, বরং পাপের অভিজ্ঞতাকে পাপ বলেই চিনতে পারি। কোন মন্দ কাজ ঐশ্বরিক নির্দেশে মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে, (যেমন যিশুখৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে খৃশ্চানেরা জগতের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন) কিন্তু তাতে দুষ্কৃতকারীর অশুভ ইচ্ছার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। অপরাধবোধ এবং অনুশোচনা বিশেষ এক ধরনের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। এই অভিজ্ঞতা থেকেই প্রমাণিত হয় যে সর্বকিছু এখনও শুভ হয়ে ওঠে নি, হয়ে উঠছে। 'পাপ একান্তই পাপ'। এই আলোচনা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ধর্মের সঙ্গে পাপের বিরোধের কোন তাত্ত্বিক সমাধান বুঝি সম্ভব নয়।

আর এক ধরনের মতবাদ আছে। এই মতবাদ অমঙ্গলেরনীতির স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে সরাসরি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। অমঙ্গলের নীতির সঙ্গে মঙ্গলের নীতি সংযুক্ত। তাদের এই সংযোগ সম্ভবতঃ চিরকালীন। এটি একটি দ্বৈতবাদী প্রকল্প। এই মতবাদে জগতকে দুটি স্বতন্ত্র নীতি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। প্রত্যেকটি নীতিই চূড়ান্ত। কোন একটিকে অপরটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা চলে না। অনেক প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে এই মতবাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। জরথুষ্ট্র (Zarathustra) ধর্মে শুভ ও অশুভের মধ্যে (অথবা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) চরম বিরোধ। আলো ও অন্ধকারের প্রতীকের সাহায্যে এই বিরোধকে প্রকাশ করা হয়েছে। দু'জন স্বতন্ত্র দেবতাও রয়েছেন। মঙ্গলের বা আলোর দেবতা আহুর মাজ্দা (Ahura Mazda) এবং অশুভ বা অন্ধকারের দেবতা আহ্রিমান (Ahriman) একজনকে ধ্বংস না করে অন্যজন সার্বভৌম অধিকার বিস্তার করতে পারে না। প্লেটোর (Plato) মতবাদেও এই দ্বৈতবাদ রয়েছে। তিনি জগতের উপাদান হিসেবে পদার্থকে স্বীকার করেছেন। পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। পদার্থই সকল, অমঙ্গলের মূল। ঈশ্বর এই উপাদানের সাহায্যে জগৎ রচনা করেছেন। ঈশ্বর স্রষ্টা নন। কারিগর মাত্র। মৌল উপাদানের প্রতিরোধে তাঁর ক্ষমতা সীমিত। [পদার্থ অশুভ, ঈশ্বর শুভ]। প্রাচীন খৃষ্ট ধর্মবিশ্বাসেও এই একই জিনিস দেখা যায়।

নস্টিক (Gnostic) এবং উদারপন্থী নস্টিকে যিশুর মধ্যে যে ঈশ্বরের প্রকাশ হয়েছে তার সঙ্গে জগৎ স্রষ্টা ডেমিয়ার্জের (Demiurge) পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। Demiurge অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট এবং ঈশ্বরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এই ধরণার একটি মার্জিত রূপ আমরা দেখি খৃষ্ট ধর্মতত্ত্বে। সমস্ত পাপ ও মিথ্যার জনক হল এক ব্যক্তি। তার নাম শয়তান। এই সকল মতবাদ মূলতঃ ঈশ্বরকে অমঙ্গলের দায়িত্ব থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা মাত্র। কিন্তু এইভাবে যদি ঈশ্বর সর্বমঙ্গলময় হয়ে থাকেন অর্থাৎ অমঙ্গলের দায়িত্ব থাকে অন্য কোন ব্যক্তির উপর, তাহ'লে কিন্তু ঈশ্বর আর সর্বব্যাপক বা সর্বশক্তিমান হিসেবে গন্য হতে পারবেন না। ঐ গুণদুটিকে তাঁর বিসর্জন দিতে হবে। ঈশ্বর তখন সসীম ঈশ্বর হয়ে উঠবেন। [ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নন—কারণ অশুভকে ধ্বংস করার ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি অসীম নন—কারণ অমঙ্গলে তাঁর উপস্থিতি নেই। অতএব তিনি কেবল মঙ্গলের মধ্যে সীমাবদ্ধ এক সসীম ঈশ্বর মাত্র]। কিন্তু কেবল এই যুক্তিতে দ্বৈতবাদকে খণ্ডন করা যায় না। আধুনিক বহুত্ব-বাদীদের সসীম ঈশ্বরের ধারণা এখন বেশ খ্যাতিলাভ করেছে। আমরা শেষ অধ্যায়ে সে বিষয়ে আলোচনা করবো। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণার বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি। এমনও হতে পারে যাতে কোন কোন শর্তের অধীন হয়ে চূড়ান্ত অসীমতার ধারণা সসীম হয়ে যেতেও পারে। কিন্তু সেই শর্তগুলিকে স্ব-আরোপিত হতে হবে। কোন স্বতন্ত্র সত্তা বা শত্রুভাবাপন্ন কোন ক্ষমতা যদি শর্ত আরোপ করে তাহ'লে কিন্তু চলবে না। ঈশ্বর কেবলমাত্র আত্ম নিয়ন্ত্রিত হতে পারেন। অবশ্য এই নিয়ন্ত্রণ প্রকৃত কোন নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দুটি শক্তিই সার্বভৌম—এমন একটা চিন্তা করা অসম্ভব। একটি শক্তি অন্য শক্তিটির উপর যতক্ষণ না প্রভাব বিস্তার করতে পারছে অথবা যতক্ষণ না তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারছে ততক্ষণ প্রকৃত অর্থে কোন শক্তিকে সার্বভৌম বলা যায় কি? মঙ্গলের ক্ষমতা এবং অমঙ্গলের ক্ষমতার মধ্যে সহ-অবস্থান এবং তাদের দ্বৈত শাসন জগতের জটিলতাই কেবল বৃদ্ধি করে। এই সহজ শ্রম-বিভাগের দ্বারা অমঙ্গলের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

আমরা এখন সংক্ষেপে এমন একটি মতবাদ বর্ণনা করবো যার গুরুত্বের প্রমাণ সেই মতবাদের মধ্যেই রয়েছে। আমরা কেবল সাধারণ কয়েকটি প্রণালীর

উল্লেখ করবো মাত্র। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে এই সাধারণ প্রণালীগুলিকে বিশেষ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা খুবই কষ্টকর। আমরা যে পদ্ধতি অনুসরণ করবো তাকে বহু ব্যবহৃত মনে হতে পারে। আমরা এইমাত্র বলতে পারি, যেহেতু এই পদ্ধতিগুলি বহু ব্যবহৃত, বাস্তব অভিজ্ঞতায় তার সত্যতার নিদর্শন পাওয়া যাবে বেশি।

দুঃখ-যন্ত্রণা সম্পর্কে বলা যায় যে তাদেব প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়, দুঃখ-কষ্টের একটা নিয়ন্ত্রণমূলক এবং শিক্ষাগত মূল্য আছে। এই মতবাদের সমর্থনে আমরা অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করতে পারি। তাতে দেখা যাবে মঙ্গলকে পাওয়ার জন্য দুঃখ-কষ্ট ও কৃচ্ছ্রতা সাধনের প্রয়োজন আছে। এর থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, যেসব বিষয়ের অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়, সেখানেও এই নীতি প্রযোজ্য। দুঃখবাদীদের প্রধান ত্রুটি হল তাঁরা সুখবাদী আদর্শের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত। তাঁরা অনুমান করেছেন ত্রুটিহীন জগৎ বলতে একটা নিখাদ সুখের জগৎ। এমন কি এই আদর্শে বিচার করলেও সম্ভবত স্বীকার করতে হবে দুঃখের পাদপ্রদীপেই মানুষের গভীরতম সুখের উপলব্ধি হয়।* যে স্বর্গোদ্যানে কেবল গোলাপ, কাঁটা নেই; কেবল সুখ, দুঃখের স্পর্শ নেই; সেই স্বর্গোদ্যান মানুষের কাছে একঘেয়ে মনে হতে পারে। ঐ নিরবচ্ছিন্ন সুখ থেকে মানুষ বেশি দিন সুখ ভোগ করতে পারবে না। সৃজনশীল উদ্দেশ্যের লক্ষ্যও উপভোগ নয়। অথবা ঈশ্বরকেও (যদি ঈশ্বর বলে কিছু থাকেন) কেবল সান্তা ক্লজ (santa claus) হিসেবে চিন্তা করা যায় না। তাঁর সৃষ্টিকে সুখে রাখাই ঈশ্বরের একমাত্র কাজ নয়। সুখ জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য আদর্শ সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবল সুখকেই একমাত্র আদর্শ বলা সমীচীন হবে না। এখন প্রশ্ন হল, আমাদের চরিত্র-বিকাশের জন্য এই জগৎ আমাদের কতটা সহায়তা করতে পারে? জগৎ কি চরিত্র বিকাশের আদর্শ ক্ষেত্র? অতিশয় আদর-যত্নে প্রশ্রয় পাওয়া জীবনের চূড়ান্ত বিকাশ সম্ভব নয়। যে জীবন অভাব-অভিযোগের জন্য সারাক্ষণ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে, এবং অবশেষে জয়ী হয়, সেই অগ্নিশুদ্ধ জীবনেরই চরম বিকাশ সম্ভব।

* Cf. Shelley in his Ode 'To a Skylark'

"আমাদের সনিষ্ট আনন্দের মধ্যে থাকে বেদনার কাঁটা, আমাদের পরম সুখের সঙ্গীত প্রকাশ করে চরম দুঃখের কাহিনী।"

হায় অসীম স্রষ্টা
তুমি কি কোন কিছুকে সুন্দর করার আগে
অবশ্যই পুড়িয়ে নেবে ?

ফ্রানসিস টমসনের (Francies Thompson) এই প্রশ্নের জবাব অবশ্যই সদর্থক। যে জগতে দুঃখ নেই, সেখানে দুঃখকে অতিক্রম করার চেষ্টাও নেই। সে জগতে ধৈর্য, সহানুভূতি, সাহস, বুদ্ধি, আশা, প্রজ্ঞা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মূল্যের সমগ্র তালিকাটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। কীট্‌স (Keats)-এর বিখ্যাত উক্তি হল, জগতকে অবশ্যই আত্মার বিকাশের ক্ষেত্র হয়ে উঠতে হবে। তিনি বলেছেন, 'দেখছ না, জ্ঞানলাভের জন্য এবং আত্মার উন্নতি সাধনের জন্য জগতে দুঃখ-যন্ত্রণার কত প্রয়োজন'? যেমন হাওয়ার বাধা ছাড়া পাখী উড়তে পারে না, মাটির ঘর্ষণ ছাড়া গাড়ির চাকা ঘুরতে পারে না, তেমনি যন্ত্রণা, পরাজয় ছাড়া চরিত্র গঠনও সম্ভব হয়ে ওঠে না। এগুলি চরিত্রের প্রয়োজনীয় উপাদান। যদি কেউ বলেন, তাহ'লে একজনের পাপে অন্যজন কেন সাজা পান? জবাবে আমরা বলবো, নৈতিক উন্নতির জন্য সম্ভবতঃ এরও প্রয়োজনীয়তা আছে। এর ফলে সমগ্র সমাজিক জীবন এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হতে পারে। প্রত্যেক জীবনের সঙ্গে প্রত্যেকটি জীবন যে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত এবং সমস্ত জীবনই যে মূলতঃ এক জীবন, এই উপলব্ধি এর ফলে সহজ হয়। খৃষ্টধর্মের সুসমাচারে ক্রুশ চিহ্নকে দুঃখ-কষ্টের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রতিপন্ন করা হচ্ছে যে ঈশ্বর জাগতিক দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে উদাসীন নন। তিনি একা নির্জনতায় থেকে মহাসুখে কালাতিপাত করছেন না। তিনি নিজেও একজন ভুক্তভোগী। জগতের দুঃখ-যন্ত্রণার অংশ গ্রহণ করে তিনিই প্রথম জগতে আত্মোৎসর্গের সুমহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, দুঃখ কেবল দুঃখ নয় দুঃখের মধ্যে আনন্দ রয়েছে। আত্মত্যাগ কেবল বেদনার নয় তার মধ্যে প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে। ত্যাগে বেদনার ভূমিকা নগন্য, প্রেমই সত্য।

নৈতিক অমঙ্গলের সমস্যাটি অধিকতর জটিল। কারণ জীবনকে সুশৃংখল করার জন্য নৈতিক অমঙ্গলের প্রয়োজন আছে (দুঃখ-কষ্টের যেমন ছিল) একথা প্রমাণ করা খুব সহজ নয়। অবশ্য দুঃখ-কষ্ট থেকে মানুষ যেমন শিক্ষালাভ করে, তেমনি নৈতিক ব্যর্থতা থেকেও সে শিক্ষালাভ করে। কিন্তু তার জন্য

নৈতিক অমঙ্গলকে মঙ্গল হিসেবে গ্রহণ করার পেছনে কোন যুক্তি নেই। পাপ এবং মঙ্গলের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। যার জন্য একটিকে অন্যটির সঙ্গে নিঃশেষে মিশিয়ে ফেলা যায় না। এ বিষয়ে একটিমাত্র ব্যাখ্যার সম্ভাবনা আছে—তাহ'ল, নৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে পাপের একটা যৌক্তিক সম্পর্ক স্থাপন করা 'অমঙ্গলের অস্তিত্ব ব্যতীত কোন প্রকৃত মূল্যের ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। মানুষের মন্দ হওয়ার যদি কোন সম্ভাবনা না থাকত, তাহ'লে সে ভালও হতে পারত না। নৈতিকতাব একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য এই যে—নৈতিক জীবনে বিকল্পের স্থান আছে; বেছে নেবার সুযোগ আছে। জীবন থেকে এই বিকল্পকে মুছে দিলে জীবন একটা যন্ত্রে পরিণত হয়। আমাদের অভিজ্ঞতার জগতকে এমনি একটা যান্ত্রিক জগতে পরিণত করতে অনেকে হয়ত চাইবেন না। যেমন হাক্সলে (Huxley) বলেছেন, 'যদি কোন অপার্থিব সত্তা একটা ঘড়ির মত আমাকে সব সময়ে বলে দিত কোন্‌টা ভাল, এবং যেটা সত্য সেটা করতে আমাকে বাধ্য করত, তার বিরুদ্ধে আমার ভীষণ অভিযোগ থাকত। আমি সঙ্গে সঙ্গে এই দরকষাকষি বন্ধ করে দিতাম। যে স্বাধীনতা আমি চাই তা হ'ল সঠিক কাজ করার স্বাধীনতা। মন্দ কাজ করার স্বাধীনতা আমি বিনা মূল্যে যে নিতে চায় তাকে বিলিয়ে দিতে রাজি আছি'। কিন্তু জেমস ওয়ার্ড (James Ward) বলেছেন, 'স্বাধীনতা ঘড়ির যন্ত্রের মত। স্বাধীনতা হল কার্যসূচী অনুযায়ী কাজ করে আত্মজ্ঞান ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সাহায্যে উন্নতি লাভ করা। কিন্তু তবুও যান্ত্রিক ক্রিয়া এবং স্বাধীনতার মধ্যে বিন্দুমাত্র বিরোধ নেই'। পুতুল দিয়ে গড়া একটা নিখুঁত জগৎ, অপার্থিব কোন দর্শকের কাছে মনোরম একটা পুতুল প্রদর্শনী হয়ে উঠতে পারে কিন্তু তাকে কিছুতেই নৈতিক জগৎ বলা যায় না। অথবা সেই জগতের কোন উন্নতিও সম্ভব নয়। অন্য বিকল্পটি হল, এই জগতকে এমন একটা জগৎ হতে হবে যেখানে আমাদের আত্মার বিকাশ সম্ভব হয়। [আমাদের করার কিছু থাকে] জন্মসূত্রে আমরা যে প্রবৃত্তি, আবেগ, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি পেয়েছি এবং যে পরিবেশ তাদের পরিবর্ধিত করেছে (অশুভের প্রতি আসক্তিই হোক অথবা মঙ্গলের প্রতি অকর্ষণই হোক), সে সবকেই চরিত্রের মৌল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তারাই চরিত্রের কাঁচামাল; নৈতিক দিক থেকে তারা ভালও নয় মন্দও নয়। যখনই আমরা সচেতন ভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে তাদের স্বীকার করে নেবো তখনই সেগুলি

ভাল বা মন্দ হয়ে উঠবে। পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত, জন্মসূত্রে লব্ধ কোন আবেগকেই অনিবার্যভাবে অমঙ্গল বলা যায় না। স্বাধীনতার যথেচ্ছাচার ঘটলেই অমঙ্গলের অবির্ভাব হয়। নৈতিক জীবনের জন্য কোন ব্যক্তি-চরিত্রকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া সঙ্গত নয়। সমাজ জীবনেও এই নৈতিক দায়িত্ব সমান-ভাবে বর্তায়। ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া আমাদের ঠিক হবে না। এক অর্থে স্বাধীনতা, পাপ, পরিত্রান (মুক্তি), মূল্য প্রভৃতি যেমন ব্যক্তিগত তেমনি সমাজিক। সম্পূর্ণ নৈতিক জগৎ নির্মাণের জন্য সংযুক্ত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যাটি এখনো থেকে গেল। ব্যক্তিগত হোক, অথবা সামাজিক হোক, কিংবা উভয়ই হোক, মানুষের পছন্দ, প্রচেষ্টা বা নৈতিক নিয়ম দ্বন্দ্ব-সাপেক্ষ।

এই দ্বন্দ্ব কোন কৃত্রিম যুদ্ধ নয়। এটিকে বলা যেতে পারে নৈতিক সংগ্রাম। উইলিয়ম জেম্‌সের (William James) Is Life worth Living ? প্রবন্ধে যা বলা হয়েছে "তাঁর সবকিছুর সঙ্গে আমরা একমত না হলেও তাঁর সুন্দর কথাগুলির সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগ থেকে গেছে। জীবনে যদি প্রকৃত কোন সংগ্রাম না থাকত, তাহ'লে সেই সংগ্রামে সাফল্য লাভ করাটা অনেকটা থিয়েটারের মত হত। যখন খুশি আমরা সেই সংগ্রাম থেকে সরে আসতে পারতাম। কিন্তু সংগ্রামটি প্রকৃত সংগ্রাম বলে আমরা তা করতে পারি নি। বিশ্বপ্রকৃতিতে যথার্থ মন্দ এমন কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের আদর্শের দ্বন্দ্ব হয়। যার থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করি। উদ্ধার পাওয়ার আমাদের প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ আমাদের নিজেদের হৃদয়কে অবিশ্বাস ও ভয়মুক্ত করতে হবে। কিন্তু জীবনকে ভয় পেলে চলবে না। বিশ্বাস কর, জীবন সত্যি বাঁচার উপযুক্ত। তোমার বিশ্বাসই জীবনকে সুন্দর করে তুলবে।"*

এর অর্থ এই নয় যে ঈশ্বর মানুষকে নৈতিক স্বাধীনতা দিয়েই ক্ষান্ত রয়েছেন। তিনি কেবল অলস পর্যবেক্ষণ মাত্র নন। সকল দায়-দায়িত্ব থেকে তিনি দূরেও সরে থাকেন নি। এই সংগ্রামে তিনিও অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আমাদের সকল ইচ্ছায় তিনি বিরাজমান। আমাদের সঙ্গে তিনিও কাজ করছেন। আমাদের মোক্ষের জন্য তবুও সভয়ে আমাদেরই কাজ করে যেতে হবে। আধ্যাত্মিক জীবনে এ এক চিরন্তন বিরোধ। ঈশ্বর আমাদের সব কিছুতে আছেন, তবুও আমাদের স্বাধীনতা আছে। এই সমস্যার

* W. James. The will to Believe (1899), pp. 61f.

এইভাবে আংশিক সমাধান করা যেতে পারে—ঈশ্বর আমাদের কাজ করতে বাধ্য করছেন না, তিনি কেবল নৈতিক পরামর্শ দিচ্ছেন। তিনি দৈহিক ক্ষমতায় শক্তিশালী নন, তিনি প্রেমময় ; ভালবাসার শক্তিতে সর্বশক্তিমান। মানুষের স্বধীনতার অর্থ ঐশ্বরিক স্বাধীনতা হানি করা নয়, বা মানুষের রাজ্য থেকে ঈশ্বরকে বিতাড়িত করাও নয়, সেটা ঈশ্বরেরই আত্মনিয়ন্ত্রণের ফল। ঈশ্বরই আমাদের মোক্ষ লাভের পথপ্রদর্শক। আধ্যাত্মিক জগতের তিনিই স্রষ্টা। লাইবনিজের (Leibnitz) কথা অনুসারে বলতে পারি—আমরা যে সাধারণতন্ত্রী সমাজে বসবাস করি ঈশ্বর সেখানকার সম্রাট।

IV

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত এমন কতকগুলি মতবাদের আলোচনা করলাম, হয় সেগুলি ধর্মের স্বীকৃত সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন, অথবা ধর্মের বিরোধী। এবার আমাদের ধর্মের স্বীকৃত সত্যগুলির স্বপক্ষে অধিকতর সদর্থক কিছু যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করতে হবে। অন্যান্য মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ইতিমধ্যে কিছু কিছু সদর্থক যুক্তির অবতারণা করেছি। এই প্রসঙ্গে বিষয়টিকে যতটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল, বইটির আকৃতির কথা স্মরণ রেখে আমরা সেই প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হচ্ছি। ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিখ্যাত দার্শনিক প্রমাণগুলি আমরা আলোচনা করছি না। অর্থাৎ এখানে আমরা তত্ত্ববিদ্যাগত, উদ্দেশ্য-বাদী কিংবা বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তিগুলির আলোচনা অথবা ঐ যুক্তিগুলির বিপক্ষে কান্টের (Kant) বিখ্যাত সমালোচনার প্রসঙ্গও উত্থাপন করবো না। এমন কি বাধ্য হয়ে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে 'উদ্দেশ্যে'র প্রসঙ্গ, তাকেও এড়িয়ে যেতে হচ্ছে। এসবের একমাত্র কারণ জায়গার অভাব। আমরা 'মূল্যে'র সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যেই বর্তমান আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখবো।

আমরা প্রায়ই দেখেছি ধর্মীয় জগতে সত্যের প্রশ্নটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চরম মূল্যের বাস্তবতার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। নীতিবিজ্ঞানের (মঙ্গল) কলার (সৌন্দর্য) এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের (সত্য) আদর্শগত মূল্য সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য তা'হলে কি ? তারা কি কেবল মানুষের ধারণা এবং ব্যক্তিগত কাহিনীমাত্র ? অথবা কোন না কোন ভাবে তারা পরম সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত এবং তারা জগতের মৌল উপাদান ? আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে মানুষের অভিজ্ঞতায় পাপ, কদর্যতা এবং ভ্রান্তি, (যাদের আমরা বিরোধী মূল্যরূপে

চিহ্নিত করেছি) প্রভৃতির বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে। তারা বস্তুকে যেভাবে প্রকাশ করতে চায় তার সঙ্গে মূল্যের বিরোধ রয়েছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অন্তরালে যে পরম সত্তা আছে তার জ্ঞানলাভের সূত্রটি সত্য শিব ও সুন্দর থেকেই পাওয়া যাবে। মিথ্যা, কদর্যতা ও অমঙ্গল থেকে পাওয়া যাবে না এমন কি নিশ্চয়তা আছে? এর জবাবে আমরা বলতে পারি, যখন আমরা মঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করি, সেই পৃথকীকরণই প্রমাণ করে দেয় যে আমাদের নৈতিক বিচারের একটি মানদণ্ড রয়েছে; যার সাহায্যে আমরা মঙ্গলকে ভাল বলছি এবং অমঙ্গলকে মন্দ বলছি। একই মানদণ্ডের সাহায্যে আমরা সত্য থেকে মিথ্যাকে এবং সুন্দর থেকে কুৎসিৎকে পৃথক করতে পারছি। এক কথায় বলা যেতে পারে বিচারের ঐ মানদণ্ডটির সাহায্যে আমরা মূল্যদের স্বীকার করছি এবং মূল্য-বিরোধী ধারণাদের বর্জন করতে পারছি। সকল ক্ষেত্রেই ঐ মানদণ্ডটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মাত্র নয় অথবা কোন ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বিষয়ও নয়।

সম্ভবতঃ সত্যের ক্ষেত্রেই মূল্যের বাস্তব অস্তিত্ব অনেক স্পষ্ট। সত্য সভাবতঃই বাস্তব, একথা সাধারণতঃ স্বীকার করে নেওয়া হয়। (সংশয়বাদী এবং চরম প্রয়োগবাদীরা ব্যতিক্রম মাত্র)। জ্ঞানলাভের জন্য মানুষ তার ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে সর্বজন স্বীকৃত সত্য লাভ করতে চায়। অন্য সকলের জ্ঞানের সঙ্গে তার জ্ঞানকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলতে চায়। সর্বজনীন মানের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে বিচার করে আমরা তাকে সত্য বা মিথ্যা বলতে পারি। অথবা বলা যেতে পারে, সামগ্রিক অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আংশিক অভিজ্ঞতার সত্য-মিথ্যা বিচার করা হয়ে থাকে। কিন্তু সত্যের মত এত সহজে 'মঙ্গল'কে সর্বজনীন রূপ দান করা যাবে না। মঙ্গলকে কেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলা যাবে না, তা প্রমাণ করা খুব সহজ নাও হতে পারে। এরকম মনে করা স্বাভাবিক যে মঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যে যে পার্থক্য তা কেবল মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কারণ মানুষের চরিত্র এবং আচরণ আলোচনা প্রসঙ্গেই কেবল মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রশ্ন ওঠে। বিশ্বের অন্য কোন আলোচনা প্রসঙ্গে এমন কি বিশ্বসত্তার আলোচনার ক্ষেত্রেই মঙ্গল-অমঙ্গলের বিষয়টি তত প্রাসঙ্গিক নয়। তাছাড়া অনেক নীতিবিজ্ঞানী মানুষের সুখ-দুঃখ অর্থাৎ ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে

ভালমন্দের ধারণাকে মিশিয়ে ফেলেছেন। সুখের অনুভূতিকে শুভ এবং কষ্টের অনুভূতিকে অশুভ বলে মনে করেছেন। কিন্তু মানুষের সুখ-দুঃখের অনুভূতির সঙ্গে নৈতিক চেতনাকে এইভাবে মিশিয়ে ফেলা যায় না। নৈতিক আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তিগত অনুভূতির পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। কাজটির সুখকর বা কষ্টকর হওয়ার সঙ্গে যথার্থতার প্রশ্নটি যুক্ত নয়। কষ্টকর বা দুঃখের অভিজ্ঞতা হলেই যে আচরণটি অশুভ হবে এমন কোন কথা নেই। অথবা যাই আমরা ইচ্ছা করি তাই শুভ, এরকম বলাও সঙ্গত হবে না। কারণ আমাদের নৈতিক চেতনা জানে কোন্ অবস্থায় কোন্ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা উচিত, আর কোন্ আকাঙ্ক্ষাকে দমন করা উচিত। নৈতিক আদর্শ কিছু কামনাকে সমর্থন করে আবার কিছু কামনাকে সে সমর্থন করে না। তীব্রতম আকাঙ্ক্ষাটির যে সব সময় প্রকাশ ঘটবে এমন কোন কথা নেই। তীব্রতা ছাড়া আকাঙ্ক্ষার আরও কিছু একটা মানদণ্ড আছে যার সাহায্যে আকাঙ্ক্ষার নৈতিক বিচার সম্ভব হয়। বিশপ বার্টলার (Bishop Butler) যথার্থ বলেছেন যে যদি নৈতিক নিয়মের শক্তি নাও থাকে তার অধিকার থাকবেই। প্রকৃত ক্ষমতা না থাকলেও সে তার প্রভুত্ব জাহির করতে ছাড়বে না। নৈতিক নিয়মের আইনানুগ কর্তৃত্বকে কোন বিশেষ অবস্থায় তার ক্ষমতা দিয়ে পরিমাপ করা যাবে না। [চোর চুরি করে। এর অর্থ এই নয় যে চোরের উপর নৈতিক নিয়মের প্রভুত্ব নেই। চোরকে চুরি থেকে নিবৃত্ত করার ক্ষমতা তার না থাকতে পারে। কিন্তু চোর নিজেই জানে যে চুরি করা খারাপ]। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে নৈতিক নিয়ম সর্বজনীন। অথবা কান্টের (Kant) ভাষায় নৈতিক নিয়ম একটি শর্ত নিরপেক্ষ আদেশ। এই আদেশের কর্তৃত্ব কোন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নীতিপরায়ণ মানুষ স্বেচ্ছায় এই আদেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে চান। অতএব মঙ্গলের ধারণার একটি সর্বজনীন এবং বাস্তব মানদণ্ড আছে। এই প্রসঙ্গে কান্টের (Kant) শুভ ইচ্ছার মতবাদ যতই সমালোচনার সম্মুখীন হোক না কেন, আমরা মতবাদটিকে সবচেয়ে সার্থক বলে মনে করি। যা শুভ তা শর্তহীনভাবে শুভ। কোন কিছুর জন্য শুভ নয়। শুভ বলেই শুভ। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ শুভ। নিজের আলোকে উজ্জ্বল রত্নের মত সে। অন্য কারো আলো তার প্রয়োজন নেই। নিজের দ্যুতিতেই ভাস্বর। বিশ্বসংসারই হল চরম পাওয়ার দেশ। প্রত্যেক নীতিবান মানুষের লক্ষ্য হল সমাজের মধ্যে পরম মঙ্গলকে উপলব্ধি

করা। বিশ্বসংসার নিজেই মানুষকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা দিচ্ছে। নৈতিক মঙ্গলকে পরম মূল্য হিসেবে এবং চরম লক্ষ্য হিসেবে মানুষ যাতে গ্রহণ করতে পারে বিশ্বপ্রকৃতি মানুষকে সেই শিক্ষাই দিচ্ছে। তার অর্থ বিশ্ব-প্রকৃতি নিজেই একটি আধ্যাত্মিক পদ্ধতি। মানুষকে শিক্ষাদানের জন্য সে এই পদ্ধতিই অনুসরণ করছে।

সবশেষে সৌন্দর্যের প্রসঙ্গ। যে তিনটি মূল্যের আমরা আলোচনা করেছি তাদের মধ্যে সৌন্দর্যকেই সবচেয়ে ব্যক্তিগত বলে মনে হতে পারে। কোনটি সুন্দর আর কোনটি কুৎসিৎ ব্যক্তি নিজেই যেন এর শেষ বিচারক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সৌন্দর্যের ধারণা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অনুভূতি বা ব্যক্তিগত অভিরুচির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সৌন্দর্যের ধারণাও সত্য এবং মঙ্গলের মত বাস্তব। আমাদের কাছে সে কেবল তার সমর্থন চায়। বৈজ্ঞানিক এবং নৈতিক বিচারের মত সৌন্দর্য-বিচারেরও বাস্তব সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাস থেকে আমাদের উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করা যায়। প্রকৃত চারুকলা অপেক্ষা চরিত্র বিকৃতি সাময়িক সাফল্য লাভ করতে পারে। মার্টিন টাপার (Martin Tupper) একদা খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু সেইজন্য তাঁকে নিশ্চয়ই কেউ মিল্‌টন (Milton) বা গ্যেটের (Goethe) থেকে মহান স্রষ্টা বলবেন না। শিল্পসম্মত সৌন্দর্য কোন একজন ব্যক্তির যথেচ্ছাচারী ও খামখেয়ালী সৃষ্টি হতে পারে না। প্রকৃত শিল্প হল অনুভূতির সাহায্যে পরম সত্তার বিশ্লেষণ। অতএব আমরা তিনটি মূল্যকেই বাস্তব মানদণ্ড বলতে পারি। কারণ আমাদের মন পরিশেষে তাদের বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে সত্য, শিব ও সুন্দর সম্পর্কে কোন এক সময়ে আমরা যে ধারণা করে নিয়েছি তাই চিরকালের জন্য সত্য এবং অভ্রান্ত, কিংবা তার পরিবর্ধনেরও কোন প্রয়োজন নেই। বরং বলা যেতে পারে আমাদের সত্য, শিব ও সুন্দরের ধারণা কখনই অনড় নয়। তারা অসীম সত্তার এক একটি দিককে ক্রমাগত আমাদের কাছে প্রকাশ করছে। সুতরাং সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল পরম সত্তারই প্রকাশ।

অভিযোগ করা যেতে পারে মূল্যগুলি যদিও বাস্তব এবং সর্বজনীন তবুও এদের সম্পর্ক যেন কেবল মানুষের সঙ্গেই। তারা কারো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না হ'লেও মানুষের জগতের ঊর্ধ্বে তারা নয়। মানুষের জগতের বাইরে অন্য

কোন কিছুর অস্তিত্বের ইংগীতও তারা বহন করে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, অনেকে নৈতিক ধারণাকে সামাজিক রীতিনীতি থেকে উদ্ভূত বলে মনে করেন। শর্তনিরপেক্ষ আদেশ মূলতঃ সামাজিক নির্দেশ। নৈতিক নিয়মগুলি সামাজিক প্রথাকে দেবত্ব আরোপ করে এবং ব্যক্তিকে সমাজের অনুগত করে তোলে। কিন্তু সামাজিক প্রথার প্রকাশ এবং মূল্যায়নকে এক করে ব্যাখ্যা করার এই চেষ্টা আদৌ সন্তোষজনক নয়। কারণ এর ফলে প্রগতিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। যে নৈতিক বিধি (তথা সামাজিক প্রথা) প্রচলিত আছে তাতে সব সময় সব মানুষ সন্তুষ্ট থাকবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যাঁরা উন্নত ও অভিনব চিন্তার অধিকারী তাদের কাছে প্রচলিত নৈতিক বিধিগুলি যথেষ্ট মনে নাও হতে পারে। সামাজিক প্রথার থেকে উন্নত কোন কিছুর নির্দেশ তারা উপলব্ধি করতে পারেন। বিপরীত পক্ষে অনেকে কোঁতের (Comte) মত সমর্থন করেন। "যদিও কোন বিশেষ ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হিসেবে এদের (মূল্যগুলিকে) আমরা গ্রহণ করি না, তবুও সকল মানুষের অভিজ্ঞতা বা মানবতার ঊর্ধ্বে এদের আমরা স্থান দিই না"। সকলেই জানেন কোঁতে (Comte) মানবতাকে একটি সামগ্রিক সত্তা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এবং তাঁর ঈশ্বরহীন জগতে ঐ মানবতাই ছিল উপাস্য। তিনি মানবীয় আদর্শগুলিকে বৃহত্তর কোন অমানবীয় জগতের সঙ্গে যুক্ত করতে সম্মত হন নি। কারণ তিনিও হাক্স্‌লের (Huxley) মত মনে করতেন, সেই অতীন্দ্রিয় জগৎ যদি মানুষের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নাও হয়, সেই জগৎ যে মানুষের প্রতি চরম উদাসীন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রকৃতি থেকে মানবতাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। আমরা জ্ঞানের সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, মানুষ যে জগতে জন্মগ্রহণ করেছে সেই জগতের সে অংশ। সুতরাং মানুষের মূল্যের জগত, বিশ্বজগতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই জগতে মানুষ এবং ভৌত বিষয়গুলি সমভাবে অন্তর্ভুক্ত। মানুষ এই বিশ্বসংসারে পরদেশী নয়। সেও এই সংসারের নাগরিক। যখন আমরা মানুষের অন্তরের আলোচনা করি, প্রকৃতপক্ষে তখন আমরা বিশ্বসংসারেরই আলোচনা করি; বস্তুতপক্ষে তখন আমরা আমাদের পরিচিত বিশ্বের অন্তরতম মৌলিক দিকটিরই জ্ঞান লাভ করতে চেষ্টা করি। যখন আমরা মানবীয় মূল্য-বোধের কথা চিন্তা করি, তখন এই জগতের বাইরে অপার্থিব কোন কিছুর আমরা অন্বেষণ করি না, এই জগতের সুবিধাজনক অবস্থায় থেকে এ জগতের

সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সবচেয়ে উন্নত বিষয়গুলির অন্বেষণ করি মাত্র। বিজ্ঞান কার্যকারণ-শাসিত জগতের আলোচনা করে, আর আদর্শের জগতের আলোচনা করে নীতিবিজ্ঞান, নন্দনতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব। এই স্বতন্ত্র দুটি জগতের মিলনক্ষেত্র থাকা প্রয়োজন। ঈশ্বর ব্যতীত আমরা সেই মিলনক্ষেত্রের সন্ধান কোথায় পাবো ?

দেখা যাচ্ছে একদিকে যেমন মূল্যের বাস্তব যথার্থতা রয়েছে, অন্যদিকে কার্যকারণ শাসিত জগতও সত্য। আবার ধর্মবিশ্বাস এই জগতের চরম ঐক্য এবং পরিণতির বিষয়ে আস্থাশীল। এসব থেকেই আমাদের ঈশ্বরবিশ্বাস উদ্ভূত। আমাদের যুক্তি দ্বিবিধ। ঈশ্বরই সর্বোচ্চ মূল্যগুলির আশ্রয়। তিনিই এদের প্রয়োজনীয় ভিত্তি। সত্য শিব ও সুন্দর একই বিন্দু অভিমুখী তিনটি গতি। তারা মিলেছে এমন এক সত্তায় যিনি তাদের উৎস। এই তিনটি সর্বোচ্চ গুণই ঈশ্বরের বিভিন্ন দিককে প্রকাশ করেছে। পরিশেষে এই তিনটি গুণই এক। কারণ তারা একই ঈশ্বরের গুণ। একই ঈশ্বরের স্বরূপকে তারা প্রকাশ করছে। বিপরীত পক্ষে ঈশ্বর প্রয়োজনীয়। কারণ বাস্তব এবং আদর্শ জগতের তিনিই উৎস। এই বাস্তব জগতে থেকে আমরা আদর্শকে উপলব্ধি করতে পারি এইজন্যে যে উভয় জগতের উৎস এক। প্রশ্ন উঠতে পারে, ভ্রান্তি, পাপ ও কদর্যতার কারণও ত আমাদের এই জগতেই খুঁজতে হবে। কারণ এই জাগতিক ঘটনা থেকেই আমাদের ঐ সব অভিজ্ঞতা হয়। [তা হ'লে ঈশ্বর পাপ, কদর্যতা প্রভৃতিরও উৎস হয়ে যাবেন। সেটা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়]। আমাদের তাহ'লে ভিন্ন কোন আদর্শ খুঁজতে হবে যাতে ঐ সব অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করা যেতে পারে। ভ্রান্তি, পাপ ও কদর্যতার কারণ খোঁজা যতই কঠিন হোক না কেন (অবশ্য খুবই কঠিন কাজ) একটা জিনিস স্পষ্ট যে সত্য শিব ও সুন্দরের সঙ্গে তাদের আমরা কখনো সমগোত্রীয় ভাবি না। তাদের দেখলেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ আমরা তাদের নিন্দা করি, বিপরীত পক্ষে সত্য শিব ও সুন্দরের করি প্রশংসা। কারণ সত্য শিব ও সুন্দরের অস্তিত্বের সঙ্গে তাদের সত্যতা এবং বাস্তবতার চিহ্ন বর্তমান থাকে। এইভাবে বাস্তব জগতে এই মূল্যগুলিকে পৃথক করে তাদের শর্তনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র মর্যাদা দানের কারণ আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে। সেটি প্রমাণ করা তখনই সহজ হবে যখন আমরা এইসব মূল্যের আধার হিসেবে ঈশ্বরকে গ্রহণ করবো। তিনি একাধারে সত্য, শিব ও সুন্দর।

অভিযোগ উঠতে পারে আমাদের সমস্ত যুক্তি দিয়ে আমরা যেন ঈশ্বরকে মানুষ করে তুলেছি। অন্ততঃ কিছু মানবীয় গুণ ঈশ্বরের উপর আরোপ করেছি। বিশ্বের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমাদের আলোচনাটিকে সাম্প্রদায়িক দোষদুষ্ট বলে মনে হবে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি স্থূল-ভাবে ঈশ্বরের প্রতি যেমন যথেচ্ছ নরত্ব আরোপ করা যায় না, তেমনি তাঁর উপর যথার্থ নরত্ব আরোপ করারও অবকাশ আছে। বস্তুতপক্ষে ঈশ্বর যদি মনুষ্য গুণসম্পন্ন না হন তা হ'লে তাঁকে চিন্তা করা আমাদের পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের কাছে তাঁকে মানুষের অভিজ্ঞতায় ধরা দিতে হবে। মানুষের অভিজ্ঞতার তুচ্ছ দিকগুলি বাদ দিলেও সমৃদ্ধশালী ও নিরপেক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে মানুষ পরম সত্তার স্বরূপের জ্ঞান লাভের সূত্রটি খুঁজে পেতে পারে। বিশ্বজগতের মৌলিক যা কিছু তার সঙ্গে মানুষ অভিন্ন, এই বিশ্বাসই সম্ভবতঃ ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত নরত্ব আরোপ। ঈশ্বরকে যেমন মানুষ করে তোলা যায় তেমনি আবার মানুষকেও দেবতা করে তোলা যেতে পারে। বাইবেলে বলা আছে—'ঈশ্বর তাঁরই মত করে মানুষ সৃজন করেছেন'। ভিন্ন ভাষায় বলা যায়, আমাদের মূল্য বিচার প্রকৃতপক্ষে আমাদের মধ্যে পরম সত্তার আংশিক স্বপ্রকাশ মাত্র। অথবা কবিতার ভাষায়, [যদি আমরা শেলীর (Shelley) সুন্দর কথাগুলি ব্যবহার করি, অবশ্য তাতে সর্বেশ্বরবাদের প্রচ্ছন্ন ছায়া থেকে যায়] মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যের কারণ—

> "স্রষ্টা তাঁর সস্নেহ প্রচেষ্টায়--আমাদের মনের কালিমা দূর করছেন। এই কালিমাই আমাদের ঈশ্বর হয়ে উঠতে দিচ্ছে না। তিনি আমাদের ততটাই দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে নিচ্ছেন যতটা আমরা সহ্য করতে পারবো। তারপর তরুরাজি পশুপক্ষী, মানুষ সবকিছু স্বর্গীয় আলোর দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে রূপে ও শক্তিতে ঝলমল করে উঠবে।"

বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এবং মানুষের শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধগুলির প্রতি মমতাময়ী—এই বিশ্বাসই হল ধর্মবিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে প্রকৃতি নিরপেক্ষ কোন বিশ্লেষণে প্রমাণ করা কি সম্ভব? ধর্মের স্বীকৃত সত্যগুলির কোন বাস্তব অস্তিত্ব আছে কি? আমরা এখন এমন কতকগুলি দার্শনিক মত আলোচনা করবো যারা ধর্মের স্বীকৃত সত্যগুলির যথার্থতা স্বীকার করে না।

I

প্রকৃতিবাদ ঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মানুষ সব কিছু জানতে সমর্থ। এখানে দু'রকম প্রকৃতিবাদ আলোচনা করা হবে। (1) জড়বাদ (2) অজ্ঞেয়বাদী প্রকৃতিবাদ বা প্রকৃতিবাদ।

জড়বাদ ঃ বিজ্ঞান যে প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে, পরম সত্তার সঙ্গে সেই প্রকৃতি অভিন্ন। আত্মা জড়ের একরকমের প্রকাশ।

সমালোচনা ঃ পদার্থকে চরম সত্য হিসেবে গ্রহণ করে জীবন ও জগতের জটিল বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করা অতি সারল্য দোষদুষ্ট।

অজ্ঞেয় প্রকৃতিবাদ ঃ পদার্থ ও আত্মা দ্রব্য হিসেবে উভয়েই অজ্ঞেয়। আমরা পরম সত্তাকে জানতে পারি না। প্রপঞ্চময় জগতকে জানতে পারি। তাই প্রপঞ্চই বিশ্ব। হাক্স্‌লে এই মতবাদের বড় সমর্থক। ব্যবহারিক প্রয়োজনে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রয়োজন নেই অতএব তাত্ত্বিক আলোচনাতেও আত্মাকে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই—এই যুক্তি সমর্থনীয় নয়। এই মতবাদ অনুসারে জগৎ যান্ত্রিক নিয়মে শাসিত। প্রকৃতিবাদীরা মানুষকেও যন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। চেতনা দেহকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। আত্মা দেহের ছায়ামাত্র।

প্রকৃতিবাদ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মত নিশ্চয়তা লাভের চেষ্টা করে। নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যে পৌছানোর কাছে প্রকৃতিবাদ একটি কার্যকরী প্রকল্প। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দার্শনিক আলোচনায় এই মতবাদের ভূমিকা নগন্য। জীবনের সামগ্রিক বিশ্লেষণের তাৎপর্য এই মতবাদ উপলব্ধি করতে পারে না। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই মতবাদ ব্যর্থ। প্রকৃতিবাদের পদ্ধতি হল উন্নতকে অনুন্নত দিয়ে ব্যাখ্যা করা (লঘুকরণ পদ্ধতি)।

এই মতবাদ অনুসারে মানুষের মনও একটা উপপ্রতিভাস (epipheno-

menon)। মানুষের মন এবং চেতনাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করতে তা যুক্তিযুক্ত হয়ে ওঠে না। মানুষের সকল মূল্যবোধ তুচ্ছ ও অর্থহীন হয়ে যায়। প্রকৃতি মানুষের প্রতি নির্মমভাবে উদাসীন হয়ে পড়ে। যান্ত্রিক নিয়মে পরিচালিত জগৎ মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি কোন রকম আগ্রহ দেখায় না।

কিন্তু সত্য সুন্দর ও মঙ্গল এতই গুরুত্বপূর্ণ যে যন্ত্রের চেয়ে জীবনের সঙ্গেই এদের সার্থক উপমা দেওয়া যেতে পারে। অন্তরের গভীরে এদের মূল রয়েছে।

II

মনোবৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ ঃ ধর্মবিশ্বাস চেতন মনের উপর নির্জ্ঞান মনের প্রভাব থেকে উদ্ভূত। সুতরাং ধর্মবিশ্বাসের যুক্তি-সঙ্গত কোন অস্তিত্ব নেই।

নব্য মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ হয়েছে দু'টি উৎস থেকে। (1) ডারউইনের মতবাদ, (2) অচেতন বা নির্জ্ঞান মনের আধুনিক আবিষ্কার। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, মানুষের জন্তুদের মত সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি জান্তব আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে।

ফ্রয়েড ও য়ুঙ্-এর মতবাদ ঃ নির্জ্ঞান মন, মনের একটা অন্ধকার অঞ্চল। যে সব বাসনা অসমীচীন নোংরা, সেগুলি নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত হয়। পরে স্বপ্নের মধ্যে সেই সব বাসনা আত্মপ্রকাশ করে। ফ্রয়েডের মতে সকল ইচ্ছাই যৌন ইচ্ছা। সকল ধর্মবিশ্বাসের জন্ম হয়েছে যৌনতা থেকে। ধর্ম সামাজিক দিবাস্বপ্ন। শৈশবে সকল শিশু পিতা-মাতার উপর নির্ভরশীল থাকে। নির্জ্ঞান মনে সেই শৈশব স্মৃতি পিতৃরূপ কল্পনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। ঈশ্বরই সেই পিতা। তার প্রতি নির্ভরশীলতা শৈশব ইচ্ছারই প্রকাশ মাত্র।

ধর্ম কি তাহ'লে নিজের নির্জ্ঞান মনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা? মনোবিজ্ঞানিগণ জ্ঞাতা মনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জ্ঞেয় জগতকে অস্বীকার করেছেন। অভিজ্ঞতার যৌক্তিকতায় প্রশ্নটি দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক নয়। অধিকন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের প্রমাণ করে যে ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। জগতের অস্তিত্বও ইচ্ছার পূর্ব-ধরণা। বোসাঙ্কে বলেছেন—ঈশ্বরের প্রতি মানুষের সহজাত আকাঙ্ক্ষাই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ।

III

দুঃখবাদ ঃ জগৎ মূলতঃ মন্দ। 'অমঙ্গলের সমস্যা'—ঈশ্বর যদি মঙ্গলময় ও সর্বশক্তিমান হন তাহলে জগতে অমঙ্গল থাকে কি করে? জগতে অন্ততঃ চার

রকমের অমঙ্গল আছে—যথা দুঃখ, ভ্রান্তি, কদর্যতা ও পাপ। সর্বমঙ্গলময় ঈশ্বর কি এদের সৃষ্টি করেছেন? না করলে—এদের স্রষ্টা কে? তার উপর কি ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ নেই। তাহ'লে তিনি কি রকম সর্বশক্তিমান? অমঙ্গলকে মৌল দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—(1) ভৌত অমঙ্গল (2) নৈতিক অমঙ্গল। ভৌত অমঙ্গল অর্থাৎ দুঃখ, যন্ত্রণা ইত্যাদি। আর নৈতিক অমঙ্গল হল পাপ। মানুষ যখন নিরন্তর অজস্র রকম দুঃখ-যন্ত্রণায় ভুগছে তখন ঈশ্বরকে মঙ্গলময় এবং সব কিছুর স্রষ্টা হিসেবে গ্রহণ করে নিতে সে চায় না। তার মনে হয় জগৎ শয়তানের সৃষ্টি। এই মানসিকতার নাম দুঃখবাদ।

অমঙ্গলের সমস্যা ঃ ধর্মীয় জীবনেই কেবল এই সমস্যা। আমি যদি ঈশ্বরকে স্বীকার করে নি, এবং তাঁকে মঙ্গলময় ও সর্বশক্তিমান হিসেবে গ্রহণ করি তখন দুঃখ, কষ্ট, পাপ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করা সমস্যা হয়ে ওঠে। ঈশ্বরকে না স্বীকার করলে বা তাঁকে অসীম, মঙ্গলময় প্রভৃতি না ভাবলে (যেমন জড়বাদ প্রভৃতি মতবাদ ভাবে না) অমঙ্গলের সমস্যা বলে কোন সমস্যা থাকে না।

অনেক মতবাদ অমঙ্গলের সমস্যাটি সমাধান করেছে এইভাবে—অমঙ্গল বলে কোন কিছু নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মঙ্গলে পরিপূর্ণ। আগস্টাইন, স্পিনোজা, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিক এই মতবাদের সমর্থক। হেগেল বলেছেন—আংশিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে হবে অমঙ্গল, সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে অমঙ্গল বলে কিছু নেই। লাইবনিজও এই মতবাদের সমর্থন করেন।

আর একটি মতবাদে অমঙ্গলের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। জগতে যেমন মঙ্গল আছে তেমনি অমঙ্গলও আছে। দুটি স্বতন্ত্র নীতিতে জগৎ পরিচালিত। এই মতবাদে ঈশ্বর হয়ত পাপের দায়িত্ব এড়াতে পারেন অর্থাৎ তাঁর মঙ্গলময় নাম অকলঙ্কিত থাকে, কিন্তু তিনি সসীম হয়ে পড়েন। দুটি শক্তিই সার্বভৌম—এমন একটা চিন্তা করা অসম্ভব। দ্বৈত শাসনে জগতের জটিলতাই বৃদ্ধি পাবে।

আর একটি মতবাদ হল—দুঃখ-যন্ত্রণার প্রয়োজন আছে। নিরবচ্ছিন্ন সুখকে সুখ বলেই মনে হবে না। অন্ধকার আছে বলে আমরা আলোকে আলো বলে চিনতে পারি, তাকে ভালবাসি। আমাদের চরিত্র বিকাশের জন্য দুঃখের বাধা প্রয়োজন। সংগ্রাম না থাকলে জয়ের প্রশ্নই ওঠে না। দুঃখ কেবল দুঃখ নয়। দুঃখের মধ্যেই রয়েছে আনন্দের সম্ভাবনা।

নৈতিক অমঙ্গল সম্পর্কে বলা যায়, মানুষের মন্দ হওয়ার যদি কোন সম্ভাবনা না থাকত তাহলে সে ভালও হতে পারত না। এর মধ্যে স্বাধীনতার ধারণাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। দু'রকম আছে বলে বেছে নেবার কথা ওঠে। তখনই স্বাধীনতার প্রশ্ন দেখা দেয়। কোন জিনিস ভাল বা মন্দ নয়। আমরা সচেতনভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে তাদের স্বীকার করে নিলেই ভাল ও মন্দের প্রশ্ন জাগে। আমাদের জীবনে একটা দ্বন্দ্ব আছে। ভাল ও মন্দের দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বটি অকৃত্রিম। ঈশ্বরও মানুষের এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। আধ্যাত্মিক জীবনের মজার বিরোধটি হল, ঈশ্বর আমাদের সব কিছুতে আছেন কিন্তু তবু আমাদের স্বাধীনতা আছে।

IV

ধর্মের স্বীকৃত সত্যের স্বপক্ষে যুক্তি :

ধর্মীয় জগতে সত্যের প্রশ্নটি চরম মূল্যের সঙ্গে জড়িত। পরম সত্তাকে পরম মূল্য দিয়ে অর্থাৎ সত্য শিব ও সুন্দর দিয়ে জানা যায়। সত্য সার্বজনীন। তেমনি নৈতিক নিয়মও সার্বজনীন। নৈতিক মঙ্গলকে পরম মূল্য হিসেবে মানুষ গ্রহণ করতে পারে।

সৌন্দর্যের ধারণাকে সবচেয়ে বেশি ব্যক্তিগত বলে মনে হলেও, সত্য এবং মঙ্গলের মত সেও বাস্তব।

যদিও সত্য শিব ও সুন্দরের ধারণা বাস্তব, কিন্তু তাই বলে চিরকালের জন্য অভ্রান্ত নয়। এইসব ধারণার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনও প্রয়োজন। অসীম সত্তার এক একটি দিককে সত্য শিব ও সুন্দর ক্রমাগত আমাদের কাছে প্রকাশ করছে।

অনেকে সামাজিক প্রথাকে নৈতিক বিধি বলে মনে করেন। সামাজিক প্রথাও পরিবর্তন সাপেক্ষ। কোঁতে নৈতিক গুণকে মানবতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু মানুষ বিশ্বসংসার থেকে বিচ্ছিন্ন কোন কিছু নয়। কার্যকারণ শাসিত জগতের আলোচনা করে বিজ্ঞান। আর আদর্শ জগতের আলোচনা করে নীতিবিজ্ঞান, নন্দনতত্ত্ব এবং ধর্মতত্ত্ব। ঈশ্বর এই দুই জগতের মিলনভূমি।

আমাদের যুক্তি দ্বিবিধ। ঈশ্বর সর্বোচ্চ মূল্যগুলির আশ্রয়। বিপরীত পক্ষে ঈশ্বর প্রয়োজনীয়। বাস্তব ও আদর্শ জগতের তিনিই উৎস। তাহ'লে অমঙ্গলের উৎসও কি ঈশ্বর ?

কিন্তু পাপ কদর্যতা প্রভৃতিকে আমরা কখনো সত্য শিব সুন্দরের স্বগোত্রীয় ভাবি না। পাপ প্রভৃতিকে দেখলেই নিন্দা করি। আবার সত্য শিব সুন্দরকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রশংসা করি। কারণ এদের সঙ্গে বাস্তবতার চিহ্ন বর্তমান। ঈশ্বরকে স্বীকার করে নিলে সমস্যাটি অনেক সহজ মনে হবে। ভৌত জগত ও নৈতিক জগতের তিনিই একমাত্র আধার।

পরিশেষে ঈশ্বরকে মানুষ করে তোলা হচ্ছে বলে অনেকে অভিযোগ করতে পারেন। বস্তুতপক্ষে ঈশ্বর যদি মনুষ্য গুণসম্পন্ন নাও হন মানুষের অভিজ্ঞতায় তাঁকে ধরা দিতে হবে। ঈশ্বরের প্রতি যথেচ্ছ নরত্বারোপ নিন্দনীয় সন্দেহ নেই কিন্তু যথার্থ নরত্বারোপের প্রয়োজনীয়তা আছে।

অষ্টম অধ্যায়

ঈশ্বর ও পরমতম সত্তা

শেষ অধ্যায়টিতে এসে সমস্ত জটিল সমস্যাগুলি ভিড় করেছে। অজস্র সমস্যার মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক সমস্যা আমরা এখানে আলোচনা করতে পারবো। কারণ আমাদের হাতে জায়গা কম। আমরা এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছি, যাতে সংক্ষেপে হলেও আমাদের পরম সত্তা সম্পর্কে একটা সুশৃঙ্খল অধিবিদ্যাগত আলোচনা করতে হবে। এই শেষ অধ্যায়ে আমরা আমাদের যুক্তিগুলি সবিনয়ে নিবেদন করছি। মানুষের নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে, ধর্মের স্বীকৃত সত্যগুলির সঙ্গে বাস্তব জগতের সামঞ্জস্য বিধানের স্বপক্ষেই এখন আমাদের যুক্তি খুঁজতে হবে। বিশ্বসংসারের একটি দর্শনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেই দর্শনকে অধিকতর গঠনমূলক ও সুসম্পূর্ণ হতে হবে। এই দর্শনের দ্বারা ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সুবিচার করা সম্ভব হবে। এই অবস্থায় আমরা দেখবো, (যেমন আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি) ধর্মদর্শন, সাধারণ দার্শনিক চিন্তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। যদি আমাদের যোগ্যতা থাকত, তাহলেও একটা ছোট বই-এর একটিমাত্র পরিচ্ছেদে পরম সত্তার বিস্তৃত দার্শনিক আলোচনা সম্ভব হত না। যাই হোক এই ধরনের আলোচনার আওতায় পড়ে, এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের একাত্মতা লক্ষ্য করেছি। আমরা বলেছিলাম ঈশ্বরের কল্পনা অনুসারে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বর মানুষের সর্বোচ্চ মূল্যের আধার। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের এই একাত্মতার সম্পর্ক ধর্মচেতনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের একটিমাত্র দিককে প্রকাশ করে। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যেমন একটা একাত্মতার ধারণা রয়েছে তেমনি রয়েছে বিরাট এক দূরত্বের উপলব্ধি। ঈশ্বরের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যার সঙ্গে যোগাযোগ করা অসম্ভব ব্যাপার। ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে যুক্ত আছে, তাঁর গৌরবান্বিত মহত্ত্ব, অনির্বচনীয় মহিমা, পবিত্রতা এবং তুরীয় অমানবীয় ক্ষমতা। উদ্দেশ্যবাদীরা ঈশ্বরের এইসব গুণকে আধিবিদ্যক (Metaphysical) গুণ বলেন। এই গুণের সঙ্গে তাঁর নৈতিক গুণের পার্থক্য রয়েছে। আমরা প্রথম অধ্যায় থেকে বলে আসছি, ধর্মের সূচনা থেকে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে রহস্যময় ক্ষমতার উপস্থিতির প্রতি বিস্ময়ের তীব্র আবেগ সংযুক্ত রয়েছে। ঈশ্বর কেবল সকল মূল্যের ধারক নন তিনি শক্তিমানও। তাঁর কেবল

কর্তৃত্ব নেই ক্ষমতাও রয়েছে। ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্ককে তাই কেবল পিতাপুত্রের সম্পর্ক হিসেবে গ্রহণ করা হয় না, সৃষ্ট জীবের সঙ্গে স্রষ্টার সম্পর্ক হিসেবে, অথবা সসীম সত্তার সঙ্গে অসীম অকারণ সত্তার একটি বিশেষ সম্পর্ক হিসেবে গণ্য করা হয়।

এখন আমাদের দেখতে হবে ঈশ্বরের সমতা সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায়। তিনি কি যথার্থই সর্বশক্তিমান? তাঁর ক্ষমতা কি এমনি সার্বভৌম এবং সর্বত্র বিস্তৃত যে সেখানে অন্য কোন ক্ষমতার অস্তিত্ব থাকতে পারে না? অথবা তাঁর ক্ষমতা কিছুটা সসীম? যদি সসীম হন, কিসের অস্তিত্বের জন্য তাঁর এই সসীমতা? তাঁর এই সীমাবদ্ধতার কি অন্য কোন কারণ আছে? যদি তিনি সসীম না হন, অর্থাৎ যদি তাঁর ক্ষমতার কোন সীমা না থাকে, তাহলে সেই ক্ষমতাকে কি আদৌ কোন ক্ষমতা বলা যাবে? কারণ যেখানে কোন বাধা নেই ক্ষমতা সেখানে অবান্তর ও অর্থহীন। তাহ'লে ঈশ্বরের একটিমাত্র ধারণা আমাদের কাছে অবশিষ্ট রইল—তিনি এক, অবিভাজ্য, অবিচ্ছেদ্য, সুসম্পূর্ণ পরমতম সত্তা (Absolute)। তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। যা আছে সব তাঁর মধ্যেই লীন হয়ে আছে। এই ধারণার আর একটি বিকল্প আছে। আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় সেই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলাম। সেই সিদ্ধান্ত হল—প্রকৃত মূল্যগুলির মধ্য দিয়ে ঐশ্বরিক সত্তা প্রকাশিত হয়। তাহ'লে অবশিষ্ট জগতকে আমরা কি বলব? ঈশ্বর কি তাহ'লে তাঁর আদর্শ জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ? আদর্শ জগতের বাইরে রয়েছে বাস্তব বিশাল জগৎ। অনন্ত দেশ এবং নৈতিক বিচারের অযোগ্য এক ভৌত শক্তি সেই বিশাল দেশে সতত ক্রিয়াশীল। সেই জগৎ কি ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে? অথবা মানুষের চিন্তায় যা মূল্য, কিংবা মূল্যহীন অথবা মূল্যবিরোধী, সব কিছুই কি তাঁর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত? প্রথমটি স্বীকার করে নিলে বলতে হয়, ঈশ্বর এখনো আদর্শ জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাস্তব জগৎ সেই আদর্শ জগতের পরিবেশ। ঈশ্বর বাস্তব জগতের মধ্যে তাঁর উদ্দেশ্যকে পরিব্যাপ্ত করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছেন। বিপরীত পক্ষে স্বীকার করতে হয়, তিনি এক সমগ্র সত্তা। তাঁর মধ্যে সবকিছু অন্তর্ভুক্ত। তিনি সর্বব্যাপক। তাঁর কোন বাহ্য পরিবেশ নেই। এখন প্রশ্ন জাগে—ঈশ্বরের এই বিশ্বনিয়মে মানুষের ভূমিকা কি? মানুষের কি নিজস্ব কোন অস্তিত্ব আছে, না সে পরম সত্তার প্রকাশ বা ক্রিয়া মাত্র? এই প্রশ্নগুলি থেকে একটি

প্রধান সমস্যার উদ্ভব হয়। ধর্মের ঈশ্বর কি দর্শনের পরমতম সত্তার সঙ্গে অভিন্ন? অথবা ধর্মের ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে আমরা পরম সত্তা বলে স্বীকার করলেও তাঁকে কিছুটা সসীম অর্থে গ্রহণ করবো? অর্থাৎ দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে কি তাঁর অবস্থাটা সসীমতা ও অসীমতার মধ্যস্থলে নির্দিষ্ট হবে? এখন আমরা একটি জটিলতম প্রশ্নের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছি। পরমতম সত্তার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক, একের সঙ্গে বহুর, ব্যাপিতার সঙ্গে তুরীয়তার, অনন্তের সঙ্গে অন্তের সম্পর্ক; অসীমের সঙ্গে সসীমের সম্পর্কের এক বিশেষ সমস্যা। এটি একটি প্রাচীন সমস্যা। কিন্তু বর্তমান যুগে বহুত্ববাদের এবং সসীম ঈশ্বরের ধারণার পুনরাবির্ভাবের ফলে, এবং এই মতবাদগুলি সম্পর্কে অপরিবর্তনীয় ঈশ্বরবাদের প্রতিক্রিয়া সমস্যাটিকে পুনরায় সজীব করে তুলেছে। এই সমস্যা সম্পর্কিত দু'টি প্রধান মতবাদ (একত্ববাদ বা অদ্বৈতবাদ ও বহুত্ববাদ) সংক্ষেপে আলোচনা করে আমরা আমাদের নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করবো।

I

পরম সত্তাকে এক বা সবকিছুকে ঈশ্বর বলে যে সব মতবাদ স্বীকার করে আমরা আগে সেই মতবাদগুলিই আলোচনা করবো। আধুনিক দর্শনে, এমনকি একেবারে বর্তমান সময়েও দর্শনে এই বিশেষ মতবাদটি পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনকালে এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন ইলিয়াটিক সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা, যেমন জেনোফেনিস্ (Xenophanes), পারমেনিডিস্ (Permenides) প্রভৃতি দার্শনিকেরা। প্রাচ্য দর্শনের এটি একটি বিশেষ চরিত্র। (যেমন ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। জগৎ মিথ্যা বা মায়া)। আমরা আমাদের আলোচনা আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবো।

আধুনিক ইউরোপের স্পিনোজা (Spinoza) হলেন প্রথম অদ্বৈতবাদী চিন্তাবিদ। স্পিনোজার মতে ঈশ্বর ও পরমতম সত্তা এক। স্পিনোজার ভাষায় অসীম দ্রব্য এক এবং একমাত্র সত্তা। সকলেই জানেন স্পিনোজা তাঁর দর্শন ডেকার্টের (Descartes) চিন্তা ও বিস্তৃতির দ্বৈতবাদ থেকে আরম্ভ করেন। ডেকার্টে চিন্তা ও বিস্তৃতিকে দু'টি স্বতন্ত্র দ্রব্য বলে মনে করেন। স্পিনোজার মতে, চিন্তা ও বিস্তৃতি দু'টি স্বতন্ত্র দ্রব্য নয়, একই দ্রব্যের দু'টি গুণ মাত্র। একটিমাত্র দ্রব্য আছে। মাত্র একটি সত্তা। অনন্ত অপরিবর্তনীয় এই একই জগতে রয়েছে চেতন ও অচেতন দ্রব্য। বহুত্ব, স্বাধীনতা, সময়, পরিবর্তন,

বিশেষ জিনিসের স্বনির্ভরতা, বিকাশ প্রভৃতি সব কিছুই হল প্রতিভাস, এমনকি মায়াও বলা যেতে পারে। স্পিনোজার দ্রব্যের ধারণা একান্তভাবে এক। সেখানে বিরোধ বা স্বতন্ত্রতার কোন স্থান নেই।

কিন্তু কেন সেই 'এক' প্রতিভাস রূপেও বদ্ধ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, অসীম কেন অসংখ্য সসীম সত্তার মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে, মায়াময় এই প্রপঞ্চের প্রয়োজনীয়তাই বা কি ? এসব প্রশ্নের কোন জবাব স্পিনোজা দেন নি। স্পিনোজার দ্রব্য সম্পর্কে তাই যথার্থই বলা হয়ে থাকে—এটি যেন সিংহের গুহা, যাওয়ার অনেক পথ, কিন্তু বেরিয়ে আসার কোন রাস্তা নেই। ঈশ্বর=দ্রব্য=প্রকৃতি এই সমীকরণের অর্থ হল, এক সত্তা ভিন্ন অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। যা নিত্য নয় তার কোন সত্তা নেই। ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব এখানে নির্বাসিত। যা আছে তাই ভাল। পাপ বা অমঙ্গলের কোন অস্তিত্ব নেই। যদি কিছু থাকে তা আছে কেবল মানুষের চিন্তায়। কারণ আমরা যাকে মন্দ বলছি, সেও সম্পূর্ণের, একটি উপাদান। সেই তথাকথিত 'মন্দ' ছাড়া সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবেন। সবকিছু নিয়েই ত সম্পূর্ণতা। বিশ্বসংসারে যেখানে, যেটি যেমনটি রয়েছে, সেইখানে, সেটি তেমনিভাবেই প্রয়োজনীয়। 'মানুষের' ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতিকে স্পিনোজা জ্যামিতিক উপায়ে সমাধান করেছেন। যেন সেগুলি ঠিক রেখা, তল বা ঘন বস্তুর মত। কোন কিছু করার জন্য কোন ব্যক্তির কোন উদ্যোগের সম্ভাবনা নেই এখানে। কাল এখানে স্থাণু। বের্গসঁর (Bergson) ভাষায় কাল কিছু করে না, অতএব কাল বলে কিছু নেই। সব কিছুই সুসম্পূর্ণ। গাণিতিক সত্যের মত সম্পূর্ণ। সত্য যা তাই আছে এবং থাকবে। তার পরিবর্তন অসম্ভব। এটি একটি 'অবরুদ্ধ বিশ্ব'। উইলিয়ম জেম্‌স (William James), হেগেল (Hegel) সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন স্পিনোজা সম্পর্কে তা অধিকতর প্রযোজ্য। অল্প দু'একটি বাক্যের সাহায্যে, এক আত্মস্থ সাধু ব্যক্তির সমুন্নত চিন্তাকে এবং তাঁর ভক্তির উপাদানগুলিকে আমরা যে নস্যাৎ করে দিতে পারি না, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। এই স্পিনোজাকে শ্লায়ারমেকার (Schleirmacher) প্রশংসা করেছেন 'এক অবহেলিত পবিত্র আত্মা বলে' এবং নোভোলিস্‌ (Novolis) বলেছেন, 'ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা একটি মানুষ'। তাঁর চিন্তার, অথবা বলা যেতে পারে তাঁর দিব্যদৃষ্টির চরম বিকাশ ঘটেছে যখন তিনি তাঁর একত্ববাদী যুক্তির আকারগত সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেছেন এবং উন্নততর সংস্কার

সাহায্যে তাঁর আত্মাকে মুক্ত করতে পেরেছেন। তিনি যখন বলেন—আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগ ঘটলেই আত্মা স্বাধীনতা লাভ করবে, অথবা ঈশ্বরের প্রতি যুক্তিনিষ্ঠ প্রেমই সর্বোত্তম জীবন, কিংবা ব্যক্তি যখন ঈশ্বরকে ভালবাসে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর তখন নিজেকেই ভালবাসেন—তখন স্পিনোজার দর্শনকে এক দিক থেকে মনে হয় যেন, চরম রহস্যবাদের মধ্যে তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে, আবার অন্যদিক থেকে বিচার করলে মনে হবে স্পিনোজার দর্শন, প্রকৃতিবাদে কিংবা বিনয়ী জড়বাদে (Schopenhouar-এর ভাষায়) পরিণতি লাভ করেছে। কারণ এর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে মঙ্গল, অমঙ্গল প্রভৃতি নৈতিক মূল্যগুলির মধ্যে পার্থক্য অর্থহীন হয়ে গেছে। তিনি ঈশ্বরকে প্রকৃতির সঙ্গে এক করে দেখেছেন। অবশ্য যদিও তিনি প্রকৃতিকে ব্যক্তি হিসেবে বোঝাতে চেয়েছেন, তবুও বিশ্বপ্রকৃতি যান্ত্রিক নিয়মে পরিচালিত একটি জগতে পরিণত হয়ে গেছে। সেই বিশ্বপ্রকৃতির আত্মাকে প্রতিবিম্বিত করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। পরম সত্তা এতই বিশাল ও এতই জটিল যে স্পিনোজার একত্ববাদের সুদৃঢ় দেওয়ালে তাকে বন্দী করে রাখা যায় না। তাছাড়া তিনি যে সমাধান দিয়েছেন, তা এতই সংক্ষিপ্ত যে সব কিছু ঘটনার প্রতি তিনি সুবিচার করে উঠতে পারেন নি। আমরা আগেই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে নৈতিক এবং অন্যান্য মূল্যগুলি পরম সত্তার মৌলিক উপাদান। এবং সেইজন্যে আমরা এমন কোন মতবাদ গ্রহণ করতে পারি না যে মতবাদে মঙ্গল ও অমঙ্গলের উর্ধ্বে জগতকে স্থাপন করার চেষ্টা হয়েছে।

একত্ববাদের অত্যাধুনিক রূপটির নাম হল চরম ভাববাদ। ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এখনো (বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে) এই মতবাদের দুর্দান্ত প্রভাব। এই মতবাদের প্রবক্তার নাম মনীষী হেগেল (Hegel)। তিনি এমনই এক চিন্তার পরিকল্পনা করেছেন যা পূর্বে কোন মানুষের মস্তিষ্ক থেকে জন্মলাভ করে নি। অবশ্য সকল একত্ববাদী ভাববাদের মত তিনি জড়-জগৎ ও প্রাণ-জগতকে এক সর্বগ্রাসী চূড়ান্ত ধারণার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু ব্রহ্মের ধারণার সম্পূর্ণতার জন্য তার যৌক্তিক বিকাশ অবশ্যম্ভাবী—এই মতের উপর হেগেল (Hegel) গুরুত্ব আরোপ করেছেন বলে তাঁর একত্ববাদ অন্যান্য একত্ববাদ অপেক্ষা স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। স্পিনোজার মত হেগেলও ব্রহ্মাণ্ডকে এক ও সম্পূর্ণ সত্তা হিসেবে স্বীকার করেছেন। জ্যামিতিক উপপাদ্যের

মত স্পিনোজার দ্রব্য স্থাণু, অপরিবর্তনীয়। কিন্তু হেগেলের মতে জীবন্ত আত্মার মত চরম ধারণার মধ্যেও গতি আছে। সে স্ব-আবর্তিত। আমরা বলতে পারি হেগেলের দর্শনে ইলিয়াটিক (Eleatic) দার্শনিকদের সত্তার ধারণার সঙ্গে হেরাক্লিটাসের (Heracleituds) গতির ধারণার সংমিশ্রণ ঘটেছে। হেগেল তাঁর পূর্বসূরী দার্শনিক শেলিং-এর (Schelling) কেবল 'অভেদের নীতি' সমর্থন করতে পারেন নি। হেগেলের অভিমত হল শেলিং পরম সত্তাকে একটা একঘেয়ে বিমূর্ত সর্বজনীনতায় পরিণত করেছেন সে যেন এক অনন্ত রজনী যে সময় সব কাককেই কালো দেখায়। হেগেল এদের মধ্যেই বিভেদের সজীব পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ঐক্যের মধ্যে এই বিভেদের নীতিকে তিনি 'ধারণার দ্বান্দ্বিক গতি' বলে আখ্যা দিয়েছেন। (হেগেল অনুমান করেন, মানুষের চিন্তার ধারণাগুলি বা চিন্তন পদ্ধতি কেবলমাত্র কোন একজন ব্যক্তির বা কোন একটি জাতির মানসিক বিষয় নয়। ঐ মানসিক বিষয়গুলিও বাস্তব সত্তার উপাদান)। হেগেলের ধারণাগুলি গতিহীন আত্মতুষ্ট সত্তা মাত্র নয়। এ্যারিস্টটলের (Aristotle) তর্কবিদ্যায় যেমন অভেদের নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, A = A, হেগেল কিন্তু তাতে তৃপ্ত নন। তাঁর মতে প্রত্যেক ধারণা সর্বদা নিজেকে অতিক্রম করে যেতে চাইবে। যেমন A > B > C। এটাকেই ধারণার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বলে। কিন্তু এই অতিক্রমণ একই সত্তার মধ্যে সংঘটিত হবে। হেগেল লক্ষ্য করেছেন প্রত্যেক সসীম ধারণার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে একটি স্ববিরোধ। এবং তার ফলে সেই ধারণা ঐক্যের জন্য অন্য একটি ধারণার অন্বেষণ করে। প্রত্যেক ধারণার মধ্যেই রয়েছে তার বিরোধী ধারণার ইংগীত। যেমন সাদার ধারণা কালোকে নির্দেশ করে, দিনের ধারণার মধ্যেই রয়েছে রাত্রির সম্ভাবনা, মঙ্গলের ধারণার মধ্যেই অমঙ্গলের ধারণার অস্তিত্ব, আনন্দের সঙ্গে বিষাদের ধারণার সম্পর্ক রয়েছে, স্বাধীনতার ধারণার মধ্যেই নিহিত আছে অধীনতার ধারণা। কিন্তু বিরোধকে চিরন্তন বলে মেনে নিয়ে কখনো চিন্তা সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তার ফলে চিন্তা বিষয় থেকে বিরোধী বিষয়ে যায়। এবং তারপর অন্বেষণ করে এমন একটি উন্নত ধারণার যাতে 'বিষয়' ও বিরোধী বিষয়টির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব থাকে তা লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু সেইখানে শেষ নয়। সেই উন্নত ধারণাটির মধ্যে আবার স্ববিরোধ দেখা দেয়। তার মধ্যে থাকে আবার তার বিরোধী ধারণার নির্দেশ। তখন আরও উন্নত ধারণার প্রয়োজন হয় যাতে সেই বিরোধী ধারণা দুটির সমন্বয় ঘটতে পারে। এইভাবে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অগ্রসর হয়। পরিশেষে

পরম সত্তার ধারণার মধ্যে চরম সমন্বয় ঘটে। সেখানে আর কোন বিরোধ নেই। সেই মহাব্যাপক ধারণার মধ্যে সব বিরোধ শেষ হয়ে যায়। অতএব সমগ্র চিন্তার রাজ্য (যাকে হেগেল সত্তার রাজত্ব বলেছেন) জুড়ে একটি ধারণার সঙ্গে বিরোধী ধারণার দ্বন্দ্বের ফলে ধারণাগুলি ব্যাপকতর হতে থাকে। একটি ধারণার সঙ্গে তার বিরোধী ধারণার যেন নিরন্তর সংগ্রাম চলেছে। [এই প্রসঙ্গে হেরাক্লিটাসের (Heracleitus) নীতির কথা মনে পড়ে যায়—'সংগ্রাম সব বিষয়ের জনক'] কিন্তু এই সংগ্রাম যুযুধান দুই পক্ষকে অবশেষে সুনিবিড় প্রশান্তি দান করে। এই শান্তি কোন একপক্ষকে হারিয়ে দিয়ে অন্যপক্ষকে প্রতিষ্ঠা করে না। বিরোধী উভয় পক্ষই তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে পুনর্মিলিত হয়। তাদের আপাত অসামঞ্জস্য কোন মীমাংসার মাধ্যমে নয়, অন্তর্ভুক্তির ফলেই শেষ হয়ে যায়। পরম সত্তা সর্বব্যাপক, অসীম এবং অপরিমিত সমৃদ্ধশালী। তার মধ্যে সকল আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এক ঐক্যে পর্যবসিত হয়। এইভাবে অংশে অংশে যে বিরোধ দেখা দেয়, সমগ্রতায় এসে সেই বিরোধ অপার শান্তি ও নিশ্চিন্ততায় লীন হয়ে যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তন মানে পরম সত্তার যৌক্তিক আত্ম-বিবর্তন। এই পরম সত্তার বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। পরম সত্তার আত্মজ্ঞান লাভের পথে সকল সসীম সত্তা যেন এক একটা মুহূর্ত বা বিশেষ একটা অবস্থা। এই মুহূর্ত বা অবস্থা হিসেবে সসীম সত্তার যা কিছু অস্তিত্ব। এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে হেগেল তাঁর দর্শনে পরম সত্তার সঙ্গে ধর্মের ঈশ্বরকে এক করে ফেলেছেন। তাঁর মতে দর্শন হল ধর্মবিশ্বাসের যথার্থ যৌক্তিক বিশ্লেষণ। পরম সত্তার বা ব্রহ্মের সঙ্গে ঈশ্বরের একটিমাত্র পার্থক্য—ব্রহ্মকে কেবল বিশুদ্ধ যুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায়, বিপরীত পক্ষে ঈশ্বর যদিও সেই একই সত্তা, তাঁকে কল্পনা ও ভক্তির সাহায্যেই কেবল প্রকাশ করা যেতে পারে। [পরম সত্তা এক। বিশুদ্ধ যুক্তির সাহায্যে যখন প্রকাশিত হন তখন তিনি ব্রহ্ম। আর ভক্তি ও কল্পনার সাহায্যে প্রকাশিত হলে তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়।] হেগেল কেবল ঈশ্বর ও ব্রহ্মকে এক করতে চান নি, খৃষ্টধর্মের ত্রিতত্ত্বের সঙ্গে তাঁর ধারণা, বিশুদ্ধ ধারণা ও সমন্বয়ের ধারণা—এই তিনকে এক করে তোলানোর জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। পরমতম সত্তা শুদ্ধ সত্তা হিসেবে অনন্তকাল আত্ম-স্বরূপ ('পিতা হিসেবে ঈশ্বর'—এই বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি ধারণাকে এক করতে চেয়েছেন)। ব্রহ্ম যখন প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন, তখন

নিজে জ্ঞাতা হয়েও সসীম দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞেয় হয়ে পড়েন। অসীম অনন্ত এক তখন সসীম দৃষ্টিকোণ থেকে বহু হয়ে যায় (বিরোধী ধারণা)। এর সঙ্গে হেগেল 'পুত্র হিসেবে ঈশ্বরের' ধারণাকে এক করে দেখেছেন। জ্ঞাতার কাছে পরে যখন উদ্দেশ্য বিধেয় একাকার হয়ে যায়, তখন সেই সাময়িক বা বিশেষ বিষয়গুলি সাধারণ বা অনন্তের সঙ্গে একটা আপোস করে নেয় (সমন্বয়)। এই হল পবিত্র আত্মা হিসেবে ঈশ্বরের ধারণা; কিন্তু এই তিন এক। ঈশ্বরের জীবন এবং ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস এক। কেবল ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। ব্রহ্মের যৌক্তিক আত্ম-আবর্তনের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য বর্তমান।

হেগেলের (Hegel) পরম সত্তা মতবাদের বিস্ময়কর ব্যাপ্তি এবং তার গুরুত্বকে কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। আমরা অবশ্য এখানে তার নিতান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনাই করেছি। ব্রহ্মাণ্ডের যথার্থ ধারণাকে একটি উল্লেখযোগ্য সম্পূর্ণতা দানের অসম্ভব শ্রমসাধ্য চেষ্টা করেছেন দার্শনিক হেগেল। বিশ্ব থেকে অযৌক্তিকতার চিহ্নমাত্রকেও তিনি লোপ করে দিতে চেয়েছিলেন। কারণ এই অযৌক্তিকতার অস্তিত্বের ফলে এক বিশ্বকে বহু বিশ্ব বলে ভ্রম হয়। হেগেলের দর্শনের যথেষ্ট ব্যবহারিক মূল্যও রয়েছে। দীর্ঘদিন থেকে, গতির মধ্যে স্থিতির যে আকাঙ্ক্ষা মানুষের ছিল, এ দর্শন সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছে। অভিজ্ঞতার ফলে বহুধা-বিচ্ছিন্ন এবং আপাত অসম্পূর্ণ বিশ্বকে তিনি সর্বাংশে সম্পূর্ণতা দান করেছেন………।

কিন্তু অন্যদিকে আবার এই দর্শন মন ও হৃদয়ের দাবি মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে। এই দর্শন এমন এক সুসম্পূর্ণ জগতের ধারণা দেয় যাতে সম্পূর্ণ বৃত্তাকার এই বিশ্বনিয়মের বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকে না। অন্য কোন কিছু যোগ করারও সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এই দর্শন আবার আমাদের 'অবরুদ্ধ বিশ্বের' কথা মনে করিয়ে দেয়। হেগেল স্থিতিশীলতাকে অস্বীকার করে তার মধ্যে গতির অস্তিত্বকে যে প্রমাণ করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর দর্শনের মূল তত্ত্ব স্বীকার করে নিলে, গতির যদি কোন অস্তিত্ব থাকে তাহ'লে কেবল যৌক্তিক অস্তিত্ব আছে বলা যেতে পারে, কিন্তু গতির কোন ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নেই। ব্রহ্মের পক্ষে যৌক্তিক ধারণাকে তার বিরোধী ধারণার সঙ্গে এক করে এক উন্নততর ধারণার সৃষ্টি করা বা সমন্বয় সাধন করা কোন কষ্টের ব্যাপার নয়। অনন্ত সত্তার তারা এক একটা

মুহূর্ত বা অবস্থা মাত্র। ধারণার পারস্পরিক বিরোধকে দ্বন্দ্ব বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিরোধ কোন প্রকৃত বিরোধ নয়। 'রক্তহীন ধারণাগুলির দ্বন্দ্বে কোন রক্তপাতের সম্ভাবনা নেই। তাই এই দ্বন্দ্ব যেন থিয়েটারের যুদ্ধ। যার ফলাফল আগে থেকে জানা'। আমরা বাস্তব জগতে যে গতি দেখেছি, প্রকৃত পক্ষে তা কোন গতি নয়। কারণ গতি হল বিশুদ্ধ দ্বান্দ্বিক গতি। হেগেলের (Hegel) একদেশদর্শী শুষ্ক বুদ্ধিবাদ থেকে আমরা জানতে পারি যে—এই বিশ্ব কেবল যৌক্তিক সম্পর্কে সম্পর্কিত। এ কেবল ধারণার জগৎ। কিন্তু যে মনোজগৎ থেকে ধারণার উৎপত্তি, সেখান থেকে ধারণাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক শূন্য বিমূর্ত জগতের। ব্রহ্মের কোন ইতিহাস নেই। মানুষের অভিজ্ঞতার জগতে ব্রহ্মকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনন্ত সত্তাকে এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখলে (বলা যেতে পারে, যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী) সময় ও ইতিহাসকে মায়া ছাড়া আর কিছু মনে হবে না।

হেগেলের অন্য চিন্তাধারাটি সম্পর্কে আমরা সচেতন। কিন্তু আমরা এতক্ষণ তাঁর যে চিন্তাধারার আলোচনা করলাম, তার সঙ্গে এই চিন্তাধারার সামঞ্জস্য বিধান করা বেশ কষ্টকর। এক সময় হেগেল ইতিহাসের গুরুত্বকে স্বীকার করতেন। কেবল স্বীকার করতেন নয়, অন্যদের থেকে ইতিহাসকে তিনি অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন। তিনি সুন্দরভাবে বলেছেন, 'বিশ্ব ইতিহাসের ভয়ংকর পরিশ্রম দীর্ঘদিন পরে বিশ্ব আত্মা কর্তৃক ধৈর্যের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে'। কাল বাস্তব। অন্ততঃ এই অর্থে বাস্তব যে ব্রহ্ম এই কালের মধ্য দিয়েই সম্পূর্ণ সচেতনতা লাভ করেছেন। কিন্তু তার শিক্ষার আর একটি মৌলিক দিক ইতিহাসের ভূমিকাকে নগন্য করে তুলেছে। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে তাঁর বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। "আমরা যে লক্ষ্যে উপনীত হতে চেয়েছিলাম সেই লক্ষ্যে যে আমরা এসে হাজির হয়েছি—এই জ্ঞান সসীমতার গণ্ডীতে থেকে অথবা অভিজ্ঞতা দিয়ে লাভ করা সম্ভব নয়। ভ্রমজ্ঞান বা মায়ামুক্তি হলেই বোঝা যায় যে আমরা অসীম লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছি। যতক্ষণ আমরা তা না বুঝতে পারি, মনে হয় কাজ অসম্পাদিত থেকে গেছে। অনন্ত কাল ধরে চরম মঙ্গল জগতের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ করে তুলছে। এই কাজের জন্য সে আমাদের অপেক্ষা করে না। কাজ তার যেমন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তা সুসম্পাদিতও হয়ে গেছে। ভ্রমজ্ঞানের মধ্যেই আমরা জীবন

ধারণ করি।.........পরম সত্তা কেবলমাত্র বিরোধী ধারণার সম্মুখীন হওয়ার জন্য তাঁর সম্পূর্ণীকরণের পথে ভ্রান্তি সৃষ্টি করেন। তারপর তাঁর কাজ হল স্ব-নির্মিত মায়াকে অতিক্রম করার চেষ্টা করা* এখানে ভ্রমজ্ঞান বা মায়া শব্দটিকে অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে। এর পর আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে ইতিহাস এবং জীবনের যত দ্বন্দ্ব, যত অসম্পূর্ণতা সবই বাহ্য, সম্পূর্ণ সত্তার প্রতিভাস মাত্র। সেই সুসম্পূর্ণ পরম সত্তার কোন অপূর্ণ বাসনা নেই, কোন সমাধানযোগ্য সমস্যা নেই, অন্ততঃ তার জন্য আমাদের সহযোগিতার তাঁর কোন প্রয়োজন নেই"। প্রিঙ্গল প্যাটিশন (Pringle Pattison) এই অনুচ্ছেদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'এর ফলে আমার ক্ষমতার উৎসটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। নৈতিক জীবনের দ্বন্দ্ব যদি অবাস্তব হয়, তাহ'লে বাস্তবতার অন্য কোন মান আর আমাদের অবশিষ্ট থাকবে না।' কোন একটি ব্যক্তিসত্তার প্রতি হেগেলের মতবাদ কোন মর্যাদা প্রদান করে না। আমাদের মত ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে পরমতম সত্তার গুণ প্রকাশ করছি মাত্র। ব্যক্তি ব্রহ্মের বিশ্লেষণ। ব্রহ্মই সত্য। এই মতবাদে বিশ্বসংসারকে একটি নৈর্ব্যক্তিক তার্কিক প্রণালীতে পরিণত করা হয়েছে। ব্যক্তিমানুষের ভূমিকা এখানে নগন্য। এই যান্ত্রিক চিন্তা প্রণালী মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সকল বিষয়কে আত্মসাৎ করে ফেলছে। আধ্যাত্মিক লক্ষ্য লাভের জন্য মানুষ এখানে ঈশ্বরের সহযোগী অংশীদার নয়, নিষ্ক্রিয় যন্ত্র মাত্র। ব্রহ্মের সঙ্গে তাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। বিশ্বসংসার যখন ব্যক্তিকে গ্রাস করে তখন নৈতিক মূল্যগুলির অস্তিত্বও লোপ পায়। সেই অনন্ত সত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, সংসারে কোন অমঙ্গল বা কোন পাপ আছে বলে মনে হবে না। সব কিছুকেই সুন্দর মনে হবে। প্রকৃত ব্রহ্মবাদ পাপ ও অমঙ্গলকে পরম ব্রহ্মের প্রয়োজনীয় উপাদান বলে স্বীকার করতে বাধ্য। ব্রহ্মের এই মনোভাবকে অবশ্যই সহিষ্ণুতার মনোভাব বলতে হবে। কারণ কোন কিছুতে তিনি বিরত হচ্ছেন, বা কোন বিষয় তাঁর প্রশান্ত সুখে বিঘ্ন উৎপাদন করছে এরকম কোন সমস্যার কথা আমরা ভবতে পারছি না। যাঁরাই জগতকে ব্রহ্মের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন তাঁরাই 'যা আছে তাই ভাল, তাই সুন্দর, তাই সত্য' এই রকম একটি সিদ্ধান্ত করার জন্য উৎসাহিত বোধ করবেন।

* Hegel—Encyclopedia, section 212 (Quoted by A. S. pringle pattison. Idea of God, p. 412.)

হেগেল (Hegel) বলেছেন অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে আমরা যে দার্শনিক জ্ঞান লাভ করি তাতে দেখা যায়, জগতের যেমন হওয়া উচিত ছিল, জগৎ তেমনি আছে। 'যা চিন্তনীয় তারই অস্তিত্ব আছে এবং যার অস্তিত্ব আছে তাই চিন্তনীয়'—হেগেলের এই বিখ্যাত উক্তির সঙ্গে বর্তমান প্রসঙ্গের যোগ আছে। আমাদের কাছে আবার সেই বৃত্ত-তন্ত্র এসে পড়েছে। এই বৃত্তের কোন অংশে কোন ফাঁক নেই। এই অবরুদ্ধ বৃত্তের মধ্যে আদর্শ ও বাস্তব নির্বিরোধে বসবাস করছে। অসম্পূর্ণ অসম্পাদিত বলে কোন কিছু বাস্তবে নেই। স্পষ্টতঃ এই মতবাদ প্রগতির পরিপন্থী। জগতকে সমালোচনা করার কোন অবকাশ এই মতবাদে নেই। হেগেল তাঁর তার্কিক জটিলতার জন্য আত্মসমর্থনে অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন এবং নানানভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। তাহ'লেও হেগেলের শিক্ষায় এই কথাটা সর্বদা প্রাধান্য পেয়েছে—'আগে থেকে সবকিছু হয়ে রয়েছে, এখন আর করার কিছু নেই। যেহেতু এই মতবাদ নৈতিকতাকে দুর্বল করে দেয়, (বলা যেতে পারে নৈতিকতার অস্তিত্বই লোপ করে দেয়) সেইজন্য মতবাদটিকে সন্তোষজনক বলে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। পরমব্রহ্ম যিনি নাকি সুসম্পূর্ণ, যাঁর অসম্পাদিত কোন কাজই অবশিষ্ট নেই, তিনি কেন অসম্পূর্ণতার মায়া বিস্তারের খেলা খেলছেন? কি করে ব্রহ্ম তাঁর সসীম অনন্ত প্রকাশের সঙ্গে অসীমত্বকে মেলাবেন? এই প্রশ্নগুলির উত্তর হেগেলের পরম সত্তা মতবাদে পাওয়া যাবে না।

আমরা দেখেছি, হেগেল (Hegel) পরমতম সত্তা ও ঈশ্বরকে এক ভেবেছেন। কিন্তু যে সত্তা নৈর্ব্যক্তিক, তার্কিক প্রণালীর দেবরূপ মাত্র, অথবা যে সত্তা জগতের সঙ্গে কিংবা মানুষের বিবর্তনের সঙ্গে অভিন্ন, যে পদ্ধতিতে 'যা আছে' এবং 'যা হওয়া উচিত'—এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের কোন মানদণ্ড নেই, সেই সত্তাকে আমরা ধর্মের ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন বলে কি করে গ্রহণ করতে পারি? সম্ভবতঃ হেগেলের মন ঈশ্বর ও পরম সত্তার মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় ছিল। কখনো তিনি ঈশ্বরকে কালহীন. গতিহীন এক সম্পূর্ণতা ভেবেছেন। আবার কখনো তিনি তাঁকে মানুষের বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। প্রথম মতবাদটি (যদিও এই মতবাদের সমর্থক অনেক আছেন) বর্তমান প্রগতিশীল চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ সমর্থন পাচ্ছে না। নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে বসবাসকারী গতিহীন ঈশ্বরের ধারণার বিরুদ্ধে এখন তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বর্তমানে

আমরা এমন ঈশ্বর চাই যিনি কালের সঙ্গে মান রক্ষা করে কাজ করতে পারবেন। যে মতবাদে তিনি ব্রহ্মের ইতিহাসকে মানুষের বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে এক করে দিয়েছেন, সেই মতবাদে বলা হয়েছে, ঈশ্বর মানুষের মধ্যেই সচেতনতা লাভ করেন। এই মতবাদটি ত'ার বেশীর ভাগ সমর্থক গ্রহণ করেছেন। তাঁদের বামপন্থী হেগেল-সমর্থক বলা হয়। ঈশ্বরবাদী ধর্মীয় চিন্তায় আবার এই মতকে স্বীকার করা হয় না। কারণ ঈশ্বরবাদ ঈশ্বরের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী। মানুষের চিন্তার সঙ্গে ঈশ্বরের অভিন্নতা ঈশ্বরবাদ স্বীকার করে না। তাই যদি হত, তাহ'লে মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগাযোগ বলতে মানুষের সঙ্গে নিজের যোগাযোগই বোঝাত অথবা প্রগতিশীল জাতীয় আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের যোগাযোগ বোঝাত। ঈশ্বরবাদে একথা স্বীকার করা হয় না।

পরবর্তী কালে গ্রেট বৃটেন এবং আমেরিকায় চরম ভাববাদের যে বিকাশ ঘটেছে তাতে হেগেলের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হলেও স্বতন্ত্রভাবে সমগ্র সমস্যাটির যথেষ্ট পুণর্বিবেচনা পরিলক্ষিত হয়। গ্রীণ (T. H. Green), জন কেয়ার্ড (John Caird), এডোয়ার্ড কেয়ার্ড (Edward Caird), জোসিয়া রয়েস (Josiah Royce), ব্র্যাডলে (Bradley) এবং বোসাঙ্কের (Bosanquet) মত চিন্তাবিদেরা কান্ট (Kant) এবং হেগেল (Hegel) যা বলেছেন তাই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন নি। এ'দের প্রত্যেকেই মৌলিক চিন্তার অধিকারী। কিন্তু তাহ'লেও চিন্তায়, ভাবনায় এ'রা অনেক কিছু হেগেল থেকে গ্রহণ করেছেন। অংশের মধ্যে সমগ্রকে প্রত্যক্ষ করা এবং সমগ্রের মধ্যে অংশের সত্য ও অর্থ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা—এই হেগেলীয় দৃষ্টিভঙ্গী সকলের মধ্যেই রয়েছে।

ব্র্যাডলের (Bradley) পরম সত্তা-সম্পর্কীত মতবাদ হেগেল অপেক্ষা অনেকাংশে স্পিনোজার স্বগোত্রীয়। সময়ের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মের আত্মবিকাশ ঘটে—হেগেলের এই নীতি ব্র্যাড্‌লে (Bradley) গ্রহণ করেন নি। বরং কালের বাস্তব অস্তিত্বের বিপক্ষে তিনি অনেক বাদানুবাদ করেছেন। তিনি পুনঃপুনঃ বলেছেন পরম সত্তা কালাতীত। পরম সত্তার কোন ইতিহাস নেই। ত'ার কোন প্রগতি নেই। 'সম্পূর্ণ কোন কিছু, অথবা প্রকৃত সত্তার কোন পরিবর্তন হতে পারে না। পরম সত্তার অনেক ঋতু আছে। কিন্তু সকল ঋতুতে এক সঙ্গে নতুন পাতা জন্মায়, ফল ধরে, ফুল ফোটে'।* স্পিনোজার মত পরম সত্তার সম্পর্কে

* F. H Bradley—Appearance and Reality (1893 2nd ed. reprinted 1902) P 500.

নিশ্চিন্ত চিন্তার প্রবণতাই এখানে পরিস্ফুট। অ-বিরোধ বা আভ্যন্তরীণ ঐক্যের নীতিকে তিনি সত্য ও বাস্তবতা নির্ণয়ের চরম মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন। উচ্চতর সমন্বয়ের ফলে বিরোধের শেষ হয় বলে হেগেল (Hegel) যে অভিমত প্রকাশ করেছেন ব্র্যাড্‌লের (Bradley) আভ্যন্তরীণ ঐক্যের নীতির সঙ্গে তার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ব্রাড্‌লে (Bradley) কিছু কিছু বিষয়ে হেগেল ও স্পিনোজার থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি ঈশ্বরকে পরম সত্তা থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করেন। "যদি তুমি ঈশ্বরকে পরম সত্তার সঙ্গে এক করে ফেল, তাহ'লে সে ঈশ্বর ধর্মের ঈশ্বর হবেন না। যদি ঈশ্বরকে ব্রহ্ম থেকে পৃথক কর, তাহ'লে তিনি অন্যান্য জাগতিক বিষয়ের মত সসীম হয়ে পড়বেন। পরম সত্তায় পৌঁছানোর পূর্বে ঈশ্বরের বিশ্রাম নেই। আবার লক্ষ্যে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব লোপ পাবে এবং সেই সঙ্গে ধর্মের অস্তিত্বও লোপ পাবে। ঈশ্বর যতক্ষণ না সর্বময় হচ্ছেন ততক্ষণ তিনি ঈশ্বর হতে পারছেন না। আবার সর্বময় ঈশ্বরকে ধর্মের ঈশ্বর বলা যায় না। ঈশ্বর পরমতম সত্তার প্রতিভাস, তাঁর একটা দিক মাত্র"* ব্র্যাড্‌লে (Bradley) তাঁর পরবর্তী পুস্তকে লিখেছেন, "আমি পরম সত্তাকে ঈশ্বর মনে করি না। আমার কাছে ধর্ম-চেতনার বাইরে ঈশ্বর অর্থহীন। তাঁর প্রয়োজন ব্যবহারিক। পরমতম সত্তা ঈশ্বর হতে পারেন না। কারণ পরিণতিতে পরমতম সত্তার সঙ্গে কোন কিছুর সংযোগ থাকে না। ফলে তাঁর কোন সসীম সত্তা থাকা বা সসীম ইচ্ছা থাকা সম্ভব নয়। যখনই তুমি পরমতম সত্তাকে অথবা বিশ্বজগতকে উপাসনা করতে আরম্ভ করবে অর্থাৎ যখন পরমতম সত্তা ধর্মের উপাস্য হয়ে উঠবেন সেই মুহূর্তে তাঁর রূপ পরিবর্তন ঘটবে! তিনি সঙ্গে সঙ্গে পরমতম সত্তার থেকে ছোট কোন কিছুতে পরিণত হবেন।" "বিশ্বজগৎ সম্পর্কে একজন ব্যক্তিক ঈশ্বর চরম সত্য নয়।" এর অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের ধারণা আপেক্ষিক-ভাবে সত্য। "উন্নততম ধর্মে ব্যবহারিক প্রয়োজনে যে ধারণার প্রকৃত প্রয়োজন, সেগুলি সত্য। আমার বিচারে সেই ধারণাগুলির যথার্থতার প্রশ্নের সঙ্গে অধিবিদ্যার ততক্ষণ কোন দ্বন্দ্ব হওয়ার কথা নয়, যতক্ষণ তারা বুদ্ধিগ্রাহ্য হওয়ার না চেষ্টা করবে।" "আমি যতদূর অনুভব করতে পারছি, তাতে মনে হয়, পরম সত্তা নৈর্ব্যক্তিক। একই সঙ্গে আমার মনে হচ্ছে, ধর্মেরও একজন

* OP Cit, PP. 447 ff.

স্বতন্ত্র ঈশ্বরের (যিনি একজন ব্যক্তি) ব্যবহারিক প্রয়োজন রয়েছে। যখন এই বিশ্বাসের প্রকৃত প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করছি, আমি তাকে সত্য ও যথার্থ বলেও স্বীকার করে নিতে পারি। অবশ্য যদি অন্যান্য সম্ভাব্য বিরোধী বিশ্বাসগুলি এই বিশ্বাসকে সমর্থন করে। অতএব দেখা যাচ্ছে, ধর্মে একটা মৌলিক অসঙ্গতি থেকে গেছে"।*

ব্র্যাডলের (Bradley) যুক্তির সূক্ষ্মতা এবং নতুনত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি যে অনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পেঁৗছেছেন তাতে ধর্ম-দর্শন বা ধর্ম কেউই সন্তুষ্ট হতে পারে না। ঈশ্বর সসীম, এবং তিনি একজন ব্যক্তি ; এমন কোন নির্দিষ্ট সীমরেখা নেই যেটিকে অতিক্রম করলে ঈশ্বর পরমতম সত্তায় মিশে যেতে পারেন এবং তাঁর অস্তিত্ব লোপ পেতে পারে—ঈশ্বরকে পরমতম সত্তার সঙ্গে এক করাও যাবে না, আবার পরমতম সত্তা থেকে তাঁকে পৃথক করাও যাবে না। —যে ধর্মবিশ্বাস তার বিরোধী বিশ্বাস দ্বারা সমর্থিত, সেই বিশ্বাস যথার্থ —এইগুলি হল দার্শনিক প্রজ্ঞার শেষ কথা। এই দার্শনিক জ্ঞান এক সর্বগ্রাসী ঐক্যের মধ্যে সমস্ত বিরোধের সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। উন্নততর ধর্মে এবং উন্নততর দর্শনে অবশ্য কোন স্থায়ী বিরোধ নেই, থাকতে পারেও না। আমাদের ধর্মীয় ও বৌদ্ধিক প্রয়োজন, পরিশেষে এমন একটি সাধারণ উৎস খুঁজে পায় যেখানে উভয়ের পক্ষে সন্তুষ্ট থাকার কোন অসুবিধে থাকে না। ধর্ম এমন কোন সত্তাকে উপাসনা করতে পারে না, যে সত্তা পরম সত্তা নয়, পরম সত্তার প্রতিভাস মাত্র। এই মতকে [অর্থাৎ পরম সত্তা ছাড়া অন্য সত্তা ধর্মের উপাস্য হতে পারে] যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া হয় তাহ'লে পুতুল পূজার পুনরাবির্ভাব ঘটবে। আংশিক দেবতার উপাসনা চলতে থাকবে। অর্থাৎ ধর্মকে স্বীকার করে নিতে হবে যে ঈশ্বরের থেকেও বেশী কিছু ও বড় কিছু রয়েছে। যেমন গ্রীক চিন্তায় নিয়তিকে সর্বশক্তিমান বলা হয়েছে। দেবতা জীউস (Zeus) পর্যন্ত নিয়তিকে অস্বীকার করতে পারেন নি। ব্র্যাডলের (Bradley) যুক্তি মেনে নিলে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে প্রারম্ভে ঈশ্বর ও মানুষ একই উপাদান থেকে উৎপন্ন হয়ে ভিন্ন ভাবে বিকশিত হয়েছে। তাছাড়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের যুক্তি প্রসঙ্গে ব্র্যাডলে (Bradley) যথেষ্ট পরিষ্কার নন। ঈশ্বর এই বিশ্ব সংসারে কোথাও কি আছেন ? তিনি নিজে বাস্তব সত্তা। কিন্তু আমাদের কাছেই কি কেবল প্রতিভাস

* Bradley—Essays on Truth and Reality (1914), PP. 428, 432 and 436.

রূপে প্রকাশিত ? ব্র্যাডলে (Bradley) স্বীকার করেছেন যে তাঁর সত্তার মাত্রা—নীতি তাঁকে এই প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট হ্যাঁ বা নার সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বাধা দিয়েছ।* তিনি অবশ্য বলেছেন ঈশ্বর পরম সত্তা না হলেও তোমার আমার থেকে সহস্র গুণে বাস্তব, তাহ'লেও আমাদের মনে একটা আশঙ্কা থেকেই যায় ; ঈশ্বর যে কোন সময় পরমতম সত্তার মধ্যে লুপ্ত হয়ে যেতে পারেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বই যখন এত অনিশ্চিত, তখন আমাদের মত সসীম মানুষের অবস্থা যে আরও কত অনিশ্চিত তা সহজে কল্পনা করা যায়। ব্রহ্মের কাছে ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্যের কোন মর্যাদা নেই। বরং বলা হয়েছে সমস্ত কিছু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে সব কিছু একাকার হয়ে যায়। পরমতম সত্তা যেন এক সর্বগ্রাসী, সর্বব্যাপী সংমিশ্রণ প্রক্রিয়া। যার ফলে সকল ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য, পুনরায় মিলে মিশে এক হয়ে যায়। আত্মার বহুত্বের প্রকৃত কোন অস্তিত্ব নেই। তারা ব্রহ্মের প্রতিভাস মাত্র।† ধর্মীয় চেতনা বা অন্য সকল মানবীয় চেতনার মৌলিক অসঙ্গতির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমরা পাচ্ছি এক শূন্য, বিমূর্ত এবং দুজ্ঞেয় পরম সত্তাকে যার মধ্যে অন্য কোন কিছুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তিনি যেন এমন এক মানুষ যার কোন ইতিহাস নেই, জীবন নেই, গতি নেই, যাকে প্রকৃত অর্থে সুন্দর বলা যায় না, নৈতিক বলা যায় না বা সত্যও বলা যায় না। যার এমন কোন গুণ নেই যার সাহায্যে আমরা তাকে চিনতে পারি। আছে কেবল আকৃতিগত শূন্য আত্ম-সঙ্গতি। ব্র্যাডলে (Bradley) এর থেকে সমৃদ্ধতর ও অধিকতর সদর্থক কোন ধারণা দেবার যখনই চেষ্টা করেছেন (প্রায়ই তিনি সে চেষ্টা করেছেন) তখনই তিনি তাঁর নিজের যুক্তিকে অস্বীকার করেছেন।

বোসাঙ্কে (Bernard Bosanquet) তাঁর গীফোর্ড বক্তৃতায় [The Principle of Individuality and Value (1912)] (The Value and Destiny of the Individual, 1913) চরম ভাববাদের সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন স্থানাভাবে এখানে সেসব আলোচনা করা সম্ভব হল না। তাঁর মতবাদের নিজস্বতা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রধান চরিত্রটি ব্র্যাডলের (Bradley) মতবাদের অনুরূপ। তিনি সত্য এবং সম্পূর্ণ এক ব্যক্তিসত্তার

* Essays on Truth and Reality, P. 448

† Appearance and Reality, PP. 525, 305.

উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ব্র্যাডলের (Bradley) মত তাকেই তিনি পরম সত্তা বলেছেন। ধর্মের ঈশ্বরের সঙ্গে এই পরম সত্তাকে যে এক করে দেওয়া যায় না, এবিষয়েও তিনি ব্র্যাডলে (Bradley)-কে সমর্থন করেছেন। আমরা রয়েসের (Royce) ভাববাদের কোন পৃথক আলোচনা করতে পারছি না জায়গার অভাবে। তিনি অন্যান্য চরম ভাববাদী অপেক্ষা ব্যক্তিত্বের নীতির উপর সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে সার্থক আলোচনা করেছেন। আমরা হেনরী জোন্‌সের (Henry Jones) গীফোর্ড বক্তৃতার (মৃত্যুর পর প্রকাশিত) অথবা অন্যান্য চিন্তাবিদদের আলোচনা থেকেও নিজেদের নিবৃত্ত করছি। রয়েস (Royce) এবং হেনরী জোন্‌স (Henry Jones) অন্যান্য ভাববাদীদের অনেক মতের সঙ্গে একমত হতে না পারলেও হেগেলের মতের সঙ্গে তাঁদের সাদৃশ্য আছে। তাঁরাও স্বীকার করেছেন—ঈশ্বর ও পরম সত্তাকে এক করা যায় না। চরম ভাববাদে ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কারণ এই মতবাদ কোন রকম গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেয় নি। কিন্তু যে ভাবেই এই মতবাদের প্রকাশ হোক না কেন, প্রত্যেক ভাববাদী দার্শনিক ক্রমাগত প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন—পরম সত্তা এক, অভিন্ন, আত্মনিয়ন্ত্রিত সম্পূর্ণ সত্তা। অন্যান্য সব কিছু সেই সত্তার অংশমাত্র। যে টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতার সাহায্যে বাস্তব জগতের জ্ঞান লাভ করা যায়, ভাববাদিগণ প্রত্যেকেই সেই খণ্ড অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করেছেন।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটি 'সমগ্র' হিসেবে চিন্তা করার প্রচেষ্টার প্রতি আমাদের সহানুভূতি আছে। টেনিসনের (Tennyson) মতে 'জীর্ণ দেওয়ালের গায়ে ফোটা' ফুলটিকে জানতে গেলেও আমাদের সবকিছু জানতে হবে। জানতে হবে ঈশ্বর কি, মানুষ কি, প্রভৃতি জটিল দার্শনিক সমস্যাগুলি। কারণ ফুলটি বিশ্ব নিয়মের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু ব্রহ্মবাদীরা ফুলটিকে জানতে চেয়েছেন সমগ্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে, ফুলের দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্রকে জানতে চান নি। তাহ'লে আমরা কি করে বাস্তব জীবনের অজস্র অভিজ্ঞতাকে (যা আমরা নিরন্তর লাভ করছি) স্বীকার না করে ঐ 'সমগ্র'কে জানতে পারবো? তাছাড়া এই দর্শন যেমন মানবিক বা ব্যক্তিক মূল্যের প্রতি সুবিচার করতে পারে নি তেমনি পারে নি বিশ্বের সমগ্রতার মূল্যের উপর সুবিচার করতে। কারণ এই দর্শন অনুসারে মূল্যগুলি হল খণ্ড অভিজ্ঞতা। অখণ্ড জ্ঞানে এই খণ্ড অভিজ্ঞতার নিজস্ব কোন অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু সর্বোচ্চ মূল্যকে সুস্পষ্ট

ভাবে স্বীকার না করে পরম সত্তার জ্ঞানলাভের কোন পথনির্দেশ করা কি সম্ভব? তার থেকে কার্যকরী পদ্ধতি হল বাস্তব জগতের জ্ঞানকে স্বীকার করে নিয়ে তার সাহায্যে পরম সত্তার জ্ঞানলাভ করার চেষ্টা করা। আমাদের অভিজ্ঞতার সেটাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক। কিন্তু ব্রহ্মবাদী দার্শনিকেরা সমগ্রের একটি শূন্য আকারের সাহায্যে সব জ্ঞান লাভ করতে চেয়েছেন এবং পরিণামে রহস্যবাদীদের মত এক নেতিবাচক সিদ্ধান্তে এসে পেঁাছেছেন। সকল ব্যক্তি-সত্তা এবং বিশ্বচরাচরের সকল কিছু পরম সত্তার অতলস্পর্শী গভীরতায় লীন হয়ে গেছে। বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির প্রকৃত জ্ঞান সম্ভব—নীতি হিসেবে অবশ্যই এটিকে একটি সুন্দর ও সঙ্গত নীতি বলতে হবে। অসীমের সঙ্গে ব্যক্তি জীবনে সংযোগ ঘটানো ধর্মেরও লক্ষ্য। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ব্যক্তি-সত্তাকে ও তার চিরন্তন মূল্যকে বিসর্জন দিতে হবে। বিপরীত পক্ষে অসীমের সঙ্গে মিলনের ফলেই ব্যক্তি তার সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে এবং জীবন অর্থবহ হয়ে ওঠে। ব্রহ্মাণ্ড ব্যক্তিজীবনকে শ্রদ্ধা করে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করে। এক অনন্ত ক্ষমতা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন সব কিছুকে সমৃদ্ধতর ও উন্নততর করতে এবং বিভিন্ন অংশগুলিকে এক সূত্রে বেঁধে এক অখণ্ড ঐক্য গড়ে তুলতে। আরও একটি বিশ্বনিয়ম এই প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে চলেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর্জীবনে চলেছে অধিকতর ব্যক্তিত্ব-পরায়ণ হওয়ার সাধনা আর সম্পূর্ণতা লাভের ক্রমাগত প্রয়াস। সর্বোচ্চ সমন্বয়কে গতিহীন, আত্মকেন্দ্রিক, আত্মনিয়ন্ত্রিত এক ব্রহ্ম হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। সেই সর্বোচ্চ সমন্বয় হল সামাজিক আত্মার গতিশীল ঐক্য। এই ঐক্যের সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয় ভালবাসা এবং পারস্পরিক বন্ধুত্বে। দু'টি জীবনের যেখানে স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা আছে কিন্তু সেই শ্রদ্ধার ফলে একজন অন্যজনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে না বরং অন্যের মধ্যে নিজেকে সার্থক হয়ে উঠতে দেখে সেখানেই বন্ধুত্ব সম্ভব। ঈশ্বর নিজেই ভালবাসা। তিনি এই রকম সমাজের প্রয়োজন বোধ করেন। অন্ততঃ খৃষ্টধর্মের এটাই শিক্ষা। ঈশ্বরের ইচ্ছা পরিপূর্ণ হয় ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা হলে। অবশ্য সেই রাজ্যে বা ঐশ্বরিক পরিবারে ঈশ্বর সর্বজনীন পিতা হবেন। এখানে ব্যক্তিসত্তা তুচ্ছ নয় বরং ঈশ্বরের সৃষ্টির জন্যেই প্রয়োজনীয়। [আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হোত যে মিছে।]

অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ অপেক্ষা ব্রহ্মবাদে যে অধিকতর সুগঠিত ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্রহ্মবাদ যেন একটা অতিকায় জলজন্তু। সে মানুষ, জগৎ, ঈশ্বর সবকিছুকে গ্রাস করে ফেলে। কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট থাকে না। থাকে কেবল ঐ জলজন্তুটি নিজে। আমরা জানি, ব্রহ্মবাদীরা নিজেরা ঐ সমৃদ্ধতর ঐক্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। সেটা ভাল। কিন্তু তাঁরা এই 'একে'র দাবিকে যতটা মর্যাদা দিয়েছেন, তার থেকে 'বহু'র প্রতি উচ্চতর মূল্যারোপ করা তাঁদের অধিকতর প্রয়োজন ছিল। এখানেও 'উচ্চতর সমন্বয়ের' প্রয়োজনীয়তা বর্তমান।

II

আমরা এখন এমন কতকগুলি মতবাদ আলোচনা করবো, যে সব মতবাদ সর্বেশ্বর ও ব্রহ্মবাদের মত 'একের দাবি' প্রতিষ্ঠা না করে বহুর দাবি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছে। এই সব মতবাদকে আমরা বহুত্ববাদ বলতে পারি। বহুত্ববাদী চিন্তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা কালে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের প্রতি আমরা লক্ষ্য রাখবো। প্রশ্নগুলি হল—ঈশ্বরের প্রতি এবং মানুষের প্রতি যে মর্যাদা আরোপ করা হয়েছে তা কি একই সঙ্গে ধর্ম-জীবন এবং দার্শনিক চিন্তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে? বহুত্ববাদ সসীম ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে কতটা সংযুক্ত এবং আমরা সেই ধারণায় কতটা সন্তুষ্ট থাকতে পারি? তাছাড়া আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, এমন কোন বহুত্ববাদ সম্ভব কিনা, যাতে কোন রকম একীকরণের প্রবণতা দেখা যাবে না। যদি কোন ঐক্যের ধারণা গ্রহণ করতেই হয়, তাহ'লে দেখতে হবে, সেই ঐক্যই কি সব কিছুর মৌলিক ভিত্তি? সব কিছু কি তারই উপর নির্ভর করছে? অথবা সে ছাড়া অন্য কোন চরম লক্ষ্য আছে যার দিকে সব কিছু ধাবিত? সবশেষে ঐ একীকরণের নীতির সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক কি?

যাঁরা জগতের অন্তর্নিহিত ঐক্য অপেক্ষা বৈচিত্র্য এবং বহুত্বে অধিকতর মুগ্ধ তাঁদের বহুত্ববাদী দার্শনিক বলে। বহুত্ববাদের ভাববাদী বা অধ্যাত্মবাদী রূপটি (বর্তমান প্রসঙ্গে যে রূপটি আমাদের আলোচ্য) স্বীকার করে যে, জগৎ অসংখ্য, মুক্ত, স্বনির্ভর ও স্বনিয়ন্ত্রিত আত্মায় পূর্ণ। ব্যক্তিসত্তা সর্বব্যাপ্ত এক পরম সত্তার প্রতিভাস মাত্র নয় (যেমন একত্ববাদীরা মনে করেন) বরং ব্যক্তি-সত্তা দিয়েই পরম সত্তা গঠিত হয়। ব্যক্তিসত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। বর্তমানের

সকল রকম বহুত্ববাদের মূল উৎস হল লাইবনিজের (Leibnitz) মোনাডতত্ত্ব (Monadology)। লাইবনিজের অসংখ্য আত্মাবাদ (monadology)কে স্পিনোজার (Spinoza) একত্ববাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা যায়। স্পিনোজা এক ও অসীম দ্রব্যে বিশ্বাসী। কিন্তু লাইবনিজ মনে করেন সসীম স্বনির্ভর অনেক দ্রব্য সম্ভব। ডেকার্ট (Descartes) ও স্পিনোজা (Spinoza) দ্রব্যকে যেমন গতিহীন হিসেবে কল্পনা করেছেন লাইবনিজ (Leibnitz) তা করেন নি। তাঁর মতে দ্রব্য স্বভাবতই গতিশীল ও সক্রিয়। এই স্বতন্ত্র, স্বক্রিয়, আত্মকণাগুলিকে লাইবনিজ নাম দিয়েছেন মোনাড (Monad)। মোনাডেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সকল মানসিক শক্তির কেন্দ্র। মানুষের আত্মার যেমন নিজের মধ্যেই নিজের ক্রিয়ার উৎস থাকে, এবং নিজের মধ্যে থেকে নিজের সমগ্র ইতিহাস ও অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে পারে, মোনাডও অনুরূপ ক্রিয়া করতে পারে। লাইবনিজের দর্শনে জড়জগৎ বলে কিছু নেই। তার জায়গায় আবির্ভূত হয়েছে বিভিন্ন আত্মার এক বিশাল সমাজের। আত্মাগুলি সম্পূর্ণতার দিক থেকে বিভিন্ন মাত্রায় বিন্যস্ত। সর্বনিম্নস্তরের আত্মাগুলি হল পদার্থ-বিজ্ঞানের ভাষায় যাদের পরমাণু বলা হয়। আর ক্রমপর্যায়ের শীর্ষস্থান অধিকারী আত্মার নাম ঈশ্বর। ঈশ্বর সব মোনাডের শ্রেষ্ঠ মোনাড অথবা বলা যায় সব আত্মার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মা। লাইবনিজ এইভাবে সকল বিশ্বকে এবং তার প্রতিটি অংশকে জীবন্ত বলে অনুমান করেন। "পদার্থের প্রতিটি অংশকে চারাগাছে ভরা একটি বাগান অথবা মাছে ভরা পুকুর বলা যেতে পারে। শুধু তাই নয় চারাগাছের প্রতিটি শাখা এবং প্রাণীদের প্রতিটি প্রাণী এবং জলের প্রতিটি বিন্দুই হল ঐ রকম বাগান বা পুষ্করিণী.........অতএব জগতে কোন পতিত বা অনুর্বর জমি অথবা মৃত কোন কিছু নেই"*। স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াই হল আত্মার প্রকৃত স্বভাব। তার ক্রিয়া বাইরের কোন কিছু থেকে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। এর থেকে প্রমাণ করা যায় যে কোন মোনাড অন্য কোন মোনাডকে প্রভাবিত করতে পারে না কিংবা পরস্পর নিজেরা প্রভাবিত হতে পারে না। লাইবনিজ এই কথাটি তাঁর বিখ্যাত একটি উক্তিতে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন, "মোনাডের কোন জানালা নেই, যা দিয়ে কোন কিছু বেরিয়ে যেতে পারে কিংবা বাইরে থেকে কোন কিছু প্রবেশ করতে পারে।" (§ 7)

* Leibnitz—Monadology §§ 67, 69

"মোনাডদের স্বাভাবিক পরিবর্তন আসে তার আভ্যন্তরীণ নীতি থেকে। কারণ বাইরের কোন কিছু তার আভ্যন্তরীণ সত্তার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না" (§ 11) "মনে হতে পারে এই মতবাদ একটা অনাসৃষ্টিতে বা নৈরাজ্যে আমাদের নিয়ে গিয়ে হাজির করবে। যত মন তত জগৎ—এই রকম একটা ধারণাই হয়ত আমরা এই মতবাদ থেকে লাভ করবো, কারণ বলা হয়েছে প্রত্যেক মোনাড নিজেরাই এক একটি জগৎ। তারা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নিকট অধীনতা স্বীকার করে না"*। কিন্তু ঐ 'ঈশ্বর ব্যতীত' কথাটির মধ্যে এমন একটি ইংগীত আছে যার সাহায্যে এই নৈরাজ্যের অবস্থা থেকে আমরা মুক্তির পথ খোঁজার চেষ্টা করতে পারি। যদিও সসীম মোনাডগুলি পরস্পর সম্পূর্ণ স্বাধীন, তারা কিন্তু পরম মোনাডের কাছে স্বাধীন নয়। তারা ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করে। ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের ফলেই তাদের মধ্যে ঐক্য ও সমতান সংরক্ষিত হয়। প্রত্যেক মোনাড প্রতি মুহূর্তে তাদের নিজস্ব, অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। তারা মুহূর্তে মুহূর্তে পরমেশ্বরকে ক্রমাগত প্রকাশ করে চলেছে। তাছাড়া একটি মোনাডে যখন পরিবর্তন হয়, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মোনাডেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে। সেইজন্য সামগ্রিক সমতা রক্ষা পায়। অতএব পরোক্ষভাবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যস্থতায় একটি সুসংহত বিশ্বতন্ত্রের সদস্য হিসেবে একটি মোনাড অন্য মোনাডের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যদিও তাদের কোন জানালা নেই তবু তারা নিজেদের মত করে বিশ্বকে প্রতিবিম্বিত করে। পূর্ব-নির্ধারিত একটা বোঝাপড়ার মাধ্যমে তারা স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে একই বিশ্বকে প্রকাশ করছে। এইভাবে ব্যাখ্যা করার ফলে জগতে নৈরাজ্যের স্থলে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হল ঠিকই, কিন্তু মোনাডদের চরম স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা বিসর্জিত হল। দেখা গেল মোনাডগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ মোনাডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে যে ঐক্য রয়েছে তাও পূর্বনির্ধারিত এবং এই নিয়ন্ত্রণও এসেছে সর্বশ্রেষ্ঠ মোনাড বা ঈশ্বরের কাছ থেকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে চরম বা অবিসম্বাদিত বহুত্ববাদ সম্ভব নয়। যদি আমাদের স্বস্তি বজায় রাখতে হয় তাহ'লে আমাদের বিশ্বের ঐক্যের দিকটিকে স্বীকার করতে হবে। একটি বিশ্ব-নিয়মে সব কিছুকে সুবিন্যস্ত করতে হবে। ঐক্যের পশ্চাৎপটে বহুত্বকে বোঝা যেতে পারে। কিন্তু চরম বহুত্বের ধারণা পরিণামে ঐক্যের আশ্রয় অনুসন্ধান করে।

* Leibnitz—Discourse on Metaphysies (§ XIV)

আমাদের এখন প্রশ্ন হল, লাইবনিজ (Leibnitz) এই বিশ্বনিয়মে ঈশ্বরের জন্য কোন্ স্থানটি নির্দিষ্ট করেছেন? বিশ্ব ঐক্যের তিনিই পরম ভিত্তিস্বরূপ। লাইবনিজ (Leibnitz) অবশ্য অনেকবার বলেছেন—ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ মোনাড। কিন্তু অন্য মোনাডের থেকে তাঁর কোন গুণগত পার্থক্য নেই, পার্থক্য কেবল মাত্রাগত। তিনিই একমাত্র সম্পূর্ণ। ঈশ্বর বিশ্বনিয়মে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছেন। তিনি এক এবং আদিম সহজ দ্রব্য। অন্যান্য মোনাডের তিনিই স্রষ্টা। তিনিই কেবল অন্য মোনাডের উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। তাই অন্যান্য মোনাডের মত তাঁর সসীম হওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। "যে সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রব্য এক, সর্বজনীন এবং নিত্য, যার বাইরে কোন কিছুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই তিনি কখনো সসীম হতে পারেন না। যতটা সম্ভব বাস্তবতা তাঁর মধ্যেই নিহিত রয়েছে।"* পরবর্তীকালে বহুত্ববাদীরা যে সসীম ঈশ্বরের ধারণার কথা বলেছেন তা অবশ্যই লাইবনিজ (Leibnitz) থেকে গৃহীত নয়। কিন্তু লাইবনিজ স্পিনোজার (Spinoza) থেকে খুব বেশি কি অগ্রসর হতে পেরেছেন? হয়ত তিনি তা পারেন নি। কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার উপর তিনি যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তার মূল্য আমরা নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারি না।

পরবর্তী বহুত্ববাদিগণ লাইবনিজের (Leibnitz) দর্শনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, তাঁরা লাইবনিজের পূর্বনির্ধারিত ঐকতানের সূত্রটিকে বাতিল করে দিয়েছেন। তাছাড়া একটি সসীম সত্তা আর একটি সসীম সত্তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না বলে লাইবনিজ যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন. তাঁরা সেটিও মেনে নিতে পারেন নি। ঈশ্বরকে কিছুটা সসীমভাবে স্বীকার করে নেবার প্রবণতা আধুনিক বহুত্ববাদীদের মধ্যে দেখা যায়। সসীম সত্তার নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, তার স্বাধীনতা প্রভৃতির দ্বারা বোঝা যায় ঈশ্বর এই সত্তাগুলির জন্য কিছুটা সীমিত হয়ে পড়েছেন। হাউইশনের (Howison) মতবাদ অনেকাংশে লাইবনিজের (Leibnitz) মোনাডবাদের অনুরূপ। কিন্তু বহুত্ববাদ সম্পর্কে তিনি কোন রকম আপোস করেন নি। তাঁর মতে, ব্রহ্মাণ্ডে যত আত্মা আছে সকলেরই স্বাধীনতা রয়েছে। তারা প্রত্যেকে আত্মনির্ভর, স্বয়ংক্রিয় এবং আত্ম-নিয়মে পরিচালিত।

* Monadology—§ 40

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কেউ তাদের বাইরের থেকে পরিচালিত করতে পারে না। এ জগতে সকল আত্মা স্বয়ম্ভু, স্বনির্ভর ও নিত্য। সকলে মিলে যেন অনন্ত আত্মার এক সাধারণতন্ত্র গড়ে তুলেছে। তার ফলে তাদের মধ্যে এক স্বতঃস্ফূর্ত ঐকতানের সৃষ্টি হয়েছে । বাইরের কোন শক্তি তাদের মধ্যে কোন রকম সম্বন্ধ স্থাপন করে দেয় না। অনন্ত আত্মার চিরন্তন সাধারণতন্ত্রে ঈশ্বরের মর্যাদার তিনি এইভাবে বর্ণনা দিয়েছেন—"আত্মসচেতন আত্মার বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি অবস্থান করেন। তিনিই ধ্রুবতারা। সব দৃষ্টি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ। সকল আত্মা থাকলে তিনি আছেন, আবার তিনি থাকলে সব আত্মা আছে। পারস্পরিক সম্বন্ধ কিন্তু অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক। তিনি ঐ বৃত্তে অনন্ত কাল থেকে অবস্থান করছেন। তাঁর লয় নেই।"

লাইবনিজের (Leibnitz) সঙ্গে সাদৃশ্য কম কিন্তু একত্ববাদের প্রতি সমান আপোসহীন মনোভাব পরিলক্ষিত হয় উইলিয়ম জেম্‌সের (William James) বহুত্ববাদের মধ্যে। তিনি যে বিশ্বের কথা বলেছেন, সেখানে বহুসত্তার অস্তিত্ব রয়েছে, এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও একত্ববাদের মত দৃঢ় নয়। অদ্বৈত দর্শনে যাকে সর্বরূপ বলে তিনি তা অগ্রাহ্য করেছেন। তার জায়গায় সত্তার প্রতিরূপে অর্থাৎ সত্তার বিক্ষিপ্ত অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী। "এমন কিছু নেই যার মধ্যে সব কিছু অন্তর্ভুক্ত হতে পারে অথবা যে সব কিছুর উপর প্রভুত্ব করতে পারে। বিশ্বের প্রতিটি অংশ অন্য অংশের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে সম্পর্কিত আবার কোন না কোন ভাবে সম্পর্কহীন"। ঈশ্বরের সসীমতার ধারণা উইলিয়ম জেম্‌সের (William James) দর্শনে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সোচ্চার। বহুধাবিভক্ত বিশ্বে ঈশ্বর অনেকের মধ্যে একজন মাত্র। তিনি এবং আমরা পরস্পর পরস্পরের বাইরেই অবস্থান করছি। আমরাও যেমন ঈশ্বরের অংশ মাত্র নয়, তেমনি ঈশ্বরও আমাদের যোগফল বা সমষ্টি মাত্র নন। কালহীন, ইতিহাসহীন ব্রহ্ম বিশ্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হল সাহসের সঙ্গে বহুত্ববাদকে স্বীকার করে নেওয়া এবং অতিমানবীয় সত্তা, তিনি যতই বিশাল হোন না কেন, তাঁরও একটা বাহ্য পরিবেশ আছে এবং স্বাভাবিকভাবেই তিনি সীমার মধ্যে আবদ্ধ—এই সত্য মেনে নেওয়া। ব্রহ্ম যদি আদৌ থাকেন (এ প্রসঙ্গে জেম্‌সকে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত মনে হয় এবং তাঁর যুক্তিকেও বেশ এলোমেলো মনে হয়) তাহ'লে তাঁকে ধর্মের ঈশ্বরের সঙ্গে কিছুতেই এক করা যাবে না। সাধারণ মানুষের ধর্ম-জীবনে সমগ্রকেই ঈশ্বর

হিসেবে গণ্য করা হয় না। ঈশ্বর একটি আদর্শপ্রবণতার নাম। সাধারণ মানুষ তাঁকে অতিমানব বলে বিশ্বাস করে। ঈশ্বরও তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের সহযোগিতা কামনা করেন এবং আমরা যদি যোগ্য হই তাহ'লে তিনি আমাদের ইচ্ছা পূরণ করেন। তিনি একটি পরিবেশের মধ্যে থেকে কাজ করেন। তাঁর সীমা আছে, শত্রুও আছে। এর অতিরিক্ত যদি ব্রহ্ম বলে কিছু থাকেন, তাহ'লে সেই ব্রহ্ম বিশ্বচরাচরের বিশালতার রূপ মাত্র। আমাদের ঈশ্বর সেই বিশ্বের সর্বাপেক্ষা আদর্শ অংশ।" বিশ্বের অন্যান্যদের কাজের সঙ্গে তাঁর কাজের সম্পূর্ণ অমিল আছে একথা ঠিক নয়। আমাদের পরস্পরের কাজের মধ্যে যেমন মিল ও অমিল থাকে, তাঁর কাজের সঙ্গেও আমাদের কাজের অনুরূপ সম্পর্ক রয়েছে। বহুসত্তার বিশ্ব কোন সাম্রাজ্য নয়। সে বিশ্ব হল এক প্রজাসাধারণতন্ত্র, যার মধ্যে অনেক স্বায়ত্তশাসন বর্তমান"*। অনুরূপ মতবাদ অত্যন্ত মনোরম ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন এইচ, জি, ওয়েল্‌স (H. G. Wells) "ঈশ্বর ব্রহ্ম নন। তিনি সসীম। সসীম ঈশ্বর তাঁর বিরাট ক্ষমতা নিয়ে সংগ্রামে লিপ্ত, যেমন আমরাও আমাদের অকিঞ্চিৎকর শক্তি নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন"† শিলারের (F. C. S. Schiller) মত প্রয়োগবাদী দার্শনিকেরাও সসীম ঈশ্বরের ধারণার সমর্থনে যথেষ্ট যুক্তি দেখিয়েছেন।

জেম্‌স ওয়ার্ডের (James Ward) *Realm of Ends (1911)* গ্রন্থে বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেলেও অধিকতর সুষম একটি মতবাদ পরিলক্ষিত হয়। ওয়ার্ডের (Ward) দর্শন লাইব্‌নিজের (Leibnitz) দর্শনের ছাঁচে গড়া। কিন্তু ওয়ার্ড (Ward) বা লোটজা (Lotza)র উপর লাইব্‌নিজের প্রভাব তত উৎকট নয়। তাঁদের নিজস্ব চিন্তাকে লাইব্‌নিজের দর্শন খুব বেশি প্রভাবান্বিত করতে পারে নি। ওয়ার্ড প্রাথমিকভাবে বহুত্ববাদকে পুরোপুরি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু আলোচনা যতই এগিয়ে গেছে ক্রমশ তাঁর বহুত্ববাদ একেশ্বরবাদী প্রকল্প গ্রহণ করেছে। মনোবিজ্ঞানী হিসেবে তিনি অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই আলোচনা আরম্ভ করেছেন। অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা কোন পরম সত্তার জ্ঞান লাভ করতে পারি না। আমরা প্রকৃতপক্ষে

* William James—A pluralistic Universe (1909), PP 34-321, 79, 310f, 124, 318, 292.

† H. G. Wells.—Mr. Britling Sees it Through, P. 397, See his God, The Invisible King, Passim.

বহু সত্তার জ্ঞান লাভ করে থাকি। "বহুত্ববাদ মনে করে বিশ্বজগৎ অসংখ্য ব্যক্তি-সত্তার দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক সত্তার ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে" (P 51) "অনেক রকম আত্মা আছে। কোন আত্মা আমাদের থেকে উন্নততর আবার কোন কোন আত্মা আমাদের আত্মা থেকে অনুন্নত। কিন্তু উন্নততম বা সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, তাহলে সেই আত্মাকে অনেকের মধ্যে একটি বলে অনুমান করতে হবে। অবশ্য সে আত্মা এমন কোন আত্মা নয় যে সব কিছুকে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।"

অসংখ্য মুক্ত সত্তার যৌথ সৃষ্টি হল এই বিশ্বসংসার। তারা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেদের সুন্দর করে, সম্পূর্ণ করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। এই অসংখ্য সত্তা কাজ করছে বাস্তব কালের মধ্যে। স্থিতি, পরিবর্তন বা অভিব্যক্তি এই কালের অন্তর্ভুক্ত। অভিব্যক্তিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হচ্ছে না। অর্থাৎ যা ছিল সুপ্ত বা অপ্রকট তারই প্রকট হয়ে ওঠা বা বিকশিত হওয়াকেই কেবল অভিব্যক্তি বলে না। অভিব্যক্তিকে নতুন সৃষ্টি হিসেবেও গ্রহণ করা হয়। [বের্গস'র (Bergson) সৃজনশীল অভিব্যক্তির সঙ্গে তুলনীয়]। অভিব্যক্তির ফলে নতুন গুণ ও নতুন মূল্যের সৃষ্টি হয়। কালহীন ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য হিসেবে গ্রহণ না করে এখানে কালের মধ্যে ঘটমান সত্তার ঐতিহাসিক বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু জগতে চরম ঐক্য ও সমতার নিশ্চয়তা লাভের জন্য ওয়ার্ড (Ward) বের্গস (Bergson) প্রভৃতিদের ছাড়িয়ে গেছেন। বের্গস'র (Bergson) মতে অভিব্যক্তির কোন লক্ষ্য নেই। কোন উদ্দেশ্য দ্বারা অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত নয়। কিন্তু ওয়ার্ড (Ward) মনে করেন, ইতিহাসেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে বিকাশের ধারাটি চলেছে ক্রমশঃ ঐক্য ও সমতানের দিকে এবং ব্যক্তি লক্ষ্যের ঊর্ধ্বে কিছু একটা লক্ষ্য করে। অভিব্যক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্যটি যখন আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে তখন আমরা দেখতে পাবো, সেটা কোন পূর্বনির্ধারিত ঐকতান নয়, বরং ঘটনাচক্রে গড়েওঠা একটি সম্পূর্ণ সাধারণতন্ত্র। এই সাধারণতন্ত্রে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহযোগিতা করে, কারো সঙ্গে কারো দ্বন্দ্ব নেই। সেখানে অনেকে একে পরিণত হতে পারে, একটি লক্ষ্য সকলের হয়ে উঠতে পারে। সকল লক্ষ্যের পরিণতি তখন একটিমাত্র রাজ্যে। বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পেছনে কোন রকম ঐশ্বরিক ক্রিয়া নেই।

ওয়ার্ড (Ward) এখানে বহুত্ববাদীদের (বিশেষ করে উইলিয়ম জেম্‌সের) সীমা অতিক্রম করেছেন। উইলিয়ম জেম্‌সের (William James) বহুত্ববাদে এমন কোন নিশ্চয়তার কথা নেই যে সব কিছুর পরিণতি শুভ হবে। বহুত্ববাদ পরম ঐক্য ও সমন্বয়ের কোন নিশ্চয়তার কথা বলে না। এই অভাববোধ ওয়ার্ডকে ঈশ্বরবাদে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছে। ওয়ার্ড বলেছেন—এখন আমাদের বহুর ধারণা থেকে অধিকতর মৌলিক ধারণাটি বোঝার চেষ্টা করতে হবে, বুঝতে হবে সেই এককে যিনি এক সময় ভাবগত এবং উদ্দেশ্যগত ঐক্যের নিশ্চয়তা দান করতে পারেন। অর্থাৎ এমন একটি ধারণাকে বুঝতে হবে যে ধারণা বহুর ধারণার একমাত্র উৎস এবং যা সকল পরিণতির পরিণতি। জগৎকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং সময়, ইতিহাস এবং প্রগতির অর্থ বুঝতে ঈশ্বরের ধারণার প্রয়োজন আছে। এখন ওয়ার্ডের (Ward) বহুত্ববাদকে ঈশ্বরবাদী বহুত্ববাদ আখ্যা দিতে পারা যায়। কিন্তু যদিও ঈশ্বর বিশ্বের কারণ এবং যদিও তিনি বিশ্ব স্রষ্টা, তাহ'লেও তাঁর সৃষ্টি দ্বারা তিনি সুনির্দিষ্ট। কারণ ঈশ্বরের গড়া বিশ্বেও অনেক স্রষ্টা রয়েছে। তারা নিজেরা সৃষ্টি করে চলেছে। তাদের উদ্যোগ আছে এবং স্বাধীন ইচ্ছা আছে। এই সীমাবদ্ধতা অবশ্য ঈশ্বরের স্বেচ্ছারোপিত। বাইরের কোন শক্তি ঈশ্বরকে সসীম করে তোলে নি। "তার অর্থ হল একটি সজীব বিশ্বের সঙ্গে রয়েছেন এক সৃজনশীল ঈশ্বর। তিনি মায়া মৃত্তিকা নির্মিত জগতের কুম্ভকার মাত্র নন। অথবা তিনি কোন দুর্জ্ঞেয় বিমূর্ততাও নন। তিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে এবং তার কোন অর্থ হয় না বলেই তিনি অসীম বা অনন্ত নন।" (P 444)

বহুত্ববাদের সমালোচনা এবং এবিষয়ে আমাদের অভিমত অমরা আপাতত পরবর্তী (শেষ) অনুচ্ছেদের জন্য জমা রাখছি। হেস্টিংস্‌ রাসডালের (Hastings Rashdall) ঈশ্বরবাদী বহুত্ববাদের আলোচনা করার মত আমাদের আর জায়গা নেই। (তাঁর মতে ব্রহ্ম কেবলমাত্র ঈশ্বর নয়। ঈশ্বর এবং অন্যান্য আত্মা মিলে একটি ঐক্যতন্ত্র গঠিত)। অথবা আমরা ম্যাকট্যাগার্টের (J. E. Mc Taggart) নিরীশ্বরবাদী বহুত্ববাদের আলোচনাও করতে পারছি না। (তাঁর মতে ব্রহ্ম হল আত্মিক ঐক্য। অনেকটা আমাদের সমাজের মত। কিন্তু সেখানে ঈশ্বরের কোন প্রভুত্বও নেই বা প্রধান ভূমিকাও নেই)। তাছাড়া বর্তমান যুগের গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক আন্দোলনের প্রসঙ্গও আমরা উল্লেখ করতে পারলাম না। যদিও

উপরি-উক্ত পদ্ধতিগুলির মত সেগুলি বহুত্ববাদ নয় তবুও এই মতবাদগুলির সঙ্গে তাদের একটি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে। এই সব দার্শনিক মতবাদগুলি সময়, অভিব্যক্তি, ইতিহাস, প্রগতি প্রভৃতির অপরিসীম গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। অভিব্যক্তি, ইতিহাস, প্রগতি প্রভৃতিকে প্রাচীন অদ্বৈতবাদ এবং ভাববাদ মনে করত কালহীন, অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মের প্রতিভাস মাত্র। আমরা বেগস'র (Bergson) বাস্তব সময়-সম্পর্কিত মতবাদের উল্লেখ করছি। তাঁর মতে সময়ই সত্তার মৌলিক বিষয়। তাঁর মতবাদের সঙ্গে নব্য-বস্তুবাদ এবং নব্য-ভাববাদের সাদৃশ্য আছে। জগতের চরম বৈশিষ্ট্য হিসেবে সকলেই কাল, পরিবর্তন, প্রগতি প্রভৃতিকে স্বীকার করেছেন। নব্য-বস্তুবাদী দার্শনিক আলেক্জাণ্ডার (S. Alexander) এবং ইটালীর ক্রোচে (Croce) এবং জেন্টিলের (Gentile) বস্তুবাদ এবং ভাববাদের চরম বিপরীত দিকগুলির মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপন বর্তমান দর্শনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়। তাঁরা মনে করেন বিশ্ব হল ক্রমাগত পরিবর্তনের ইতিহাস। কালের এই বিবর্তনের বাইরে অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ইংরেজ দার্শনিক বোসাঙ্কে (Bosanquet) একত্ববাদে বিশ্বাসী। তিনি আধুনিক চিন্তার চরম বিরোধী। তিনি বলেন,—যেহেতু ব্রহ্মের মধ্যেই সময় রয়েছে, সেইজন্য সময়ের মধ্যে ব্রহ্ম থাকতে পারে না। সময়ের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক, অথবা পরম সত্তার সম্পর্ক অথবা ব্রহ্মের সঙ্গে গতি ও ইতিহাসের সম্পর্ক—প্রভৃতি সমস্যাগুলির, আমরা বর্তমানে যে প্রসঙ্গে আলোচনা করছি [ঈশ্বর ও ব্রহ্মের সম্পর্ক] তার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। অর্থাৎ ঈশ্বরের ধর্মীয় ধারণার সঙ্গে ব্রহ্মের দার্শনিক ধারণার সম্বন্ধ এবং তার সঙ্গে ঈশ্বরের সসীমতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সমস্যা—এই প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত। আমরা এখানে কেবলমাত্র বর্তমানের উল্লেখ-যোগ্য মতবাদগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম মাত্র।

III

একত্ববাদ এবং বহুত্ববাদ-সম্পর্কিত আলোচনার এবার আমরা ছেদ টানছি। সেই সঙ্গে এই প্রসঙ্গে আমাদের অভিমতও প্রকাশ করছি। আগে যা বলা হয়েছে তা থেকে এ অনুমান করা যেতে পারে যে সর্বগ্রাসী এক ব্রহ্মের ধারণা অপেক্ষা আমরা বহুত্ববাদের প্রতি কিছুটা বেশি সহানুভূতি দেখিয়েছি। তার ফলে বিশ্বনিয়মের মধ্যে সসীম সত্তার একটা জায়গা হয়েছে, তার কিছুটা স্বাধীনতাও স্বীকৃত হয়েছে এবং একটি সসীম সত্তা স্বাধীনভাবে যে ঈশ্বরের

সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে তাও স্বীকার করা হয়েছে। জগতের ঐক্যের জন্য একত্ববাদী নীতিকে এমনভাবে পরিবর্তিত করতে হবে যার ফলে ব্যক্তিমানুষের অধিকার ও মূল্যবোধ যেন রক্ষিত হয় এবং কালিক জগতে তার উদ্দেশ্য-পূর্ণ কাজকর্মের যেন অধিকার থাকে। ব্র্যাডলে (Bradley) তাঁর *Appearance and Reality* গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় বলেছেন—পরম সত্তা আধ্যাত্মিক। কেবল এই একটি কথাকেই গুরুত্ব দিলে চলবে না। বিশ্বনিয়মের মধ্যে ব্যক্তির মূল্য-বোধকেও স্বীকার করে নিতে হবে। যদি ঈশ্বরকে একটি গতিহীন আত্মসন্তুষ্ট সত্তা হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তিনি যদি একেবারে গতিশীল না হন এবং ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় ব্যর্থ হন তাহ'লে কেবল ঈশ্বরকে পরম সত্তার সঙ্গে এক করে দিলেই সমস্যা মিটে যাবে না। প্রকৃত দর্শনের এবং ধর্ম-চেতনায় এমন একজন ঈশ্বরের প্রয়োজন যিনি জগতের সকল প্রচেষ্টার মধ্যেই সক্রিয় থাকবেন এবং সেইসঙ্গে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তিসত্তার যে কেবল সহযোগিতাই গ্রহণ করবেন তাই নয়, সহযোগিতা করার জন্য ব্যক্তিসত্তাকে তিনি যথেচ্ছ উদ্বুদ্ধও করবেন। যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, যিনি নিজের অস্তিত্ব ভিন্ন অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব রাখেন না, এবং যিনি তাঁর নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছার অস্তিত্বও অবশিষ্ট রাখেন না, তেমন সর্বগ্রাসী ঈশ্বরের আমাদের প্রয়োজন নেই।

অবশ্য সেইসঙ্গে একজন ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তির সঙ্গে যেভাবে সম্পর্কিত ঠিক সেইভাবে মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যেও সম্বন্ধ রয়েছে এই সিদ্ধান্তটিকেও সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। গণতন্ত্রী সরকারের যেমন একজন নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী থাকেন ঈশ্বরও সেই রকম, তাঁরই মত অনেকের মধ্যে প্রধান, একথা দর্শন বা ধর্ম কারুর পক্ষেই যথেষ্ট নয়। যদিও তাঁকে প্রধান বলা হয়েছে, তবুও তাঁকে একই শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। ঈশ্বরকে অন্যানদের সঙ্গে একই শ্রেণীভুক্ত করা সঙ্গত নয়। তাঁকে একটি বিরাট শৃঙ্খলের একটি টুকরো হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। যদিও সেই টুকরোটিকে অনেক বেশি মজবুত ও অনেক বৃহৎ বলে অনুমান করা হয়েছে, তবুও এই অনুমানটি গ্রহণীয় হতে পারে না। জেমসের (W. James) মত তাঁকে অন্যান্য সব কিছুর মত একটি হিসেবে গণ্য করা, বা অন্য সকলের মতই তিনি কাজ করছেন অনুমান করা, অথবা হাউইশনের (Howison) মত তিনি অন্যান্য আত্মার সঙ্গে অনন্তকাল থেকে সহ অবস্থান

করছেন, এবং সকল আত্মা নিজের ক্ষমতা বলেই তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে—এইসব চিন্তা ঈশ্বরের বিশিষ্টতা নষ্ট করে। কিন্তু ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এবং জগতের ঐক্যের বৌদ্ধিক বিশ্লেষণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তিনি যেমন মানুষের সগোত্রীয়, তেমনি তাঁর একটি বিশেষত্বও আছে। সকল জীব ও সকল সত্তার তিনিই উৎস এবং তিনিই বিশ্বনিয়ন্তা। সৃষ্টির যে অর্থই করা হোক না কেন, সৃষ্টিকে সময়ের একটি কাজ হিসেবে গ্রহণ করা হবে, (শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে—একটি জনপ্রিয় মতবাদ) না একটা ধারাবাহিক পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হবে? (যাতে ঈশ্বরকে যেমন স্রষ্টা হিসেবে গণ্য করা হবে তেমনি তাঁকে জগতের ধারক ও বাহক হিসেবেও গণ্য করা হবে। যেমন প্রাচীন উদ্দেশ্যবাদীরা ঈশ্বরের সৃষ্টির কাজকে তাঁর ধারণ ও সংরক্ষণের কাজ থেকে পৃথক করতেন না)। সে যে ভাবেই গ্রহণ করা হোক না কেন, জগতের ঐক্যকে, এমনকি অস্তিত্বকে নষ্ট না করে, কিভাবে ঈশ্বরকে স্রষ্টার মর্যাদা দেওয়া হবে সেটাই একটা জটিল প্রশ্ন। ঈশ্বর স্রষ্টা এই ধারণা নির্ভর করে দু'টি জিনিসের উপর—(এক) তিনি জগতকে নিজের অজস্র অংশ দান করবেন (অথবা অজস্র অংশে বিভক্ত হয়ে জগতে ছড়িয়ে যাবেন)—(দুই) জগৎ তার অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করবে। তাহলেই আমরা ঈশ্বরকে একটি অফুরন্ত সৃষ্টির উৎস হিসেবে গণ্য করতে পারবো।

ঈশ্বর থেকেই সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে আমরা বাস করছি, হাঁটা-চলা করছি, জীবন যাপন করছি—এর সব কিছুর স্রষ্টা ঈশ্বর। ঈশ্বর জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকলেও তিনি জগতের সঙ্গে অভিন্ন নন। জগতের সকল সম্পদ ও সকল শক্তির তিনি অনন্ত ঝর্ণাধারা। যে চিরন্তন মূল্য ও আদর্শ মনুষ্য প্রগতির লক্ষ্য ঈশ্বর তাদেরও উৎস। চরম বহুত্ববাদ জগতকে স্বতন্ত্র কতকগুলো টুকরো টুকরো জগতে ভেঙ্গে ফেলে। কিন্তু বুদ্ধি নির্ভর বহুত্ববাদ (অর্থাৎ যা যথার্থ একত্ববাদ দ্বারা সংশোধিত) একটি সাধারণ বাস্তব জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে। সেই জগতই মানুষের কর্মক্ষেত্র। এই বহুত্ববাদ একটি প্রাকৃতিক নিয়ম এবং একটি নৈতিক নিয়মের অস্তিত্বও স্বীকার করে। এই নিয়মগুলি কোন বিশেষ ব্যক্তির চিন্তা নয় অথবা যৌথ চিন্তাও নয়। কিছু ব্যক্তিকে কাজ করতে গেলে এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক রাখতে গেলে এই নিয়মগুলি তার অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে ব্যক্তির অবশ্যই

স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু যে জাগতিক নিয়মকে শর্ত হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে ব্যক্তিকে কাজ করতে হয়, সেই বাস্তব জগতের নিয়মে তার স্বাধীনতা সংযত ও নিয়ন্ত্রিত। একটা নির্দিষ্ট পরিবেশেই ব্যক্তিকে কাজ করতে হয়। তা না হলে তার কাজকে স্বাধীনতা বলা যেত না, বলতে হত যথেচ্ছাচার বা উচ্ছৃংখলতা। নৈতিক ও বৌদ্ধিক ক্রিয়ার শর্ত হিসেবে একটি বিশ্বাসযোগ্য এবং স্থায়ী পরিবেশের প্রয়োজন। সাধারণ পরিবেশের স্রষ্টা ঈশ্বর। ঈশ্বর সৃষ্ট পরিবেশ হল নিয়ম ও শৃংখলার রাজ্য। জগতের উৎপত্তি হয়েছে এক সৃজনশীল বৌদ্ধিক আত্মা থেকে, একথা স্বীকার করে নিলে, জগতে যে নিয়ম ও শৃংখলা রয়েছে তা প্রমাণ করা বেশ সুবিধাজনক হয়ে ওঠে।

মানুষের স্বাধীনতাকে যদি আমরা প্রাকৃতিক, সামাজিক ও নৈতিক অনুশাসনে সীমাবদ্ধ বলে মেনে নিই, তাহ'লে ঈশ্বরের স্বাধীনতা সম্পর্কে আমরা কি বলব? তাঁর সৃষ্ট জগতের দ্বারাই কি তাহ'লে তিনি সীমাবদ্ধ? বিশেষতঃ ঈশ্বর যখন অনেক ব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারও প্রদান করেছেন, তার ফলে কি তাঁর নিজের স্বাধীনতা খর্ব হয়ে যায় নি? আমরা ইতিপূর্বে যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছি তাতে ঈশ্বরের উপরেও কিছুটা প্রাকৃত নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বরের উপর এই নিয়ন্ত্রণ বাইরের অন্য কোন ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নয়। বাইরের কোন ক্ষমতা ঈশ্বরের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে নি। এই নিয়ন্ত্রণ আভ্যন্তরীণ, স্বেচ্ছাকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণ। এক দিক থেকে এই নিয়ন্ত্রণ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ; অন্যদিকে এটাকে তাঁর ক্ষমতার প্রকাশও বলা চলে। এমন কিছুই থাকতে পারে না. এমনকি ঈশ্বরও নন যিনি শর্তনিরপেক্ষভাবে সর্বশক্তিমান। মানুষের জীবনেও যেমন অসম্ভবের স্থান আছে, ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও অসম্ভাব্যতা বর্তমান। সর্বশক্তিমান হলেই অসম্ভব কিছু করে ফেলা যায় না। ঈশ্বর এমন কিছু করতে পারেন না যার সঙ্গে তাঁর নৈতিক ও বৌদ্ধিক প্রকৃতির অসঙ্গতি ঘটতে পারে। তিনি অংশকে সম্পূর্ণের সঙ্গে সমান করে দিতে পারেন না, অথবা 'আছে' ও 'নেই'কে একই সঙ্গে সত্য করে দিতে পারেন না। তিনি বৃত্তকে বর্গক্ষেত্র করে দিতে কিংবা সত্যকে মিথ্যা অথবা মিথ্যাকে সত্য করে দিতে পারেন না। দুই এবং দুই-এর যোগফল চার হয়, পাঁচ হতে পারে না—এই ঘটনা এক অর্থে অনন্তের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে কিন্তু অন্য অর্থে প্রমাণ করে যে ঈশ্বর তাঁর

বাইরের কোন সত্তা বা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নন। যে জগতে তাঁর প্রকৃতির প্রকাশ, সেই জগতের দ্বারা তিনি নিয়ন্ত্রিত। যে সত্তা সম্ভব অসম্ভব সব কিছু করতে পারে তার কোন নির্দিষ্ট গুণ নেই, প্রকৃতি নেই এবং কোন নির্দিষ্ট চরিত্রও নেই। আত্মনিয়ন্ত্রণ দুর্বলতা নয় ক্ষমতার প্রকাশ। যে ঈশ্বর দায়িত্বজ্ঞানহীন যথেচ্ছ ক্ষমতার অধিকারী, যাঁর কোন লক্ষ্য নেই, পরিকল্পনা নেই, সংযম নেই, তিনি শ্রদ্ধার দাবি করতে পারেন না, উপাস্যও হয়ে উঠতে পারেন না। যে ক্ষমতা যুক্তি ও প্রেমের শাসনে সংযত, সেই ক্ষমতাকেই ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলে। সেই ক্ষমতাই প্রশংসার যোগ্য। যে ঈশ্বর এইভাবে আত্মনিয়ন্ত্রিত এবং নিজের বুদ্ধি আত্মসংঘটিত ও নৈতিক উদ্দেশ্যের দ্বারা নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যেই কাজ করে থাকেন তাঁকে প্রকৃত অর্থে সসীম ঈশ্বর বলা যায় না। তিনি নিয়ন্ত্রিত এই অর্থে যে তিনি বিশ্বনিয়মকে মেনে নেওয়া পছন্দ করেন। এই বিশ্বই হল তাঁর আত্ম-প্রকৃতি ও স্বভাবের প্রকাশ। যদি আমরা মানুষের তুলনা দিই, তাহ'লে তাঁকে আমরা সাংবিধানিক রাজা বলতে পারি। তিনি নিজে সংবিধান রচনা করেছেন, তিনিই সেই সংবিধানকে সংরক্ষণ করেছেন এবং সর্বদা সেই সংবিধানকে মান্য করে চলেছেন। দায়িত্বজ্ঞানহীন যথেচ্ছাচারী শাসকের মত তাই তিনি খেয়াল খুশিমত কিছু করে ফেলতে পারেন না। সেই সংবিধান কোন আরোপিত শর্ত নয়: তার মধ্য দিয়েই রাজার প্রকৃতি বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এর থেকে ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সম্পর্কই যে কেবল বোঝা যায় তাই নয়, মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কটিও এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা বুঝতে পারি। মানুষই একমাত্র নৈতিক প্রাণী। ঈশ্বর নিজের পছন্দমত নিজের মত করে মানুষ গড়েছেন। জন্ম থেকে চরিত্র পাওয়া যায় না। ধীরে ধীরে চরিত্র গড়ে ওঠে। এই চরিত্র গঠন অন্তর থেকে হয়। বাইরের কোন কিছু দিয়ে চরিত্র গঠন সম্ভব নয়। চরিত্রের উপাদান এবং চরিত্র বিকাশের নিয়ম ও শর্তগুলি অপরিবর্তনীয়। এই নিয়ম ও শর্তগুলিকে আমরা তৈরী করতে পারি না। এগুলি প্রদত্ত ও সুনির্দিষ্ট। প্রকৃত স্বাধীনতা কথাটির অর্থই হল তার মধ্যে একটা নিয়ন্ত্রণ থাকবে। স্বাধীনতা মানে 'বাধা বন্ধনহীন কোন অবস্থা নয়। সীমার মধ্যেই অসীম। বন্ধনের মধ্যে মুক্তি। নিয়মানুবর্তিতার মধ্যেই প্রকৃত স্বাধীনতা। মানুষের স্বাধীনতা যদি প্রকৃত স্বাধীনতা হয়, অর্থাৎ এই স্বাধীনতা যদি ভ্রম

বা মিথ্যা না হয়, তাহলে মানুষের স্বাধীনতা বিষয়ে ঐশ্বরিক নিয়ন্ত্রণকে একটু ভিন্নভাবে দেখতে হয়। ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতাটিকে মানুষের রাজত্বে এনে যেন একটু সংযত করে ফেলেছেন। সেখানে তিনি আপেক্ষিক স্বাধীনতা মেনে নিয়েছেন। যার ফলে মানুষের উদ্যোগ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা বস্তুতপক্ষে ঈশ্বরের দান। ঐশ্বরিক ইচ্ছা ব্যতীত মানুষ এই স্বাধীনতা লাভ করতে পারত না। অতএব মানুষের স্বাধীনতা ঈশ্বরকে সসীম করে তুলতে পারে না। ঈশ্বরের শক্তি ও ভালবাসার প্রমাণই হল মানুষের এই স্বাধীনতা।

"ঈশ্বরই সব, মানুষ কিছু নয় ; / ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই মানুষ জন্ম লাভ করে। / ঈশ্বরের থেকে মানুষ অল্প কিছুটা / দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। এই দূরত্বটুকুও / ঈশ্বরের সৃষ্টি। এর ফলে তাঁর নতুন / সৃষ্টি তাঁকে ভাল করে দেখার / সুযোগ পায়। (বিশাল কিছুকে / দেখতে হলে আমরা যেমন কিছুটা দূরে / সরে যাই)। মানুষের / বুদ্ধি ও অনুভূতি, কিংবা / বলা যেতে পারে তার মস্তিষ্ক ও / অন্তঃকরণ ঈশ্বরেরই দান। কিন্তু / মানুষ চিরকাল এই দানকে / নিজের করে রাখতে পারে।"*

এই কথাগুলি একদিক থেকে ঈশ্বরের প্রাধান্য এবং তাঁর বৈচিত্র্যকে যেমন প্রকাশ করেছে, অন্যদিকে মানুষের আপেক্ষিক স্বাধীনতা এবং স্বনির্ভরতা যে ঈশ্বরেরই আত্মসংযমের ফল, তা প্রকাশ করেছে। অবশ্য এটি কাব্যের ভাষা। তাই যৌক্তিক গঠন এখানে অনুপস্থিত। কিছু কিছু শব্দের দ্বারা যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের অতিবর্তী সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি অন্য কতকগুলি শব্দ প্রয়োগের ফলে ঈশ্বরের অন্তর্বর্তিতা প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে। অন্তর্বর্তিতার ধারণাটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। ঈশ্বরের দান সাধারণ একজন দাতার দান নয়। কারণ দাতা দান করেই মুক্ত এবং তৃপ্ত। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে কেবল স্বাধীনতা দানই করেন নি, তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন। তিনি সর্বদা মানুষের অন্তরে থেকে মানুষকে উৎসাহিত করছেন ও পথ প্রদর্শন করছেন। আমরা যদি আমাদের আধ্যাত্মিক মূল্যগুলিকে রক্ষা করতে চাই এবং মানুষের ব্যক্তিত্বের পবিত্রতাকে রক্ষা করতে চাই, তাহ'লে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে ঈশ্বর মানুষের মধ্যে সতত বিরাজমান এবং সর্বদা সক্রিয়। তিনি উদ্দাম বল্গাহীন কোন শক্তি নয়। সত্য শিব ও সুন্দরকে লাভ করার জন্য তিনি আমাদের মধ্যে থেকে ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

---

* রবার্ট ব্রাউনিং (R. Browning) 'Christmas Eve.'

ঈশ্বর পরমতম সত্তার সঙ্গে অভিন্ন কিনা এই প্রশ্নের উত্তর আমরা যা বলেছি তার মধ্যেই নিহিত আছে। যদি ব্রহ্ম বলতে সমগ্র সত্তার সমষ্টি বোঝায় তাহ'লে সোরলে (Sorley) যেমন বলেছেন, "ঈশ্বর ব্রহ্মের সঙ্গে এক হতে পারেন না। কারণ বাস্তবে এমন অনেক কিছু আছে যার মধ্যে ঈশ্বরের কোন স্বরূপ প্রকাশ পায় না। এমন অনেক ঘটনা ঘটে এবং এমন অনেক কাজ আমরা করে থাকি, যেগুলিকে ঈশ্বরের প্রকাশ বলা যায় না। সেই সব কাজ বা ঘটনার সঙ্গে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেরও কোন সঙ্গতি নেই [যেমন মিথ্যা, কদর্যতা ও অমঙ্গলের বাস্তব অস্তিত্ব থাকলেও এগুলি দিয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ পায় না।] অতএব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ কিছুর যোগফলকে ঈশ্বর বলা যাবে না অথবা তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নও নন। বিপরীত পক্ষে যে সত্তা থেকে সবকিছু উৎপন্ন হয়, যে সত্তা সব সময় সবকিছুর মধ্যে উপস্থিত থাকে, এবং যে সত্তাতে সবকিছুর চরম পরিণতি, ব্রহ্মকে যদি সেই রকম কোন সত্তা হিসেবে গ্রহণ করা যায়, তাহ'লে ঈশ্বরই কেবল সেই চরম সত্তা হতে পারেন। চরম সত্তার থেকে ছোট কোন কিছুকে ঈশ্বরের মত যেমন উপাসনা করা যায় না, তেমনি জগতের দার্শনিক ব্যাখ্যাও তার দ্বারা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ঈশ্বরের বাইরে কোন কিছু নেই বলার অর্থ হল, তাঁর সত্তা এবং ইচ্ছার উপর ঈশ্বরের সম্পূর্ণ স্বধীনতা আছে। সসীম সত্তার স্বাধীনতা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা। ঈশ্বরের ইচ্ছায় মানুষ সেই স্বাধীনতা লাভ করে। আমরা যদি মনে করি ঈশ্বর আত্ম-সংযমে রাজি নন তাহ'লে এই ঘটনাই তাঁর ক্ষমতাকে সসীম করে তুলবে।"* ঈশ্বরই পরম সত্তা। কিন্তু তাকে ব্রহ্ম বলা ঠিক হবে না। তাতে জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিছু কিছু একত্ববাদী দার্শনিক ব্রহ্মকে যেমন শান্ত ও নিরাসক্ত ভাবেন, ঈশ্বর তেমন নন। তিনি জগতের ঝঞ্ঝাট ঝামেলা থেকে দূরে কোন এক নিরাপদ আশ্রয়ে দ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে বসে নেই। তিনি ভাল ও মন্দের ঊর্ধ্বে থেকে সমানভাবে তাদের সহ্য করে নেন না। তিনি সজীব ঈশ্বর। ইতিহাসের সঙ্গে এবং কালের গতির সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগা-

* See W. R. Sorley, Moral Values and the Idea of God. (1918), PP 475-493. এই বইটি এবং Pringle-Pattison-এর Idea of God বইটিতে বর্তমান লেখকের অপরিসীম আস্থা। তিনি মনে করেন তাঁর অভিমত সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই দুইটি পুস্তকে।

যোগ রয়েছে। তিনি ধার্মিকদের পক্ষ গ্রহণ করে অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। তিনি আমাদের অন্তরঙ্গ সঙ্গী। তিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। তিনিই পারের কাণ্ডারী। জগতের পাপের জন্য ঈশ্বর কষ্ট পান, উদ্বেগ বোধ করেন। তাঁর হৃদয়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকা। তাঁর এই যন্ত্রণা ভোগই মুক্তিলাভের পথ প্রদর্শন করে। তিনি জগতের মুক্তিদাতা। অগাস্টাইন (Augustine) দীর্ঘদিন আগে বলেছিলেন, ঈশ্বরই প্রেম। প্রেম কথাটির মধ্যেই নিহিত আছে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের অস্তিত্বের ধারণা। অগাস্টাইন (Augustine) এবং অন্যান্য খৃষ্টধর্মতাত্ত্বিকেরা যে মনে করতেন—ঈশ্বরই হলেন এক অনন্ত এবং অত্যাবশ্যকীয় সমাজ, আমরা সে প্রসঙ্গে এখানে আলোচনা করছি না। সম্ভবতঃ এটুকু বললেই এখানে যথেষ্ট হবে—ঐশ্বরিক কর্যাবলীর লক্ষ্য হল একটি আদর্শ সমাজ গঠন করা। সেই আদর্শ সমাজের ধারণাকে বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন—ঈশ্বরের নগর, ঈশ্বরের রাজ্য প্রভৃতি। কিন্তু সব থেকে অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পেয়েছে 'ঈশ্বরের সংসার' কথাটির মধ্য দিয়ে। উদ্দেশ্যে, বন্ধুত্বে এবং ভালবাসায় যখন সকল আত্মা এক হয়ে যায়, তখন তাদের মধ্যে একটা অধ্যাত্মিক ঐক্য গড়ে ওঠে। সেই ঐক্য কিছু কিছু অদ্বৈতবাদী দার্শনিকের আত্মসন্তুষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্রহ্মের উষর ঐক্য অপেক্ষা এবং কিছু কিছু ধর্মতাত্ত্বিকের আত্মকেন্দ্রিক ঈশ্বর অপেক্ষা সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে।

লাইবনিজ (Leibnitz) তাঁর মোনাডবাদের শেষে এই একই কথা বলেছেন। "অতএব আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে সমর্থ। ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক হবে, একজন যন্ত্র আবিষ্কারকের সঙ্গে আবিষ্কৃত যন্ত্রের যেমন সম্পর্ক তেমন নয়, রাজার সঙ্গে প্রজার যেমন সম্পর্ক থাকে অথবা পিতার সঙ্গে পুত্রের যা সম্পর্ক, ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক অনেকটা সেই রকম। সমস্ত আত্মার সমষ্টি নিয়ে ঈশ্বরের নগর গঠিত হয়—এরকম একটি সিদ্ধান্ত করা সহজ। কিন্তু একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাটের অধীনেই কেবল একটি সার্থক সামাজিক অবস্থা গঠিত হতে পারে। যে ঈশ্বরের নগরে চিরন্তন রাজতন্ত্র রয়েছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যে সেটাই হল নৈতিক জগৎ। প্রকৃতির ভৌত রাজ্যের সঙ্গে ঈশ্বরের নৈতিক রাজ্যের সম্পূর্ণ সঙ্গতি রয়েছে। অর্থাৎ ঈশ্বর এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের যেমন স্রষ্টা, আত্মিক জগতেরও তেমনি তিনি সম্রাট। (§ 84-87) ঈশ্বরের পিতৃ-সুলভ সার্বভৌমত্বের অধীনে আত্মাদের পারস্পারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি আত্মিক

সমাজ গঠনের কাজ শেষ হয়ে গেছে, এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। বরং ঈশ্বরের নির্দেশে বিবর্তনের পথ ধরে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা চলছে, এটাই হল প্রকৃত ঘটনা। একইভাবে পল (Paul)ও বলেছেন—ঈশ্বর সব কিছুকে একত্র সংগ্রহ করতে পারেন। স্বর্গে মর্তে যেখানে যা কিছু আছে, তা তিনি এক খৃস্টের মধ্যে একত্রিত করতে পারেন। কোন মানুষ বা কোন জাতি তখন ঈশ্বরের সংসারে বিদেশী বা আগন্তুক হয়ে থাকবে না। তারা সাধুদের সঙ্গে একই নাগরিক মর্যাদা লাভ করবে (Eph i 10 ii 19) যীশুও এই পূর্ণতাই কামনা করতেন। তিনি প্রর্থনা করতেন—"সকলে এক হোক। পিতা তুমি আমার মধ্যে আছ, আমি তোমার মধ্যে আছি" (John XVII. 21)। সর্বেশ্বরবাদীরা যে ভাবে ভেবেছেন সে ভাবে নয়, এই ভাবেই কেবল ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলা যায়।*

---

* ব্রহ্ম শব্দটির ভারতীয় দর্শনে যদিও সুনির্দিষ্ট একটি অর্থ আছে, কিন্তু এই অধ্যায়ে পরমতম সত্তা ও ব্রহ্ম শব্দ দুটিকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

ঈশ্বরকে এক ও সর্বশক্তিমান ভাবলে তাঁকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে হতে পারে। তা না'হলে তাঁকে সসীম ভাবতে হয়। সীমা বা বাধা না থাকলে শক্তির কোন মানে হয় না। প্রশ্ন হল কোন্ বাধায় ঈশ্বর সীমাবদ্ধ। কোন্ বাধাকে অতিক্রম করার জন্য তাঁর শক্তির প্রয়োজন ?

ঈশ্বর আদর্শ জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আদর্শ জগৎ ছাড়া আরও একটা জগৎ আছে যার নাম বাস্তব জগৎ। এই বাস্তব জগৎ হল আদর্শ জগতের পরিবেশ। এই পরিবেশের মধ্যে ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতা বিস্তৃত করে চলেছেন।

অসীমের সঙ্গে সসীমের সম্পর্ক কি—এটি একটি প্রাচীন সমস্যা। বহুত্ববাদ এবং সসীম ঈশ্বরের ধারণা বর্তমান যুগে সমস্যাটিকে আবার সজীব করে তুলেছে। এই সমস্যা সম্পর্কিত দু'টি প্রধান মতবাদ আমরা আলোচনা করবো।

I

একত্ববাদ ঃ প্রাচীন যুগ থেকে এই বিশ্বাস চলে আসছে। আধুনিক ইউরোপের স্পিনোজা হলেন প্রথম অদ্বৈত চিন্তাবিদ। তাঁর মতে, অসীম দ্রব্য এক। একমাত্র সত্তা। ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এক।

চরম ভাববাদ ঃ একত্ববাদের অত্যাধুনিক রূপটির নাম হল চরম ভাববাদ। এই মতবাদের প্রবক্তা মনীষী হেগেল। স্পিনোজার মত হেগেলও ব্রহ্মাণ্ডকে এক ও সম্পূর্ণ সত্তা হিসেবে স্বীকার করেছেন। কিন্তু হেগেলের মতে জীবন্ত আত্মার মত চরম ধারণার মধ্যেও গতি আছে। সে স্বআবর্তিত। হেগেল একের মধ্যে বিভেদের সজীব পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই নীতিকে তিনি 'ধারণার দ্বান্দ্বিক গতি' বলেছেন। হেগেলের ধারণাগুলি গতিহীন আত্মতুষ্ট সত্তা মাত্র নয়। প্রত্যেক ধারণা সব সময় নিজেকে অতিক্রম করে যেতে চায়। এই অতিক্রমণ কিন্তু একই সত্তার মধ্যে ঘটবে। কোন একটি বিষয়ের ধারণার একটি বিরোধী ধারণা থাকবে। আবার একটি উন্নততর ধারণায় উভয়ের সমন্বয় ঘটবে। সেই উন্নত ধারণাটি তখন বিষয়ে পরিণত হবে। আর তার বিরোধী ধারণা এবং অবশেষে তাদের সমন্বয়—এইভাবে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অগ্রসর হয়। পরিশেষে পরম সত্তার ধারণার মধ্যে চরম সমন্বয় ঘটে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তন মানে পরম সত্তার যৌক্তিক আত্ম-বিবর্তন। এই পরম সত্তার বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে

একটিমাত্র পার্থক্য আছে। ব্রহ্মকে কেবল বিশুদ্ধ যুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায় কিন্তু ঈশ্বরকে কল্পনা ভক্তির সাহায্যে প্রকাশ করা যেতে পারে।

পরবর্তীকালে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার চরম ভাববাদীদের উপর হেগেলের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যাঁরা এ বিষয়ে কিছুটা স্বতন্ত্র চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে, গ্রীণ, জন কেয়ার্ড এডোয়ার্ড, কেয়ার্ড রয়েস, ব্র্যাডলে এবং বোসাঙ্কে অন্যতম।

ব্র্যাডলে ঃ ব্র্যাডলের মতবাদ হেগেল অপেক্ষা অনেকাংশে স্পিনোজার স্বগোত্রীয়। সময়ের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মের আত্মবিকাশ ঘটেছে—হেগেলের এই নীতি তিনি স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে ব্রহ্ম কালাতীত। তাঁর কোন ইতিহাস নেই। তিনি ঈশ্বরকে ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করেছেন। ঈশ্বর ব্রহ্মের প্রতিভাস, তার একটা দিক মাত্র। ঈশ্বর পরম সত্তা নন। অবশ্য ঈশ্বর আমাদের থেকে সহস্রগুণে শক্তিশালী।

বোসাঙ্কে ঃ সত্য এবং সম্পূর্ণ এক ব্যক্তিসত্তাই ব্রহ্ম। ঈশ্বরের সঙ্গে এই ব্রহ্মকে এক করা যায় না।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটি 'সমগ্র' হিসেবে গণ্য করার ফলে কতকগুলি অসুবিধা দেখা দেয়। এই মতবাদ মানবিক ও ব্যক্তিক মূল্যের উপর সুবিচার করতে পারে নি। মূল্যগুলি হল খণ্ড অভিজ্ঞতা। তাই অখণ্ড জ্ঞানে এই খণ্ড অভিজ্ঞতার কোন অস্তিত্ব থাকে না বলে চরম ভাববাদীরা মনে করেন। ধর্ম ব্যক্তিসত্তা ও অসীমের সঙ্গে একটি সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। কিন্তু তার জন্য ব্যক্তিসত্তা এবং চিরন্তন মূল্যগুলিকে সে বিসর্জন দেয় না। ব্রহ্মাণ্ডও ব্যক্তিজীবনকে শ্রদ্ধা করে। এক অনন্ত শক্তি সবকিছুকে উন্নততর করবার জন্য এবং একটা অখণ্ড ঐক্য গড়ে তোলার জন্য নিরন্তর কাজ করে চলেছে। ব্যক্তিজীবন ব্রহ্মে গিয়ে এবং ব্রহ্মও ব্যক্তিজীবনে নিজেদের সার্থকতা খুঁজে পায়।

II

বহুত্ববাদ ঃ যাঁরা জগতের অন্তর্নিহিত ঐক্য অপেক্ষা বৈচিত্র্য এবং বহুত্বে অধিকতর মুগ্ধ তাঁদের বহুত্ববাদী দার্শনিক বলে। বহুত্ববাদ দু'রকমের—জড়বাদী বহুত্ববাদ ও ভাববাদী বা অধ্যাত্মবাদী বহুত্ববাদ। বর্তমান প্রসঙ্গে কেবল অধ্যাত্মবাদী বহুত্ববাদ আলোচিত হবে।

অধ্যাত্মবাদী বহুত্ববাদ ঃ জগৎ অসংখ্য, মুক্ত, স্বনির্ভর ও স্বনিয়ন্ত্রিত আত্মায় পূর্ণ। ব্যক্তিসত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।

লাইবনিজ ঃ মোনাডতত্ত্ব। সসীম স্বনির্ভর অনেক দ্রব্য সম্ভব। দ্রব্য স্বভাবতঃ গতিশীল ও সক্রিয়। অসংখ্য আত্মা-কণায় জগৎ পরিপূর্ণ। লাইবনিজ এই সব স্বতন্ত্র আত্মার নামকরণ করেছেন মোনাড। লাইবনিজের দর্শনে জড় জগৎ বলে কিছু নেই। সম্পূর্ণতার দিক থেকে আত্মাগুলি বিভিন্ন মাত্রায় বিন্যস্ত। সর্বনিম্নের স্তর পরমাণু এবং সর্বোচ্চ স্তরের আত্মার নাম ঈশ্বর। একটি মোনাডকে অন্য মোনাড প্রভাবিত করতে পারে না। তারা প্রত্যেকে নিজের মত করে বিশ্বজগতকে প্রতিবিম্বিত করে। তবু তাদের ক্রিয়ার মধ্যে ঐক্য আছে। তার কারণ ঈশ্বর বা সর্বশ্রেষ্ঠ মোনাড যাকে বলা হয় তিনি সব মোনাডের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। মোনাডদের মধ্যে একটা পূর্বনির্ধারিত ঐকতান বর্তমান।

লাইবনিজের বহুত্ববাদ পরিশেষে ঐক্যের সঙ্গে একটা আপোস করে নিয়েছে। কিন্তু পরবর্তী বহুত্ববাদীরা তা পারেন নি। যেমন হাউইশন মনে করেন ব্রহ্মাণ্ডে যত আত্মা রয়েছে সকলে সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কেউ তাদের নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। আবার উইলিয়ম জেম্‌স বলেছেন বিশ্বের প্রতিটি অংশ অন্য অংশের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে সম্পর্কিত আবার কোন না কোন ভাবে সম্পর্কহীন। ঈশ্বরের সসীমতার ধারণা তাঁর দর্শনে স্পষ্ট ও সোচ্চার। কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হলেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে ধর্মের ঈশ্বরের সঙ্গে ব্রহ্মকে এক করা যায় না।

জেমস্‌ ওয়ার্ড ঃ তিনি প্রাথমিকভাবে বহুত্ববাদকে পুরোপুরি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু আলোচনা যতই এগিয়েছে তিনি ক্রমশঃ একত্ববাদী প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। অসংখ্য মুক্ত সত্তা নিজেদের মত কাজ করে। কোন পূর্বনির্ধারিত শর্ত নেই। অভিব্যক্তির ফলে নতুন গুণ ও নতুন মূল্যের সৃষ্টি হয়। পরিণতিতে সকলের লক্ষ্য এক। সর্বকিছুর পরিণতি শুভ।

পরবর্তী বহুত্ববাদিগণ সময়, অভিব্যক্তি, ইতিহাস, প্রগতি প্রভৃতির অপরিসীম গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। আলেক্‌জাণ্ডার, ক্রোচে এবং জেণ্টিলে বস্তুবাদ এবং ভাববাদের চরম বিপরীত দিকগুলির মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে বিশ্ব হল ক্রমাগত বিবর্তনের ইতিহাস। বোসাঙ্কে একত্ববাদে বিশ্বাসী। ব্রহ্মের কোন পরিবর্তন হতে পারে না। তাঁর যুক্তি হল, যেহেতু ব্রহ্মের মধ্যে সময় আছে সেইজন্য সময়ের মধ্যে ব্রহ্ম থাকতে পারে না।

III

পরিশেষে বলা যায় জগতের ঐক্য এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা একসঙ্গে রক্ষা করা কি সম্ভব নয়? কারণ কোন একটাকে আমরা অস্বীকার করলে বাস্তবকে অস্বীকার করবো। একত্ববাদী নীতিকে এমনভাবে পরিবর্তিত করতে হবে যেন তার ফলে ব্যক্তিমানুষের অধিকার ও মূল্য রক্ষা পায়। যে ঈশ্বর ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে স্বীকার করেন না ধর্মে তেমন সর্বগ্রাসী ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই। জগতের ঐক্যকে নষ্ট না করে কিভাবে ঈশ্বরকে স্রষ্টার মর্যাদা দেওয়া হবে সেটাই একটা জটিল প্রশ্ন।

প্রকৃতিতে একটি নিয়ম আছে। সেই নিয়মকে শর্ত হিসেবে গ্রহণ করে নিজের গণ্ডীর মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীন। জগতের নিয়ম ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করে ঠিকই কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ নিহিত রয়েছে। ঈশ্বর এই বিশ্বনিয়মের স্রষ্টা। কিন্তু তিনি নিজেও তাঁর নিজের নিয়মে বাঁধা। মানুষের স্বাধীনতা যেমন প্রাকৃতিক, সামাজিক ও নৈতিক অনুশাসনে সীমাবদ্ধ ঈশ্বরও তাঁর নিজের গড়া পরিবেশে, তাঁরই রচিত নিয়মে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সেইজন্য ঈশ্বরকে সসীম বলা যায় না। কারণ ঈশ্বর বাইরের কোন নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত নন। তাঁর নিয়ন্ত্রণ আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। সুতরাং এই নিয়ন্ত্রণ থাকলেও তাঁর অসীম অনন্ত হতে কোন বাধা নেই।

ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্ক ঃ মানুষ একমাত্র নৈতিক প্রাণী। ঈশ্বর নিজের পছন্দমত করে মানুষ গড়েছেন। চরিত্র গঠন একদিনে হয় না। বাইরের কোন কিছু দিয়েও চরিত্র গড়া যায় না। চরিত্র গঠনের উপাদান ও নিয়ম আমরা গড়তে পারি না। এইগুলিকে শর্ত হিসেবে মেনে নিয়ে আমাদের চরিত্র গঠনের কাজ চলে। নিয়মানুবর্তিতার মধ্যেই প্রকৃত স্বাধীনতা। মানুষ নিজ পরিসরে স্বাধীনভাবেই তার চরিত্র গঠন করে। ঈশ্বর তাঁর স্বাধীনতাকে মানুষের ক্ষেত্রে একটু সংযত করেছেন। অর্থাৎ মানুষকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। ঈশ্বরের শক্তি ও ভালবাসার প্রমাণ হল মানুষের স্বাধীনতা।

ঈশ্বর ও ব্রহ্ম ঃ ব্রহ্ম বলতে যদি সমগ্র সত্তার সমষ্টি বোঝায় তাহ'লে ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এক হতে পারে না। আবার যে সত্তা সব সময় সবকিছুর মধ্যে উপস্থিত থাকে, এবং যে সত্তা সবকিছুর চরম পরিণতি, ব্রহ্মকে যদি সেই রকম কোন সত্তা হিসেবে গ্রহণ করা যায়, তাহ'লে ঈশ্বরই কেবল সেই

চরম সত্তা হতে পারেন। কিন্তু দার্শনিকেরা ব্রহ্ম বলতে যা বোঝেন এই ঈশ্বর সে রকম ব্রহ্ম নন। ব্রহ্ম শান্ত ও নিরাসক্ত। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে থেকে অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। জগতের পাপের জন্য ঈশ্বর কষ্ট পান। ঈশ্বর হলেন এক অনন্ত সমাজ। বন্ধুত্বে ও ভালবাসায় সকল আত্মা এক হয়ে ঐ আধ্যাত্মিক সমাজ গড়ে তোলে। ঈশ্বরের নির্দেশে বিবর্তনের পথ ধরে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা চলছে। কোন মানুষ বা কোন কিছু জিনিসই ঈশ্বরের সংসারে অবান্তর নয়। 'তুমি আমার মধ্যে আছ, আমি তোমার মধ্যে আছি' এভাবে ভাবলেই ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলতে কোন অসুবিধা থাকবে না।

পরিশিষ্ট

অটোর (Otto) ঈশ্বর সম্বন্ধীয় মতবাদ

বর্তমান গ্রন্থকারের যখন অধ্যাপক অটোর (Rudlof Otto) গুরুত্বপূর্ণ বইটি (E. Tr. The Idea of Holy 1923) পড়ার সুযোগ হল তার আগেই তিনি এই বইটির পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যদি তিনি আগে বইটি পড়তে পেতেন তাহ'লে নিঃসন্দেহে তিনি উপকৃত হতেন। কিছু কিছু বিষয় তিনি অল্প কথায় না বলে আরও ভাল করে আলোচনা করতে পারতেন। সে যাই হোক গ্রন্থকার তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বিরাট কোন পরিবর্তন করছেন না। তাছাড়া সংক্ষিপ্ত একটি টীকায় অটোর (Otto) অভিমতকেও যথাযথ আলোচনা করা সম্ভব নয়। কেবল সংক্ষেপে গ্রন্থকার এখানে দেখাতে চান তাঁর নিজের মতের সঙ্গে অটোর (Otto) মতের মিলটি কোথায়।

অটো (Otto) বলেন ধর্মীয় জীবন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবন। তার ব্যাখ্যার জন্যও বিশিষ্ট কোন পদ্ধতির প্রয়োজন। সত্য সুন্দর ও মঙ্গলকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয় ঠিক সেইভাবে ধর্মকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ সত্য শিব ও সুন্দর ধর্ম জীবনে যতখানি প্রভাবই বিস্তার করুক না কেন এগুলি ধর্মের মুখ্য উপাদান নয়। ঈশ্বরই হলেন পরম মূল্য। ঈশ্বর থেকে যখন তাঁর নৈতিক ও বৌদ্ধিক উপাদানগুলি বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তখন তাঁর কেবল মৌলিক আবেগগত প্রতিক্রিয়াটি অবশিষ্ট থাকে। তখন ঈশ্বর নৈতিক দিক থেকে নিরপেক্ষ হয়ে নিজেই নিজের যথার্থতা প্রমাণ করেন। অটো (Otto) এই সম্পর্কে একটি নতুন পদ ব্যবহার করেছেন। পদটি হল— 'the numinous'। সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় অথবা numinous মানসিক অবস্থা নিজেই নিজের প্রমাণ। তাকে অন্য কোন কিছু দিয়ে প্রমাণ করা যাবে না। 'সৃষ্টির অনুভূতি' কিংবা 'আমি সৃষ্ট' এই অনুভূতি এই মতবাদের উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই অনুভূতিকে বলা যেতে পারে—এক সর্বশক্তিমান ক্ষমতার কাছে নিঃস্বতার সলজ্জ কুণ্ঠার অনুভূতি। ঐ সর্বশক্তিমানের বৈশিষ্ট্যকে কোন ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না। ঈশ্বর এমনি এক রহস্য যে তাঁর ধারে কাছেও পৌঁছানো যাবে না। তিনি এক ভয়ংকর ক্ষমতা। এই ক্ষমতা ভয় ও বিস্ময় সৃষ্টি করে কিন্তু তবুও তার মধ্যে এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভূত

হয়। অটো (Otto) ধর্মের নৈতিক এবং বৌদ্ধিক উপাদান স্বীকার করলেও তিনি মনে করেন ধর্ম মূলতঃ যুক্তিতর্ক ও নৈতিকতার ঊর্ধ্বে।

এই পুস্তকে আমরা এমন কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করেছি যার সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। (1) আমরা বলেছি ধর্মের উৎপত্তিতে অব্যাখ্যেয়, ইন্দ্রিয়াতীত অপরিমেয় এক ক্ষমতা সম্পর্কে রহস্য ও বিস্ময়ের অনুভূতি কাজ করছিল। আমরা আরও বলেছি, কিছুটা মার্জিতরূপে ঐ রহস্যবোধ ও বিস্ময়ানুভূতি, উন্নততর ধর্মগুলিতেও বর্তমান আছে। ধর্মচেতনার এগুলিই হল উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। (2) আমরা অন্যরকম অভিজ্ঞতার (যেমন নৈতিকতা, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি) সঙ্গে ধর্মের বৈশিষ্ট্য এবং আপেক্ষিক স্বাধীনতার উল্লেখ করেছি। অবশ্য আমরা ধর্মের এমন কোন বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারি নি (অটো যা বুঝেছেন) যাতে প্রমাণিত হয় যে ধর্মের সঙ্গে মূল্যের কোন সম্পর্ক নেই। নৈতিকতা এবং যুক্তি-তর্কের ঊর্ধ্বে ধর্মের স্থান করে দেবার যৌক্তিকতাও আমাদের বোধগম্য নয়। বিপরীত পক্ষে আমরা এই অভিমত পোষণ করেছি, যে সব মূল্য অন্যান্য অভিজ্ঞতার আদর্শ হিসেবে কাজ করে ধর্ম সেই চরম মূল্যের সঙ্গে সংযুক্ত। এই গ্রন্থকার যা লিখেছেন আগে 'অটো' (Otto) পড়লে হয়ত তিনি তা ভিন্ন ভাষায় লিখতেন। কিন্তু তাতে মৌলিক কোন পরিবর্তন হত বলে মনে হয় না। আমরা অটোর মতবাদের একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা লিপিবদ্ধ করলাম। সমালোচনা যেহেতু সংক্ষিপ্ত, তা অপর্যাপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

1. অটোর (Otto) মত অনুসারে ঈশ্বরের গুণের কোন রকম প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁকে কেবল অনুভব করা যায়। তিনি অনির্বচনীয়। যখন তাঁকে মঙ্গলময় বলা হয় তখন বস্তুতপক্ষে তাঁর একটি প্রতীক ব্যবহার করা হয় মাত্র। তাঁর কোন সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি স্বভাবতঃ অব্যাখ্যেয়। এটা অনেকখানি—যেন, যিনি নৈতিক বিচারের ঊর্ধ্বে তাঁকে নৈতিক গুণ দান করা এবং যিনি বুদ্ধির অগোচর তাঁকে বৌদ্ধিক গুণ দান করা। কিন্তু ঈশ্বরকে নৈতিক ও বৌদ্ধিক গুণসম্পন্ন কল্পনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ধর্মের প্রগতির এটি অন্যতম লক্ষণ। ঈশ্বরকে সত্য শিব ও সুন্দরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হতে হবে। তা নাহ'লে তাঁকে যেমন ভাল বা মন্দ বলা যাবে না, অথবা তাঁকে যেমন বুদ্ধি দিয়ে বোঝাও যাবে না, তেমনি তিনি ধর্মের উপাস্যও হতে পারবেন না। সত্য, শিব ও সুন্দরকে

পবিত্র বলা হয় এইজন্য যে এদের প্রত্যেক্যের পরম মূল্য রয়েছে। মিকায় (Micah) যখন জোর দিয়ে বলেন—'ধর্ম হল নৈতিক বিষয়'—তখন তাঁকে একেবারে ধর্মহীন যুক্তিবাদী বলে দেওয়া যায় না।..... ঈশ্বরকে অনির্বচনীয় বলার অর্থই হল স্পেনসার (Spencer) প্রভৃতি অজ্ঞেয়বাদীদের মত অজ্ঞাত এবং জ্ঞানাতীত বলে স্বীকার করে নেওয়া।

2. অটোর (Otto) ঈশ্বর হলেন 'সম্পূর্ণ অন্য বিষয়'। তাঁর ,অবস্থান আমাদের পরিচিতির সীমানার বাইরে। তাঁর সঙ্গে আমাদের অন্যান্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কোন সম্পর্ক নেই। তিনি অপার্থিব এবং অতীন্দ্রিয়। কিন্তু এই 'সম্পূর্ণ অন্য' একটি বিষয়ের সঙ্গে আমাদের কি কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে? আমরা ঈশ্বরকে অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করেছি। তিনি স্রষ্টা, তিনি অতীন্দ্রিয়। কিন্তু 'সম্পূর্ণ অন্য কিছু' আমাদের মতে শূন্য, যাকে জানা যায় না, অনুভব করা যায় না। সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় কোন কিছুর সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না। প্রগতি বলতে বোঝায় রহস্যময় সকল কিছুকে পরিচিত করে তোলা এবং বিদেশী অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাকে ঘরের মানুষ করে তোলা। এর ফলে সেই রহস্যময় ও অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাকে বন্ধুভাবে এবং আত্মীয়ভাবে গ্রহণ করা যায়। খৃষ্টধর্মের ঈশ্বর কেবল স্রষ্টা এবং সার্বভৌম ক্ষমতা-সম্পন্ন নন, তিনি পিতাও। তাঁর দূরত্ব এবং শুচিতার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি তাঁর অন্তরঙ্গতা এবং নৈকট্যেরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। (মানুষ ঈশ্বরের আদর্শে সৃষ্ট, সে স্বর্গীয় পিতার সন্তান)। এই আধ্যাত্মিক অন্তরঙ্গতা ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

গ্রন্থবিবরণী (Bibliography)

দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এই শতাব্দীতে প্রকাশিত বই-এর নাম দেওয়া হল। প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত বই-এর উল্লেখ করা হয়েছে।

I. On the Philosophy of Religion in General.

John Caird : Introduction to the Philosophy of Religion Maclehose 1880

George Galloway : The Philosophy of Religion T. and T. Clark 1914

Harald Hoffding : The Philosophy of Religion Eng. Tr. Macmillan 1906.

O. Pfleiderer : The Philosophy of Religion on the Basis of its History. Eng. Tr. 4 Vols. Williams and Norgate 1888.

E. S. Waterhouse : The Philosophy of Religious Experience. Epworth Press 1923.

W. K. Wright : A Student's Philosophy of Riligion. Hodder and Stoughton, 1922.

II. On Primitive Religion.

Emile Durkheim : Elementary forms of the Religious Life. Eng. Tr. Geo. Allen and Unwin 1915.

James G. Frazer : The Golden Bough—Macmillan, 3rd ed. 1911. One Vol. Edition (abridged) 1923.

F. B. Jevons : Introduction to the History of Religion : Methuen 1896,

R. R. Marett : The Threshold of Religion—Methnen 2nd ed. 1914.

E. B. Tylor : Primitive Culture.—John Murray. 1871 3rd ed. 1891. 2 vols.

Articles in Encyclopoedia of Religion and Ethics--T. and T. Clark. 1908-1921.

III. On Religion and Psychology.

F. R. Barry : Christianity and Psychology. Student Christian Movement 1923.

G. A. Coe : Psychology of Religion. Chicago University 1916.

William James : Varieties of Religious Experience--Longmans, Green, 1902.

C. G. Jung : Psychological Types : Eng. Tr. Kegan Paul, 1923.

J. H. Leuba : Psychological Study of Religion—Macmillan, 1921.

R. H. Thouless : Introduction to the Psychology of Religion. Cambridge University 1923.

J. B. Pratt : The Religious Consciousness. New York, Macmillan. 1921

IV. On the History and Evolution of Religion.

Edward Caird : The Evolution of Religion—Maclehose, 1893, 2 vols.

D. Miall Edwards : Crist a Gwareiddiad Rhav ii. Dolgelley, Hughes Bros. 1921.

D. Miall Edwards : Cristionogaeth a Chrefyddau Eraill. Dolgelley, Hughes Bros. 1923.

Georgy Galloway : Principles of Religious Development. Macmillan 1909.

A. Menzies : History of Religion. John Murray 1895.

G. E. Moore : History of Religion. T. and T. Clark 1914, 120, 2 vols.

C. P. Tiele : Outlines of the Science of Religion. Blackwood 1897. 2 vols.

V. Religion, Theism and Speculative Philosophy.

S. Alexander : Space, Time and Diety. Macmillan, 1920. 2 vols.

Bernard Bosanquet : The Principle of Individuality and Value. Macmillan 1912.

Bernard Bosanquet : The Value and Destiny of the Individual. Macmillan 1913.

F. H. Bradley : Essays on Truth and Reality. Clarendon Press 1914.

Caldecott and Mackintosh : Selections from the Literature of Theism. T. and T. Clark 1904.

W. E. Hocking : The Meaning of God in Human Experience Yale University 1912.

F. Von Hugel : Essays and Addresses on the Philosophy of Religion. Dent. 1921.

William James : A Pluralistic Universe—Longmans, Green, 1909.

Henry Jones : A Faith that Enquires—Macmillan 1922

J. M. E. Mc Taggart : Studies in Hegelian Cosmology—Cambridge University 1901.

John Owen : Gwybodaethy Sanctaidd—Carnarvon 1923.

A. S. Pringle-Pattison : The Idea of God in the Light of Recent Philosophy. Clarendon Press 1917.

T. Rus : Duw, Ei Fodolaeth a' i Nature. Wrexham, Hughes and Son 1910.

W. R. Sorley : Moral Values and the Idea of God. Cambridge University. 1918.

James Ward : The Realm of Ends. Cambridge University 1911.

C. C. J. Webb : God and Personality—Geo. Allen and Unwin 1918.

—•